শান্তি-কুটীর।

অর্থাৎ

হিন্দুর দর্শন, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, পাতঞ্জল, পুরাণ
আদি নানাবিধ শাস্ত্র হইতে জ্ঞান, কর্ম্ম,
ভক্তি ও যোগ বিষয়ক তত্ত্ব সমূহ
প্রবন্ধাকারে লিখিত।

বক্তৃতা রামবিলাপ প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা
বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা

কবিরাজ শ্রীভূদেব কবিরত্ন

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও
কলিকাতা, ১ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাই লেন হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩য় সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৫।

সূচীপত্র।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সবিনয় নিবেদন।

সহৃদয় পাঠকগণ।

বহুদিন পরে পুনবার আমরা ধর্ম্মসাহিত্য-সুরভি কুসুমদামে আপনাদের সেবা করিবার জন্য অদ্য উপস্থিত হইলাম। আমাদের এ সেবায় আপনাদের পরিতৃপ্তি হইবে কি না, তাহা জানি না। আমাদের পরিশ্রম সফল হইবে কি না, তাহা বিধাতা বলিতে পারেন। যদি আপনাদের উৎসাহ পাই, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে এইরূপ আপনাদের সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। শান্তি-কুটীর পাঠে যদি একজনেরও হৃদয়ে শান্তির চিত্র অঙ্কিত হয়, তবে এ জীবন সফল মনে করিব। শান্তি-কুটীর পাঠে আপনাদের কিরূপ মতামত হয়, দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

বিনীত নিবেদক

কবিরাজ শ্রীভূদেব কবিরত্ন।

১ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন কলিকাতা,

১২ই শ্রাবণ ১৩০১ সাল।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সবিনয় নিবেদন।

যাহা কখনও ভাবি নাই, তাহাই হইল। যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহা আজ কার্য্যে পরিণত হইল। এই শান্তি-কুটীর পুস্তক চার মাসের মধ্যে দুই হাজার বিক্রীত হইল। যে দেশে নাটক, নভেল, প্রহসন আদি পড়িয়া রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সেই দেশে এই ধর্ম্ম পুস্তক এত শীঘ্র কাট্‌তি হইবে, ইহা কেহ কখনও ভাবে নাই। ধর্ম্মসাহিত্যের এত অধিক কাট্‌তি দেখিয়া মনে হয়, দেশের স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে, দেশের মুখশ্রী যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যখন দেখি, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট উকীল আদি সুশিক্ষিত মহাত্মাগণ এই ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ শান্তি-কুটীর লইবার জন্য আমাদের আপিষে রাশি রাশি পত্র লিখিতেছেন, তখন মনে হয়, বহুদিন পরে আবার হিন্দুর জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। কটুরঠোর নাস্তিকতাপূর্ণ ইংরাজিশিক্ষার পার্শ্বে ভগবৎ-প্রেমাশ্রু স্থান লাভ করিয়াছে, ইহা দেখিয়া ভক্তের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। আমাদের এই শান্তি-কুটীরের মত এদেশে আর কোন ধর্ম্মপুস্তক এত শীঘ্র বিক্রীত হয় নাই। পুস্তক এত মধুর এত মনোহারী হইয়াছে, যে শিক্ষিত মহাত্মাগণ অজস্র ধন্যবাদ দিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবার শান্তি-কুটীর আরও পরিবর্দ্ধিত করিলাম। পাঠক! দেখিবেন এবার পূর্ব্ব সংস্করণাপেক্ষা একটি নূতন প্রবন্ধ শান্তি-কুটীরে সংযোজিত হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান, যুক্তির নব পরিচ্ছদে সাজাইয়া হিন্দুর প্রেমভক্তিকে যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আদরণীয় করিতে পারি, তবেই এ সেবক চির কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

কবিরাজ শ্রীভূদেব কবিরত্ন।

১ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন কলিকাতা,

১৪ই বৈশাখ ১৩০২ সাল।

২৪৯৬.

ভিখারি।

অনন্তের এক কোণে পড়িয়া আছি। আমাকে কেহ ডাকে না। দিন নাই রাত্রি নাই মরমে পুড়িতেছি, আমাকে কেহ সুধায় না। জর জর প্রাণ আমার আগুণে শুষিতেছে, আমার দিকে কেহ চাহে না। পথের ধারে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতেছি, শূন্য আকাশের শূন্য তলে বসিয়া নিরাশার গান গাহিতেছি, আমার দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। জল্ জলে চোখের জলের কালি লইয়া আমি যে বিষাদের গাথা গাথিতেছি, তোমরা কি কেহ তাহা পড়িবে। শ্মশানের ছিন্নমুণ্ড কুড়াইয়া গলদেশে বাঁধিয়াছি, তোমরা কি কেহ তাহা দেখিবে? ফুটন্ত ফুলের রাশি তোমাদের বাগানে ফুটে, কিন্তু আমার এ শ্মশান কাননে জলন্ত শবের রাশি ঐ দেখ জলিতেছে। শান্তির ঝঙ্কারে পাপিয়া তোমার ঘরে ডাকে, কিন্তু আমার এ মন্দিরে শিবার দল হাঁহা করিতেছে। আনন্দের পসরা সাজাইয়া জীবন-বিপণিতে বসিয়া তোমরা সাধের বেচা কেনা করিতেছ, আর আমি এ বিজন প্রান্তরে পড়িয়া বলিতেছি "ভিখ্ দেও বাবা"

আমি ভিখারি। জগতে আসিয়াছি ভিক্ষা করিতে।

পরের মুখ চাহিয়া পরের পায়ে পড়িয়া মাথা কুটিয়া বলিতেছি, আমায় এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও। বেশি চাহিনা, ভাণ্ডার পুরিয়া চাহি না, উদর পুরিয়াও চাহি না, চাহি কেবল এক মুষ্টি। কিন্তু হায়! এ মুষ্টিভিক্ষা এ বাজারে মিলে না। এত চীৎকার করিতেছি, এ চীৎকারে কেহ কাণ দেয় না। সময় নাই, অসময় নাই, আশা নাই, ভরসা নাই, আমি কেবল ভিক্ষার ঝুলিটী কাঁধে লইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কত কাল ধরিয়া কত দিন ধরিয়া কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া এ ভিক্ষা সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, তাহার সীমা নাই, শেষ নাই। মাথার উপর দিয়া কত বার বজ্রঝঞ্ঝনা চলিয়া গিয়াছে, বুকের উপর দিয়া পর্ব্বতের চাপ কত বার প্রাণ আকুলিত করিয়াছে, তথাপি এ ভিক্ষাব্রতে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। অনবরত এ অকূল পাথার দিয়া দৌড়িতেছি। করে এ ব্রত ফুরাইবে, তাহা জানি না। করে ব্রতাবসানে হাসি মুখে পারণা করিতে বসিব, তাহা কে জানে? আমার এ মর্ম্ম-গাথা নাথ! আর কত কাল আকাশের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইবে, তাহা বলিয়া দাও। বলিয়া দাও বিভো! আর কত দিন!

আমার ভিক্ষা কি? আমার ভিক্ষা বেশী নহে। ধন চাহি না, দৌলত চাহি না, নন্দন কাননের সুখ-সমীরণে প্রাণ মন ভাসাইয়া সুখসুধা ভোগ করিতে চাহি না, বাহ্য সুখের পিঞ্জরে পোষাপাখী হইয়া আনন্দের বুলিও বলিতে চাহি না। লোকে যাহাকে সুখ বলিয়া বুঝে, আমি তাহাই চাহি না। আমি যাহা চাই, অনেকে

হয়ত তাহা চাহে না, আমি যাহার জন্য লালায়িত, অনেকে হয়ত তাহাকে পদাঘাত করে। বিষাদ-বিভোরা বিষে ভরা ভরা হৃদয়ে একটু শান্তির জন্য যে দিকে ঢলিয়া পড়ি, জগতের ভস্মস্তূপ এক ধারে ফেলিয়া বিবশ হৃদয়ে যে দিকে এলাইয়া পড়িতে চাই, অনেকে হয়ত সে দিকে যাইতে চাহে না। না চাহুক, আমি কিন্তু চাই। আমি যাহা চাই, তাহা কি? তাহা আর কিছুই নহে, তাহা এক বিন্দু অশ্রুজল, একটু ভগবৎ-প্রেম-কণিকা। বেশী নহে, বেশী চাহিলে পাইব না, তাই বলিতেছি এক বিন্দু। এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বেশী ধরিবে না, তাই বলিতেছি এক বিন্দু। আমি গরিব, গরিবের এক রত্তি সোণাই বিপুল সম্পত্তি, তাই বলিতেছি এক বিন্দু।

আহা! এমন জিনিষ আর নাই। শোকে, তাপে, মলিনতায় প্রাণ যখন হুহু করিতে থাকে, তখন স্নিগ্ধ সজীবতায় প্রাণকে অভিষিক্ত করে কে? একমাত্র অশ্রুজল। নৈরাশ্যের দাবানলে যখন চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে, তখন শান্তিময় সলিলের প্রস্রবণ খুলিয়া দেয় কে? এই অশ্রুজল। জগতের বন্ধু বান্ধব সকলেই যখন ছাড়িয়া দেয়, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে পিশাচিনী যখন খল খল হাসিতে থাকে, সে দুর্দ্দিনে ভরসা দেয় কে? এই প্রেম-কণিকা। সংসারের মরুময়বক্ষে জ্বালা যন্ত্রণার মার্ত্তণ্ডকিরণে পিপাসায় বুক যখন ফাটিতে থাকে, তখন শীতল বারির ফোয়ারা খুলিয়া দেয় কে? এই প্রেম-কণিকা। হৃৎকাননে সযতনে যে কোমলতার লতাগুলি

লতাইয়া লতাইয়া গজাইয়া উঠে, সংসারের সন্তাপে সে গুলি যখন শুকাইয়া যায়, তখন আবার তাহাকে সরস করে কে? মধুবর্ষণে আবার তাহাকে বাঁচাইয়া তুলে কে? এই প্রেম-কণিকা। তাই বলিতেছিলাম, এমন জিনিষ আর নাই, এমন মাধুরি আর নাই।

আমি মুক্তি চাহি না, কিন্তু ভক্তি চাই। আমি মরিতে চাহি না, কিন্তু বাঁচিতে চাই। আমি মিশিতে চাহি না, কিন্তু ভাসিতে চাই। আমি যদি মরিয়া যাই, আমি যদি সাগরে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে সাগরের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কায়া, গলিত রজতময় ছায়া, কল গম্ভীর নিনাদ এ সমস্ত কে দেখিবে? কে শুনিবে? আমি যদি তাঁহাতে মিশিয়া যাই, তাহা হইলে, তাঁহার শ্যাম সুন্দর, ভাব-ঢল্ ঢল্ মোহন মূরতি, সে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে হাঁসি মুখের ললিত ভাস্বর কমনীয় কান্তি, সে ভুবনমোহিনী বাঁশরির মধুর কাকলি, এ সমস্ত কে দেখিবে কে শুনিবে? আমি এ সমস্ত বড় ভালবাসি। তোমার মুক্তিতে ত ভালবাসা নাই, তাহাতে প্রিয়ত্বও নাই অপ্রিয়ত্বও নাই। আমার ভক্তিতে প্রিয়ত্ব আছে, অপ্রিয়ত্ব নাই। তুমি বলিতেছ, প্রিয়ত্বাপ্রিয়ত্ব-বর্জ্জিতই পরম আনন্দ। আমি বলিতেছি, অপ্রিয়ত্ব বর্জ্জিত প্রিয়ত্বই পরমানন্দ। তোমার মুক্তির কাছে প্রিয়ত্বকে হারাইতে হয়, আমার ভক্তির কাছে প্রিয়ত্বকে সঙ্গী করিয়া লইতে হয়। যাহা প্রিয়, তাহাই চাই, যাহা প্রিয় হইতে পৃথক্, তাহাকে দূর হইতে বন্দেগী করিতেছি।

হায়। আমার এ মুষ্টি ভিক্ষা এ জগতে মিলে না। জ্ঞানের কথা যোগের কথা এ বাজারে মিলে, কিন্তু আমি যাহা চাই, তাহা ত মিলে না, বোকের কথায় তেজের কথায় এ প্রাণ ভিজে না। পাষাণে পাষাণ মিশাইলে আগুণের তুফান বহে, অমৃতের উৎস ছুটে না। লোহাতে লোহা কখনও মিশে না। যদি মিশাইতে হয় তো আগে গলাইতে হইবে। শুকন মাটিকে যদি মিশাইতে হয় তো আগে জল দিয়া ভিজাইতে হইবে। নীরসে নীরসে মিশে না, সরসে সরসেও মিশে না। নীরস ও সরস মিশিয়া এক হয়, ইহাই ত নিয়ম। নীরস হৃদয় আমার রসের ঝাঁঝরিতে ডুবাইতে চাই, লৌহময় প্রাণ আমার প্রেমাগুণে গলাইতে চাই। গলাইয়া তবে ত তাহাতে জ্ঞানের মশলা মিশাইব। রস ও মশলায় মিশাইয়া তবে ত রসকরা ভাজিব। রসের খোলা সাজাইয়া রসময়ের দোকানে বসিয়া তবে ত বলিতে পারিব,—

আয় আয় কে নিবি রসের মতিচুর।
নিত্যানন্দ রসের পুর॥
ঐ যে দুঃখীর তাপীর জুড়াতে প্রাণ,
পাতলে দোকান শ্রীগৌর,
কিবা সন্ধ্যা কিবা সকাল,
যখন যাও নাই কালাকাল,
টাটকা রসে ভরা গাল, অতি রসাল সুমধুর॥

ওহো। এমন, দিন কি আসিবে? ভিক্ষার সাধ কি পুরিবে? গাছ, পাতা, পশু, পক্ষী, গিরি, নদী সকলে বলিয়া

দাও, এ মরম যাতনা কবে আমার মিটিবে। জগতের এক কোণে পড়িয়া আছি, বলিয়া দাও, কবে সে মহাকাশে উড়িব। আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ সে অনন্ত প্রাণে ভাসিতে চায়। বলিয়া দাও সাধক। কোন্ পথে কাহার সাথে সে অনন্ত কক্ষে ছুটিব। সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথে প্রাণের ভিতর পুরিয়া প্রাণের কথা বলিতে বড় সাধ যায়। সেই প্রেমদলমল নবর মূরতি বুকের ভিতর পুরিয়া দরবিগলিতাশ্রুধারে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুর সুচারু চরণতলে বাসনার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিব। সেই ভুবনমোহন দিগ্‌ভরা মাধুরির ধারায় বাসনা চরিতার্থ করিব। সেই রাসরসিক রসেশ্বরের রসময় তরঙ্গে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। তবেই ত ভিক্ষা মিটিবে। তবেই ত প্রাণ আমার প্রফুল্ল সহস্র দল কমলের ন্যায় হাসিয়া উঠিবে। অহো! সে শুভদিন কি হইবে না? দরিদ্রের পর্ণকুটীরে দানসখা কি দেখা দিবেন না?

ওহো! আমি কি পাগল!—যাহা কখনও দেখিতে পাইব না, তাহাই দেখিতে যাইতেছি। ভিখারী হইয়া রাজরাজেশ্বরের দরবারে বড় দুঃসাহসে চলিয়াছি। রাজদর্শনে যাইতে হইলে সঙ্গে উপহার লইতে হয়। আমি কিন্তু শূন্য হাতে শূন্য প্রাণে উলঙ্গ দেহে চলিয়াছি। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা যাহা কিছু উপহার দিব, এ হৃদয়ে তাহা কিছুই নাই। সংসারের দাবদাহে সকলই পুড়িয়া গিয়াছে, সকলই ছাই হইয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ চিতাভস্ম তাঁহাকে উপহার দিব। তাঁহার রাজদরবারের সুবর্ণ-সিংহাসনে এ প্রেত হৃদয়ের শবাসন বিছাইয়া দিব। তিনি তাহাতে বসিবেন, আমি তাঁহাকে বসাইব। তাঁহার

সম্মুখে নিবৃত্তির খর্পরকুণ্ডে আমার সমস্ত বাসনার বলিদান দিব। সেই ছিন্ন বাসনার মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে দুলাইয়া দিব। তিনি নাচিবেন, আমি নাচিব, ত্রিজগৎ নাচিবে। তাঁহার ভৈরব হুঙ্কারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থর থর কাঁপিয়া উঠিবে। তাঁহার অট্ট অট্ট হাসে গগনতল ভাসিয়া যাইবে। তাঁহার দিগম্বর আলু থালু বেশের বিকট তাণ্ডবে দিগ্‌দিগন্ত টলমল করিয়া উঠিবে। তখনই আমার কামনা মিটিবে,—ভিক্ষা পূরিবে।

মায়া মমতা।

—*—

দুঃখপূর্ণ সংসার এত রমণীয় বোধ হয় কেন? জ্বালা যন্ত্রণাময় জগৎ এত মধুর বলিয়া মনে হয় কেন? নিরাশার উষ্ণ নিশ্বাস যাহার মজ্জাগত ধর্ম্ম, নির্যাতনের হা হুতাশ যাহার শিরায় শিরায় নিহিত, এমন বিষম বিষধর অমৃতপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় কেন?—মায়া মমতার প্রলোভন আছে বলিয়া। মায়া মমতা আছে বলিয়াই, সংসারের চিতাভস্ম স্বর্ণ-রেণু বলিয়া বোধ হয়। মায়া মমতা আছে বলিয়াই এ প্রেত-ভূমে শৃগালের হুহুঙ্কার, কোকিলের ঝঙ্কার বলিয়া বোধ হয়। মায়া মমতা আছে বলিয়াই এ ঘোর গহন অরণ্যানী বিলাস-ময় ক্রীড়াকানন বলিয়া বোধ হয়। মায়া মমতা আছে বলিয়াই এ কটু কঠোর দুর্ভেদ্য বজ্র সুকোমল কুসুমাস্তরণ বলিয়া মনে হয়! সংসার-বৃক্ষে মায়া মমতাই ফুটন্ত ফুল, সংসার-মরুভূমে মায়া মমতাই অমৃতের নির্ঝরিণী। সংসার-

কালরাত্রির করাল অন্ধকারে মায়া মমতাই শুভ্র জ্যোৎস্না। মানুষের এত পরিশ্রম এত কষ্টময় জীবন-সংগ্রাম সমস্তই সহিয়া যাইতেছে, মায়া মমতার জন্য। মমতার প্রশান্ত ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া, মানুষ সংসারের সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়, সংসারের সকল ব্যথা, মমতার অমৃত নিষেকে মানুষের মর্ম্মতল হইতে মুছিয়া যায়। কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রম-জনিত অবসাদ মমতার মদিরা পানে কাটাইয়া মানুষ নবোৎসাহে জীবন্ত হইয়া উঠে। মানুষের শিথিল মর্ম্মগ্রন্থি, মমতাভিষিক্ত হইয়া পুনরায় সতেজ সবল হইয়া উঠে। সুতরাং মমতার শক্তি মর্ম্মস্পর্শিনী

মায়া মমতা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি, ধন জন পরিবারাদির প্রতি আন্তরিক টান। ইহাকে আসক্তি বল, ভালবাসাই বল, একই কথা। দার্শনিক ভাষায় বুঝিতে হয়, যে বৃত্তি পরকে আপনার করিয়া লইতে চায়, বিভক্তকে সংযোজিত করিয়া লইতে চায়, পৃথক্‌কে সম্মিলিত করিয়া লইতে চায়, বিভিন্নকে আত্মীয় করিয়া লইতে চায়, তাহাই আসক্তি বা মায়া মমতা। সাধারণতঃ চলিত অর্থে মায়া মমতার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। দার্শনিক অর্থে মায়া মমতার গণ্ডী ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায়। দার্শনিক অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, মায়া মমতার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার যো নাই, মায়া মমতার সুবিশাল গর্ভে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া রহিয়াছে। ভিখারী হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত, গৃহস্থ হইতে অরণ্যবাসী উদাসীন পর্য্যন্ত, মনুষ্য হইতে দেবলোক পর্য্যন্ত মমতার দাস নয় কে? অপরকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, ভালবাসার

সামগ্রীকে করামলকবৎ করিবার জন্য জগতে চেষ্টিত নয় কে? গৃহী ধন জন পরিবার পাইবার জন্য লালায়িত, বিদ্যার্থী বিদ্যা পাইবার জন্য ব্যগ্র, সম্মানার্থী সম্মান পাইবার জন্য উৎসুক, জ্ঞানার্থী জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যস্ত, দেবতা অমৃত পাইবার জন্য ব্যাকুল। নিঃসম্বল ভিখারী একখানি জীর্ণ বস্ত্র পাইলেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। ভালবাসার ধনকে পাইবার জন্য আবেগ, প্রিয়তম পদার্থের সহিত মিলিত হইবার জন্য আন্তরিক টান, ইহাই ত মমতা। এ মমতার উপাসক জগতে নয় কে? সুখের সামগ্রীর প্রতি আনুরক্তি জগতে কাহার নাই? প্রিয়তম বস্তু পাইবার পিপাসা জগতের সকলেরই সমান। এ অংশে কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য নাই। পার্থক্য কেবল প্রিয়তার চিত্র লইয়া—সুখের আদর্শ লইয়া। অর্থগৃধ্নু জীব আমরা অর্থকেই সমস্ত সুখের আদর্শ মনে করি, তাই অর্থের প্রতি আমাদের মায়া মমতা। টুকটুকে ঝকঝকে খেলেনা দেখিয়া, বালকের মন ভুলিয়া যায়, খেলেনা পাইলে সারাদিন সমস্ত ভুলিয়া, সে তাহাতে মজিয়া থাকিতে পারে, খেলেনার জন্য সে মাকে ভুলিতে পারে, পিতাকে ভুলিতে পারে, আহার নিদ্রাকে ভুলিতে পারে, খেলেনার এমনি মাহাত্ম্য, তাই বালকের খেলেনার প্রতি মায়া মমতা। যুবতীর হাসিমাখা মুখখানিকে যুবক সুখের সার সর্ব্বস্ব মনে করেন, তাই যুবতীর জন্য যুবকের মায়া মমতা বা আসক্তি। আবার অত্যুৎকট দার্শনিক, পুরুষ নিজের উচ্চ চিন্তাকেই সাংসারিক সমস্ত সুখের বরণীয় বলিয়া মনে করেন, তাই তিনি গভীর

চিন্তার প্রেমে পাগল, সেই চিন্তার প্রতি তাঁহার মায়া মমতা বা আসক্তি। একটা সত্য ঘটনা মনে হইতেছে। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের যখন বিশেষ চর্চা ছিল, সেই সময়কার এক জন বিশিষ্ট নৈয়ায়িকের কথা বলিতেছি। তিনি এক দিন নিজ কুটীরে বসিয়া শাস্ত্র চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে এক জন ধনী জমিদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া নৈয়ায়িক-পত্নীর বড়ই আনন্দ হইল, অদ্য কিছু লাভ হইবে ভাবিয়া তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। জমিদার নৈয়ায়িকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈয়ায়িক তখন একখানি ন্যায়-শাস্ত্রের পুঁথি নিবিষ্টমনে দেখিতেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন। বাহ্য জগতের প্রতি তাঁহার খেয়াল নাই। সুতরাং জমিদারের দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই হইল না। গুণগ্রাহী জমিদার কোনরূপ আদর অভ্যর্থনা না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া যাইবার সময়, করযোড়ে নৈয়ায়িককে বলিলেন, মহাশয়। আমি জমিদার, আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আপনার গৃহে আসিয়া কিছু দান না করিয়া, আমার যাওয়া উচিত নহে। আপনার যাহা কিছু অভাব—অনুপপত্তি আছে, জানাইলে আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। জমিদারের কথা শুনিয়া সেই চিন্তা-বিভোল নৈয়ায়িক তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ পুঁথিখানির একখানি পাতা তুলিয়া, জমিদারের হাতে দিয়া বলিলেন, পুস্তকের এই স্থানটা ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। বহু চিন্তা করিয়াও ইহার অর্থ লাগাইতে পারিতেছি না। ইহাই আমার অভাব-

অনুপপত্তি। যদি দয়া করিয়াই আমার কষ্ট মোচন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, ত এই স্থানটা আমায় বুঝাইয়া দিউন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত অভাব অনুপপত্তি মিটিয়া যাইবে। নৈয়ায়িকের প্রার্থনা শুনিয়া জমিদার স্তম্ভিত হইলেন, সম্মান-সহ পুনরায় বলিলেন, মহাত্মন্। এ অভাব পূরণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। অন্য কোন সাংসারিক অভাব বলিলে, আমি তাহা পূর্ণ করিতে পারি। নৈয়ায়িক বলিলেন, আমার যাহা অভাব, তাহা এইমাত্র আপনাকে বলিলাম, ইহা ছাড়া আর আমার সাংসারিক কোন অভাব নাই। ব্রাহ্মণীর গুণে সাংসারিক কোন কষ্টই আমার নাই। তিনি অতি যত্নের সহিত শাকান্ন প্রতিদিন রন্ধন করিয়া প্রস্তুত করেন, আমি তাহা পরমানন্দে ভোজন করিয়া থাকি। সুতরাং আপনার কাছে আর আমার কিছু চাহিবার নাই। ব্রাহ্মণী কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর এই সকল কথা শুনিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন। সদাশয় জমিদার যাইবার সময় ব্রাহ্মণীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া গেলেন।

তুমি আমি অর্থকে যেমন ভালবাসি, বালক খেলে-নাকে যেমন ভালবাসে, যুবক যুবতীকে যেমন ভালবাসে, নৈয়ায়িক শাস্ত্র-চিন্তাকে সেইরূপ ভালবাসিয়াছিলেন। খেলাতে মজিয়া বালক মা বাপ ঘর বাড়ী সমস্তই ভুলিয়া যায়, যুবতীতে মজিয়া যুবক পৃথিবী ভুলিয়া যায়, সেইরূপ গভীর চিন্তাতে মজিয়া নৈয়ায়িক টাকা কড়ি বাহ্য সংসার সমস্তই ভুলিয়াছিলেন। আবার যিনি ধার্ম্মিক ভক্ত, তিনি ভগবানের জন্য মজিয়া সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্য ভুলিয়া যাইতে পারেন।

তোমার আমার পক্ষে টাকা যেমন সুখেব সামগ্রী, যুবকেব পক্ষে যুবতী যেমন সুখের সামগ্রী, চিন্তাশীলেব পক্ষে চিন্তাই তেমনি শান্তিব প্রস্রবণ, ভক্ত ধার্ম্মিকের পক্ষে ভগবৎপ্রসঙ্গ তেমনি আনন্দবর্দ্ধক। অর্থ ঐশ্বর্য্যে, পুত্র স্ত্রীতে যে মধু আমবা আস্বাদ কবি, চিন্তা ও ভগবৎ-প্রসঙ্গে দার্শনিক ও ভক্ত সেই মধুই উপভোগ কবিয়া থাকেন। তাহাব স্বরূপতঃ তাব-তম্য কিছুমাত্র নাই, কেবল শ্রেণীগত বিভেদ থাকিতে পারে। তুমি আমি শত চেষ্টা কবিয়াও বুঝিতে পাবি না, চিন্তাশীলের চিন্তায় কি সুখ, ভক্তেব ভগবদ্ গুণানুবাদে কি সুখ। বিষ্ঠাব কীট শত চেষ্টা কবিলেও কি বুঝিতে পাবে, বসগোল্লা খাইলে কি সুখ হয়? তুমি আমি বুঝি আর না বুঝি, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। চিন্তাশীল সুখ না পাইলে চিন্তায় আসক্ত হইবেন কেন? ভক্ত সুখ-না পাইলে ভগবদ্ভাব-বসে ডুবিবেন কেন? কেন না, আসক্তি লালসা যে, সুখের বস্তুব জন্যই হইয়া থাকে। যে মমতা বা আসক্তি, তোমাকে আমাকে সংসারেব দাস কবে, অর্থেব জন্য পিশাচ করিয়া তুলে, সেই মমতাই গভীর জ্ঞানীব হৃদয়স্থ হইয়া, তাঁহাকে জ্ঞান-রাজ্যের সেবক কবিয়া তুলে। যে মমতা বা ভালবাসা কামুককে কামিনীব পাদোদক-পিপাসু করে, সেই ভালবাসাই প্রেমিক ভক্তকে ভগবচ্চবণ-পঙ্কজের কাঙ্গাল করিয়া দেয়। যে বৃষ্টিব বাবিবিন্দু নিম্বফলে পতিত হইয়া তিক্তরসে পরিণত হয়, সেই বাবিবিন্দুই পক্ক আম্র-ফলে পতিত হইয়া সুস্বাদু রসের সৃষ্টি কবে। যে প্রস্ফুটিত কুসুম বিলাসীব হাতে পড়িলে বাইজীব শিরোভূষণ হয়, সেই

কুসুম সাধু উপাসকের হস্তে পড়িলে দেবতার চরণতলে উৎসর্গীকৃত হয়। যে গঙ্গার জল শুঁড়ির হাতে পড়িলে মদ্যে পরিণত হয়, ভগবৎসেবকের হাতে পড়িলে, সেই গঙ্গার জল দেবতার চরণামৃত হইয়া দাঁড়ায়। মায়া মমতা স্বভাবতঃ বাস্তবিকই গঙ্গার জল। সংসার-কীটের বিলাস-ভাণ্ডারে পড়িয়া উহা মাদকতায় পরিণত হয়, সাধুর কমণ্ডলুতে পড়িয়া উহা দেবতার চরণে নিবেদিত হয়। নারিকেল জল কাংস্য-পাত্রে রাখিলে মদ হইয়া যায়, তাহার মধুরতা মিষ্টতা বিকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ মায়া মমতা সংসারে আবদ্ধ রাখিলে, মোহময়ী মদিরা হইয়া দাঁড়ায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদ মদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ।"

আবার তাহাকেই ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিলে, তাহাই (অমৃত ভক্তি) হইয়া যায়। আমরা মমতাকে অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল করিয়া ফেলিয়াছি, চন্দনের পরিবর্ত্তে বিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছি, অমরাবতীর মাধুরীমাখা সামগ্রীকে নরক কুণ্ডে ভাসাইয়া দিয়াছি। ব্যবহার দোষে সাগরসেঁচা মাণিককে আমরা ধূলিধূসরিত করিয়াছি, নির্ম্মল শারদীয় শশধরে গাঢ় কলঙ্ক কালিমার প্রলেপ দিয়াছি, স্বর্গীয় সৌদামিনীর জলন্ত দ্যুতিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছি। ব্যবহার করিতে জানিনা বলিয়াই, মমতা আসক্তি আমাদের বন্ধনের কারণ হইয়াছে,—পুষ্পমালা আমাদের নাগপাশ হইয়াছে। এমনই আমাদের দুরদৃষ্ট !!!

মিলন।

মিলনই সৃষ্টির ভিত্তি। মিলনই সৃষ্টির গূঢ় রহস্য। মিলন লইয়াই জগৎ। একটি পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, নদ নদীর সহিত মিলিত হইতেছে, পাহাড় পর্ব্বত আকাশের সহিত মিলিতেছে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, পরস্পর মিলিতেছে, বৃক্ষ লতার সহিত মিলিতেছে, পতি পত্নীর সহিত মিলিতেছে, পুত্র পিতার সহিত মিলিতেছে, চারিদিকেই মিলনের বিচিত্র লীলা। জগৎ মিলনের জন্য লালায়িত। জগতের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখিতে পাই, মিলনের বিচিত্র প্রহে-লিকা। মনুষ্য সমূহ মিলিত হইয়া মনুষ্য সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। পশুসমূহ মিলিত হইয়া পশু সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। বৃক্ষ সমষ্টি মিলিত হইয়া, গহন কাননরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। ক্ষুদ্র জল-কণা রাশি মিলিত হইয়া মহাসাগররূপে আবির্ভূত হইয়াছে ক্ষুদ্র বালুকণা স্তরে স্তরে জমিয়া প্রকাণ্ড তট প্রদেশ সৃষ্টি করি-তেছে। বিকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া, বিশাল পর্ব্বতের বিরাট দেহের জন্ম দিতেছে, বিচ্ছিন্ন পরমাণু কণা সম্মিলিত হইয়া, অনন্ত পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছে, সুতরাং মিলনই সৃষ্টির শিরোদণ্ড। সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় মিলনের সূক্ষ্ম সূত্র বিরাজ করিতেছে। যেমন একটি পুষ্পমালার সূত্র ছিঁড়িয়া গেলে পুষ্পগুলি চারিদিকে ছত্রাকার হইয়া ছড়াইয়া

পড়ে, সেইরূপ জগতের অন্তর্নিবিষ্ট এই মিলন-সূত্রের তিরো ভাব হইলে পরমাণু-কণা বিশীর্ণ হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইতে পারে। মিলনই জগৎকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, মিলনের সূক্ষ্ম শক্তি কেন্দ্রাভূত হইয়া অলক্ষিতভাবে জগৎকে নির্যমিত—পরিচালিত করিতেছে।

বাহ্য জগতে যেমন মিলনের মহামেলা, অন্তর্জগতেও সেইরূপ মিলনের বিচিত্র প্রভাব। যাত্রার দলে বেহালাদার যে সুর দেয়, সেই সুরে সুর মিশাইয়া গায়কগণ যেমন গাহিয়া যায় সেইরূপ মনোময় জগতে অন্তঃকরণ যে ইঙ্গিত করে, সেই ইঙ্গিতানুসারে ইন্দ্রিয়গণ মিলিত হইয়া কার্য্য করে। মধুমক্ষিকা শ্রেণীর মধ্যে মক্ষিকাগণের দলপতি যে দিকে উড়িতে থাকে, সমস্ত মধুমক্ষিকা সেই দিকেই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। হস্তিযূথের মধ্যে হস্তিরাজ যে দিকে দৌড়িয়া যায়, হস্তিসমূহ সেই দিকেই প্রধাবিত হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়াধিপতি অন্তঃকরণ যে পথের পথিক হন, ইন্দ্রিয়গণের সেই দিকেই বৃত্তি (ক্রিয়া) হইয়া থাকে। যূথভ্রষ্ট হস্তী যেমন উন্মার্গগামী হয়, সেই রূপ দলভ্রষ্ট মনের অবাধ্য ইন্দ্রিয় বিপথগামী—বিকার-গ্রস্ত হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই কয়েকটি উপভোগ্য বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে রহিয়াছে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন রূপকে বিষয় করে, অর্থাৎ রূপ যখন চক্ষুর গোচরীভূত হয়, তখন দর্শনাত্মিকা বৃত্তির উৎপত্তি হয়, এইরূপ রসনা রসকে যখন বিষয় (গ্রহণ) করে, তখন আস্বাদাত্মিকা বৃত্তির উদয় হয়। এই যে দর্শনাদি বৃত্তি (জ্ঞান), ইহার উৎপাদনে কেবল একাকী ইন্দ্রিয়

সমর্থ নহে। বিষয়, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও আত্মা, এই চারি জনে মিলিত হইয়া এক একটি বৃত্তিকে উৎপাদন করে। প্রথমে বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়, ইন্দ্রিয় মনের সহিত, অনন্তর মন আত্মার সহিত সংবদ্ধ হয়, তবে বৃত্তির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কোন দ্রষ্টব্য বিষয়কে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রথমে গ্রহণ করিলে, সেই বিষয়ের একটা প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণে পতিত হয়, অন্তঃকরণ আবার সেই প্রতিবিম্ব আত্মাতে সংক্রামিত করে। তখন "আমি ঘট দেখিতেছি" ইত্যাকার বৃত্তির উদয় হয়। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ উভয়ই জড়পদার্থ। কোন বস্তু প্রকাশ করিতে ইহাদের স্বতঃ সামর্থ্য নাই। ইহারা যে বিষয়টিকে আহরণ করে, আত্মার চৈতন্যাংশ তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং বৃত্তির উৎপত্তিতে আত্মার সাহায্য অপেক্ষিত হইতেছে। আবার কেবলই আত্মাদ্বারা বৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মা স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়, নিঃসঙ্গ, নির্লেপ, যেমন স্থির সমুদ্রের অগাধ গম্ভীর জল গতিহীন নিস্তরঙ্গ, আত্মাও সেইরূপ নিস্তরঙ্গ, সমুদ্র হইতে খাল কাটিলে সেই গতিহীন জলেরও যেমন নিম্নাভিমুখী ক্রিয়া হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মার প্রকাশ-শক্তির প্রবাহ হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় আত্মার প্রকাশ-শক্তি প্রবাহিত হইবার যন্ত্রস্বরূপ অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ। এই দ্বার দিয়াই আত্মা উপভোগ্য বিষয় সমূহে বৃত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন, সুতরাং বৃত্তি সম্বন্ধে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়েরও আবশ্যকতা আছে। অতএব পরস্পরের মিলিত সাহায্যে বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে,

ইহা বুঝা গেল। অতএব আধ্যাত্মিক জগতেও মিলন-শক্তি রাজত্ব করিতেছে, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

সৃষ্টির মূল তত্ত্ব কার্য্য-কারণ-বাদ অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই, মিলনের অলঙ্ঘ্যনীতি সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিতেছে। একটা মৃণ্ময় ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে দণ্ড, চক্র, চীবর, কপালদ্বয় ও কুম্ভকার এই কারণসমষ্টি চাই। কেবল একটা দণ্ড, কেবল একটা চক্র, কি কেবল একজন কুম্ভকার একটা ঘটকে কখনও উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু দণ্ডাদি কারণ সমূহ মিলিত হইয়া একটা ঘটকে উৎপন্ন করে। কোন কারণ একাকী কার্য্য জননে সমর্থ নহে। কার্য্যোৎপত্তির জন্য কারণ সমষ্টির প্রয়োজন। এইজন্য সাংখ্যকারিকা ব্যাখ্যাকালে বাচস্পতি মিশ্র এক স্থানে বলিয়াছেন "নহি কিঞ্চিদেকং স্বকার্য্যে পর্য্যাপ্তং কিন্তু সম্ভূয়" "কোন কারণ একাকী স্বকার্য্য জননে পর্য্যাপ্ত (সমর্থ) নহে কিন্তু কারণান্তরের সহিত মিলিত হইয়া," কারণের এই মিলন-নীতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মবাদীরা একটা আশঙ্কার উত্তর দিয়া থাকেন। নাস্তিকেরা আশঙ্কা করিয়া থাকে যে, ঈশ্বর আস্তিকের মতে নিঃস্বার্থ কারুনিক অপক্ষপাতী, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি জগতে কাহাকেও দুঃখী করিয়া কাহাকেও বা সুখী করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এতদুত্তরে আস্তিক বলেন, কোন কারণই একাকী স্বকার্য্য-জননে সমর্থ নহে ইহা যখন সার্ব্বভৌমিক অখণ্ডনীয় নিয়ম হইল, তখন ঈশ্বরেও এই নিয়ম থাকিতে পারে। জগদীশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সহকারী কারণের

সহিত মিলিত হইয়া এই জগৎরূপ কার্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্ম বৈচিত্র্যনিবন্ধন জীব সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহাতে ঈশ্বরকে দোষী করা যাইতে পারে না। কারণান্তরের সাহায্য লইয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তারও ক্রটি হইতেছে না। কারণান্তরের সাহায্য লওয়াও সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তি ও ইচ্ছার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, কেননা কর্তৃত্বাদি গুণ জড় প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। আত্মা জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি নিষ্ক্রিয় উদাসীন, তাঁহার কোন চেষ্টা নাই, কোন ব্যাপার নাই। তাঁহাকে ক্রিয়াবান স্বীকার করিলে প্রকৃতির মত তিনিও পরিণামী—অনিত্য হইয়া পড়েন। সুতরাং জগতের আদি কারণ প্রকৃতি, আত্মা আদি কারণ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত। প্রকৃতিই যদি একাকী জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী হইলেন, তাহা হইলে এখানে মিলনের নিমিত্ত রহিল না? ইহার উত্তরে সাংখ্য বলিতেছেন, ঈশ্বর (আত্মা) সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন বটে, কিন্তু তিনি "অধিষ্ঠাতা"। কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি-বিষয়ে আত্মা যে কিছু মাত্র সাহায্য করেন না, তাহা নহে। আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে না। চেতনের সংযোগেই অচেতনের ক্রিয়া হইয়া থাকে। চেতন পুরুষের হস্তে থাকিয়াই অচেতন কুঠার কাষ্ঠচ্ছেদন রূপ ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃতি যে কোন ক্রিয়া করুন না কেন আত্মার সান্নিধ্য তাঁহার প্রয়োজন। প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি ক্রিয়া বিষয়ে আত্মা নিজ সান্নিধ্য মাত্র দ্বারা

প্রকৃতিকে উপকৃত করিয়া থাকেন। প্রকৃতির পরিচালনে তিনি কোন ব্যাপার করেন না। প্রকৃতিকে জগৎ সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি কোন সঙ্কল্প করেন না। তাঁহার সন্নিধিমাত্রেই নিদ্রিত প্রকৃতি জাগিয়া উঠে, জড় প্রকৃতিতে ক্রিয়া শক্তি ফুটিয়া উঠে। আত্মার বৈদ্যুতিক সাহচর্য্যে বিচলিত—সংক্ষুব্ধ হইয়া প্রকৃতি জগৎসৃষ্টিতে অগ্রসর হয়। অয়স্কান্তমণির (চুম্বক পাথর) সাহচর্য্যে বক্ষোবিদ্ধ লৌহ শলাকা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে কেন?—অয়স্কান্ত মণি ত লৌহশলাকাকে হাত দিয়া টানিয়া বাহির করে না, তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য ত তাহার কোন সঙ্কল্পেরই উদয় হয় না, তথাপি কি জানি, সেই মণির সাহচর্য্যের এমনই গুণ যে, লৌহশলাকা বহির্নিঃসরণ-ক্রিয়া না করিয়া থাকিতে পারে না। সেইরূপ আত্মার কোন ব্যাপার না হইলেও তৎসান্নিধ্যেরই এমনই গুণ যে, প্রকৃতি সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মা জগতের অধিষ্ঠাতা, কারণ (কর্ত্তা) নহেন, যেমন কুম্ভকার কুম্ভের কর্ত্তা (নিমিত্ত কারণ), আত্মা সেইরূপ জগতের নিমিত্ত কারণ নহেন। কুম্ভ নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রথমে কুম্ভকারের মনে একটা সঙ্কল্পের উদয় হয়, তদনন্তর কুম্ভকার হস্ত প্রয়োগাদি ব্যাপার দ্বারা দণ্ডাদি পরিচালন পূর্ব্বক কুম্ভনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আত্মা সেইরূপ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া হস্ত প্রয়োগাদি ব্যাপার দ্বারা প্রকৃতির পরিচালন করিয়া জগৎসৃষ্টি করেন না। কেননা, আত্মা সঙ্কল্প বিকল্প বিবর্জ্জিত, ব্যাপার রহিত, কিন্তু কেবল তাঁহার সান্নিধ্য মাত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া

করিয়া থাকে, সুতরাং আত্মা কারণ নহেন। যে ব্যাপার-বিহীন, তাহার কারণতা সম্ভবে না। জগতের সম্বন্ধে আত্মার ব্যাপার কারণ রূপ কর্তৃত্ব নাই, এইজন্য তাঁহাকে কারণ বলা যাইতে পারে না। বেশ কথা, কিন্তু জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধে তাঁহার সান্নিধ্য রূপ সাহচর্য্য ত অপেক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলেও চলিতেছে না। এইজন্য সাংখ্য শাস্ত্র মাঝামাঝি গোছের তাঁহার একটা নাম রাখিলেন, "অধিষ্ঠাতা।" তাঁহার কারণতা না থাকুক, কিন্তু অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। যদি তাঁহার কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়া পূর্ণ স্বাধীন ভাবে প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারিত, তাহা হইলে প্রকৃতিকে জগতের একাকী সৃষ্টিকর্ত্তী বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। যখন প্রকৃতিকে সৃষ্টি সম্বন্ধে পদে পদে আত্মার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে, তখন সৃষ্টির এই মৌলিক ভিত্তিতেও মিলনের নিয়ম সূক্ষ্মভাব বিরাজ করিতেছে, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বুঝা গেল, সৃষ্টির উৎপত্তি মিলনে, সৃষ্টির বিকাশ মিলনে, সৃষ্টির পরিণতিও মিলনে। অদ্বৈত-বাদী জগতের এ মহামিলন-সূত্র পুড়াইয়া ফেলিতে চাহেন। তাঁহার মতে জগতের কোথাও কিছুই নাই। সকলই মিথ্যা, সকলই ভোজবাজী, একমাত্র তিনি (পরম ব্রহ্ম) সত্য। যখন তাঁহা ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন কে কাহার সহিত মিলিত হইবে? অবিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে অবিদ্যা মিথ্যা, সুতরাং অবিদ্যার মিলনও মিথ্যা। এই

মিথ্যা হইতে মিথ্যাভূত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্যবহারিক অবস্থায় মিলন, সৃষ্টি, কার্য্যকারণ ভাব, এ সমস্ত সত্য হইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক অবস্থায় এ সমস্ত বস্তুতঃ অসৎ। একমাত্র ব্রহ্ম সৎস্বরূপে বিদ্যমান। মিলিত হইবার বস্তুই যখন নাই, তখন মিলনও নাই। সুতরাং অদ্বৈত-বাদী মিলনকে ঘৃণা করেন। দুইটী নহিলে মিলন হয় না সুতরাং মিলন দ্বৈতদৃষ্টিকে ডাকিয়া আনে, দ্বৈত-দৃষ্টি অদ্বৈতবাদীর চক্ষে বন্ধনের কারণ, তাই অদ্বৈত-বাদী মিলনকে পদাঘাত করেন। অদ্বৈতবাদী মিলনের সূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করেন, দ্বৈতবাদী ভক্ত মিলনের সেই ছিন্ন পুষ্পমালা কুড়াইয়া গলদেশে দুলাইয়া বিভুর দরবারে যাইতে চাহেন। অদ্বৈতবাদী মিলনের প্রসাদেই জগৎ দেখিতে পাইয়াছেন, মিলনের শক্তিতেই জগতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এ মিলনের অন্নে প্রতিপালিত পরিপুষ্ট হইয়া পরিশেষে মিলনের বিরুদ্ধেই তিনি অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু দ্বৈতবাদী ভক্ত মিলনকে সাধনাজগতের অনুকূল করিয়া লইয়া মিলনের মঙ্গলময় বিজয়-গাথা গাহিতে গাহিতে পরম বিভুর প্রেম সম্মিলনে মিলিত হইয়া তাঁহার অনন্ত সত্তায় মিশিয়া যান।

অভাব হইলেই মিলন হয়, আকাঙ্ক্ষা হইলেই পরিপূরণ হয়। শূন্যতার পরই সৃষ্টি ইহাই নিয়ম। সুতরাং অভাব-মূলকই মিলন। মিলনের হেতু অভাব-বুদ্ধি। যে বাস্তবিক ধনের অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে, লক্ষ্মী নিশ্চয়ই তাহাকে দয়া করিবেন, যে বাস্তবিকই বিদ্যার অভাব অনু-

ভব করিতে পারিয়াছে, সরস্বতী নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবেন। ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, যশ বল, ধন বল, ইহাদের কোন একটীর প্রকৃত অভাব-বুদ্ধি জন্মিলে তাহা কিছুতেই অপূণ থাকে না। তবে প্রকৃত অভাব-বুদ্ধি জন্মান কঠিন কথা। আমাদের হৃদয়ে শত সহস্র অভাব-বুদ্ধি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোন একটী অভাবের পূরণ হয় না কেন? কেন না, কোন বিষয়ে আমরা তীব্র অভাব অনুভব করিতে পারি না। যদি মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া কোন একটী অভাবে নিয়োজিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে শত সহস্র অভাব ঘুরিয়া বেড়াইবে কেন? তীব্র অভাব কখনই অপূণ থাকে না। পৃথিবীতে জলীয় শক্তির অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ বর্ষার সমাগম হয়, পিপাসু চাতকের জলের অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ মেঘের উদয় হয়। জগতে ধর্ম্মের অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ ভগবানের অবতার রূপে আবির্ভাব হয়, অভাব হইলেই পূরণ হয়, অভাব হইলেই প্রার্থিত বস্তুর মিলন হয়, কিন্তু প্রকৃত অভাব-বুদ্ধি জন্মিলে তবে ত।

সাধনা ও তর্ক।

সংসারে সকল পদার্থেরই দুইটী পৃষ্ঠ। ধর্ম্মেরও দুইটি পৃষ্ঠ আছে। একটী সাধনা, অপরটী তর্ক। একটী অনুষ্ঠান, অপরটী মত। একটী কার্য্য, অপরটী সংপ্রসঙ্গালাপ। ধর্ম্ম কার্য্যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত কথা, ধর্ম্মের বার্ত্তালাপেও পুণ্য হয়, কিন্তু অপুণ্যও হইতে পারে। ধর্ম্মের সুতর্ক সাধুকে সুপথে লইয়া যায়, ধর্ম্মের কুতর্ক অসাধুকে অপথে লইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মের তর্ক আশঙ্কাশূন্য নহে। সাধনা ধর্ম্মের বিজ্ঞানরূপ অংশ, তর্ক ধর্ম্মের দর্শনরূপ অংশ। বিজ্ঞান কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করে। দর্শন কেবল চিন্তা লইয়াই লীলা করে। যাহারা দার্শনিক, তাহারা প্রায়ই কার্য্য-পরায়ণ হয় না, হাতে হেতেলে কোন কার্য্য করিতে পারে না। যাহারা কার্য্যশীল শিল্প নৈপুণ্য-পরায়ণ বৈজ্ঞানিক তাহারা দার্শনিকের মত চিন্তাশীল হইতে পারে না। কার্য্যশীল অথচ চিন্তাশীল, শিল্পী অথচ দার্শনিক, এমনতর লোক জগতে বড়ই বিরল। অথচ এইরূপ লোক দ্বারাই জগতের উন্নতির আশা করা যায়। যাঁহার দর্শন, বিজ্ঞানের চরণ চুম্বন না করে, যাঁহার দর্শন-পক্ষী উচ্চ চিন্তার আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া বিজ্ঞান-শিল্পময় কার্য্যক্ষেত্রের পিঞ্জরে আবদ্ধ না হয়, তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে জগতের বিশেষ উপকার সাধিত হয় না। সেইরূপ যাঁহার ধর্ম্মতর্ক, ধর্ম্মবিচার, সাধনার

পদরেণু শিরোধার্য্য না করে, তাঁহার তর্ক সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। সাধনা ও তর্ক পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যখন অনুকূল পথে চালিত হয়, তখনই কল্যাণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। কেবল ন্যায় শাস্ত্রের কূটতর্কে ধর্ম্মজগতের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল বৈষ্ণব বাবাজীর কর্ত্তা ভজা ধরণের গোঁড়ামিময় সাধনা লইয়া আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা নাই। ন্যায়ের তর্ক ও বৈষ্ণবের সাধনা পক্ষীর দুই পক্ষের মত এক যোগে এক ভাবে মিলিত হইলে তবে ধর্ম্ম-সাধক ধর্ম্মের উচ্চ আকাশে উড্ডীন হইতে পারেন। ধর্ম্মের সাধু তর্ক বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করে, ধর্ম্মের সাধনা হৃদয় প্রস্তুত করে। বিকৃত হৃদয়ে অধর্ম্মময় প্রবৃত্তির তরঙ্গ উঠিলে ধর্ম্মের মননময় তর্ক তাহা নিবারণ করিতে পারে, ধর্ম্মের হৃদয় কিন্তু প্রস্তুত হইলে তাহাতে অধর্ম্ম-বিকারের বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেই পারে না। সুতরাং তর্ক বা সাধনা দুইই চাই। সাধনা হৃদয়ের নিজস্ব, তর্ক বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা পাতাইয়া থাকে। হৃদয় ও বুদ্ধি এই দুইটিকে পবিত্রকৃত করিতে হইলে সাধনা ও তর্ক দুইই চাই। সাধনায় হৃদয় শতবার বিধৌত হইলেও তীব্র প্রবৃত্তির তাড়নায়—বলীয়ান্ প্রলোভনের বেগে তাহা যখন বিচলিত হইয়া উঠে, তখন তর্কের—বিচার-বুদ্ধির চরণে শরণ লইতেই হইবে। মহাদেবের ন্যায় মহা যোগীন্দ্র পুরুষের চিত্ত যখন পার্ব্বতীকে সম্মুখে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সাধনা-মার্জ্জিত বিচার বুদ্ধির সাহায্যে পুনরায় সংযম-শক্তিকে আহ্বান করিয়া মহাদেবকে চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিতে হইয়াছিল। কুন্তীর মত পরম সুন্দরী

মাতাকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিচলিত হইত। কিন্তু ললাট ফলকে অঙ্কিত জল-রেখার ন্যায় তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি-মার্জ্জিত হৃদয়ে তাহা ক্ষণমধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। সুতরাং দুর্ব্বল হৃদয়কে বলবৎ করিবার জন্ত বিচার-বুদ্ধিরও আবশ্যক।

কিন্তু সাধনা-বিবহিত যে বিচার-বুদ্ধি, তাহা ধর্ম্মরাজ্যে প্রশস্ত নহে। তাহা কেবলই তর্ক। সাধনাকে সঙ্গিনী করিয়া যে বিচার-বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহারই ফল অমৃতময়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে কেবল দার্শনিক তর্ক লইয়া যাঁহারা সাধনাময় আর্য্য-ধর্ম্মকে টলাইয়া দিতে চাহেন,—তাঁহারা ভ্রান্ত। দার্শনিক তর্কে সাধনার ধর্ম্ম কখনও উড়িতে পারে না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রসূত তর্ক দ্বারা একজন হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিত বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু একজন হিন্দুধর্ম্মের সাধক তাহাতে বিচলিত হইবেন কেন? মিষ্টান্নের মধুর রস যে নিজে আস্বাদ করিয়াছে, তাহাকে মিষ্টান্ন অম্লরসপূর্ণ, এ কথা শত তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেও সে তাহাতে বিশ্বাস করিবে কেন? আর্য্যধর্ম্ম কেবল চিন্তা বা তর্কের ধর্ম্ম নহে, ইহা সাধনার ধর্ম্ম—অনুভবের সামগ্রী। ধর্ম্ম-তত্ত্বের গুহ্য প্রহেলিকার উন্মেষ করিতে গিয়া আজ হয় ত তোমার চিন্তায় কুলাইয়া উঠিল না, কিন্তু সেই চিন্তা-চক্ষুকে সাধনারাগ-রঞ্জিত করিয়া লইলে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

চিন্তা কখনও সাধনাকে পরাজিত করিতে পারে না। দর্শন কখনও বিজ্ঞানকে হঠাইয়া দিতে পারে না। দর্শন যুক্তি আঁকিয়া যে সত্যের প্রতিবাদ করিবে, বিজ্ঞান আঁকে অনায়াসে হাতে কেতেলে যন্ত্র তাঁরে প্রস্তুত করিয়া যে সত্যকে যদি আবিষ্কৃত

কা'ব তবে দর্শনকে বিজ্ঞানের কাছে মাথা হেঁট করিতেই হইবে তোমার বিশুষ্ক মস্তিষ্কের চিন্তা আজ ধর্ম্মের যে সত্যকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিল সাধক সাধনার বলে আজ যদি সে সত্যকে জীবন্ত জাগ্রত করিতে পারেন, তবে তোমার চিন্তা নিতান্তই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। চিন্তা অনুমিতি সাধনা প্রত্যক্ষ। অনুমিতি অপেক্ষা প্রত্যক্ষের বল বেশী। অনুমিতি বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দিতে পারে না বরং প্রত্যক্ষ দ্বারাই অনুমিতি বাধিত হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যাপার সাধনাকে অনুমিতিরূপ চিন্তা কখনই উড়াইয়া দিতে পারে না তাই চিন্তা বা তর্ক অপেক্ষা সাধনা বলীয়সী।

সাধনা বির্জ্জিত যে চিন্তা বা দর্শন শাস্ত্র তাহাতেই নাস্তিকতা আসে। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষায় ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চায় বেশীর ভাগ নাস্তিকতারই মূলে জল সিঞ্চন হয় কেন? সাধনার সংস্পর্শ নাই বলিয়া। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে দার্শনিকতার সঙ্গে সাধনার যোগ থাকিলে মণি কাঞ্চনের সংযোগ হয়। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই অপূর্ব্ব সংযোগের পরিণাম। তিনি যেমন দার্শনিক পণ্ডিত, তেমনই সাধক ছিলেন। তিনি যেমন তার্কিক সেইরূপ অনুভূতিমান জ্ঞানীও ছিলেন। তাই তাঁহার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্ম্ম দার্শনিক যেমন মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন সাধক সেইরূপ হৃদয় ভাণ্ডার ভরিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধগণের পাণ্ডিত্যের কিছুই ত্রুটি ছিল না, তর্ক বিতর্কে সামর্থ্যের কিছুই অভাব ছিল না, তথাপি তাহাদের পতন হইল কেন? সাধনার অভাব হইয়াছিল বলিয়া। তাই বলিতেছি, সাধনা বিরহিত চিন্তা ধর্ম্মরাজ্যে প্রামাণ্য নহে।

সাধকের সাধনা-কৌশলের কাছে তার্কিকের তর্ক দাঁড়াইতে পারে না। কুস্তিবাজের সামান্ত কৌশলে বীর মল্লকেও পরাজিত হইতে হয়। সাধকের কথা অন্তর্ভেদিনী। মর্ম্মতলে গিয়া সে কথা আঘাত করে। তার্কিকের তর্ক কিছুক্ষণের জন্ম মস্তিষ্ককে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক চমকের ন্যায় তাহা নিমেষের মধ্যেই কোথায় বিলীন হইয়া যায়। সাধকের বজ্রগম্ভীর ভাষায় পাষণ্ডকেও দমিয়া যাইতে হয়। তিনি যে দেশের গুপ্ত সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে অপার্থিব ধামের অপূর্ব্ব মাধুরী তাঁহার আত্মায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই তেজ, সেই ভাব, সেই আলোকে তিনি যাহা বলেন, তাহা অন্যের পক্ষে হিতকর আজ্ঞাবাক্য হইয়া উঠে। তিনি যাহা অনুষ্ঠান করেন, তাহা অন্যের পক্ষে আদর্শ হইয়া উঠে। তিনি যে স্থানে বাস করেন, তাহা তীর্থস্থান হইয়া উঠে। তাঁহার প্রতিনিঃশ্বাসে আকাশ পবিত্র হয়, তাঁহার প্রতিপাদক্ষেপে ধরিত্রী ধন্যা হয়। আর্য্য ধর্ম্ম এই সাধকের ধর্ম্ম বলিয়াই এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের সাধনাংশ যেমন ধার্ম্মিকের ধন, ইহার দর্শনাংশ সেইরূপ তার্কিকের যুদ্ধক্ষেত্র। আর্য্য ধর্ম্মের সাধনাংশই প্রাণ তর্ক তাহার বাহ্য শরীর। সাধনা আর্য্য ধর্ম্মের গৃহলক্ষ্মী। দর্শন তাহার পরিরক্ষক অভেদ্য দুর্গ। আর্য্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সাধনা ও তর্কের এইরূপই সম্বন্ধ।

হাঁসি।

আহা কি মধুর কথা! কি অমৃতের লহরী অক্ষরে অক্ষরে উথলিয়া উঠিতেছে! কি স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রত্যেক উচ্চারণে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এমন অমিয় রসপোরা মুখভরা মোহন ভাষা কে সৃজিল? এমন সাধের সামগ্রী জগতে কে আনিল? যাহার নামের এত সৌন্দর্য্য, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভাষার এত গরিমা, না জানি সে জিনিষের কত মহিমা, কত মনোহারিতা। সোণার আবরণে যে বস্তু লুকান থাকে, দেবতার রত্ন-মন্দিরে যে জিনিস সাজান থাকে, না জানি তাহার কত মূল্য, কত আদর। হাঁসি সেই অমূল্য আদরের বস্তু। দুঃখ-বহ্নির অবসানে শান্তির সুবাতাস যে স্থানে লীলা করে, তাহাই হাঁসির অমর নিকেতন। হাঁসি না থাকিলে সংসার ছারখারে যাইত। এ নিদারুণ মরুভূমে হাঁসিই অমৃত বল্লরী, এ ভীষণ প্রেতভূমে হাঁসিই জলন্ত জীবনী শক্তি, এ দারুণ নিরুৎসব মন্দিরে হাঁসিই অপূর্ব্ব প্রতিভা, এ নীরস শুষ্ক সাগরে হাঁসিই রস ভাণ্ডার। হাঁসির শ্বেত মূর্ত্তি যে গৃহে যে পরিবারে বিরাজ করে না, সেতো অলক্ষ্মীর গুপ্ত ভাণ্ডার। সেথায় মা লক্ষ্মীর পদধূলি পড়ে না। নিরাশার প্রেত মূর্ত্তি সে আবাসে নাচিয়া বেড়ায়। সেথায় রোদনের দাবানলে দেবতার কৃপা বারিও শুকাইয়া যায়, তাই বলি হাঁসির মাহাত্ম্য অনন্ত।

বসন্তের ফুটন্ত গোলাপ ফুলে, শরতের পূর্ণ শশাঙ্কে, মধুকরের মধুচক্রে, যে সৌরভ, যে শোভা, যে আস্বাদ নাই; হাঁসির বিরাট

কলেবরে তাহা সবই আছে। দেবতার নন্দন কাননে যে শোভা নাই, অপ্সরার কলকণ্ঠে যে উন্মত্ততা নাই, শিশুটীর কচি মুখের আধ আধ হাঁসিতে তাহা আছে। প্রভাতের শীত বায়ু মৃদুস্পর্শে যে আমোদ নাই, সুরধুনীর রজত বক্ষে আনুলায়িত হিল্লোলে যে সুধা নাই, পতিপ্রাণা সতীর পবিত্র হাঁসিতে তাহা আছে। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে যে কমনীয়তা নাই, সদানন্দ সাধু পুরুষের প্রাণভরা গালভরা, বুকভরা হাঁসিতে তাহা নিত্য বিদ্যমান। তাই বলি হাঁসি সংসারের ফেল নহে। অমরবাসের সমগ্র মোহিনী শক্তি মথিত করিয়া বিধাতা এ চারু মুক্তাবলী আমাদের কোষাগারে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা বড় অপদার্থ, তাই এমন পরমধনে হেলায় হারাইতে বসিয়াছি। তাই শ্মশানের মর্ম্মভেদী চীৎকার দিন দিন বাড়িতেছে। তাই বিষাদের বিষম কালিমায় নিরানন্দের অভেদ্য আবরণে বসুধা দিন দিন আঁধারে ডুবিয়া যাইতেছে। সুবর্ণের সাজ বানরকে পরাইলে সে তাহার মর্ম্ম কিছু বুঝে না। জহুরী বিনা হীরককে কেহ চিনিতে পারে না তাই সংসারের হতভাগ্য মানব এ বিধাতৃদত্ত পরম ধনের মর্ম্মতত্ত্ব কিছু বুঝিল না। অপথে কুপথে ইহার অপব্যয় করিতেছে। ডবানন্দে মজিয়া ভূতগ্রস্ত হইয়া বিকৃত হাঁসি হাঁসিতেছে। হাঁসির সুঠাম সুন্দর ছায়াকে কালির রেখায় অঙ্কিত করিতেছে। পূজার কুসুম বিষ্ঠা কুণ্ডে ডুবাইতেছে। দেবতার বরমাল্য নারকীর গলদেশে পরাইতেছে। অমৃত ভাণ্ডারে বিষের বটীকা বোঝাই করিতেছে।

হায়! কেন এমন হইল? সিত পক্ষের শারদীয় শুভ্র চন্দ্রমায় কেন এমন কলঙ্কের দাগ পড়িল। পাকা সোনায়

কেমনে এত খাদ মিশিল ? স্বর্গীয় হাঁসির শ্বেতমুখে সংসারের অপবিত্রতাময় আঁধার কেন এত মিশিল ? এক জনের হাঁসিতে এক জনের প্রাণ নাচিয়া উঠে, হৃদয় মাতিয়া উঠে, আনন্দে গলিয়া যায় ? আবার কেন এক জনের হাঁসিতে অপরের মাথা জলিয়া যায়, মরমের পরতে পরতে বিষ ঢালিয়া দেয়। হায়! কেন এমন বিপর্য্যয় ঘটিল ? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? নির্জ্জনে বসিয়া কত চিন্তা করি, কিছুরই ঠিকানা পাই না। যতই ভাবিতে যাই, ততই যেন আকাশে ডুবিয়া যাই—দিশাহারা আত্মহারা পাগল হইয়া যাই। তাই ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি "কেন এমন হলো"।

দেখ, আকাশের চাঁদ আকাশে আপনি উঠে, আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আপনার আনন্দে আপনি গদগদ হইয়া সে কত হাঁসি হাঁসে, কেহই তাহাকে হাঁসিতে বলে না, তবুও সে হাঁসে, তাহার হাঁসিতে আকাশ ভাসিয়া যায়, দিগন্ত পূরিয়া যায়, সে হাঁসির ধারা চকোরে আশ মিটাইয়া পান করিয়াও ফুরাইতে পারে না। আহা! কেমন চমৎকার হাঁসি! কি জানি সে হাঁসির কেমন মাধুরী! সে হাঁসি দেখিয়া আমরাও হাঁসিয়া ফেলি, সে আমাদিগকে হাঁসিতে বলে না, অথচ আমাদের মন প্রাণ আত্মা সে হাঁসি দেখিয়া পুলকে না হাঁসিয়া থাকিতে পারে না। আবার সে হাঁসির সঙ্গে সঙ্গে থরে থরে কত প্রাণীর অন্তরাত্মাও আনন্দে আকুল হইয়া হাঁসিয়া উঠে। কেমন অনন্তের লীলা! এক জনের হাঁসি জগতে একটি বিরাট হাঁসির সৃষ্টি করিল, জড় জগৎ ও প্রাণি জগৎ উভয়কেই মাতাইল।

বস্তু বাহাদুরি! আমরি মরি, কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হাঁসি! আবার ঐ দেখ গিরিবালা নির্ঝরিণী বিপুল কায়া বিস্তার করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে গড়াইয়া পড়িতেছে, ভাগীরথী সাগরে মিশিয়া হাসিতে হাঁসিতে চলিয়া পড়িতেছে। দিগঙ্গনা আকাশের সাথে মিশিয়া নিথরে চুপে চুপে প্রাণের হাঁসি হাঁসিতে হাঁসিতে এলাইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির অনন্তরাজ্যে সকলেরই মুখে অতুল হাঁসি। কেবল মনুষ্যেরই মুখে বিষাদের কালিমা, জ্বালা যন্ত্রণার গভীর রেখা। যে টুকুও বা হাঁসি, জোনাকি পোকার মত দুঃখের নিশীথে ক্ষণে ক্ষণে চমকিতেছে, তাহাও ক্ষণপ্রভার মত অচিরেই অন্ধকারে বিলয় পাইতেছে, আবার তাহাতে তেমন মধুও ক্ষরিয়া পড়ে না, তেমন সুমিষ্ট উদারতা টুকুও ঝরে না, ঝরিবেই বা কোথা হইতে? সে হাসি যে প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হয় না, তাহার পরতে পরতে পাপময় বিকৃতির ছাপ লাগিয়া যায়। তাই সে হাঁসিতে তেমন ব্যাপকতা তেমন পবিত্রতা স্ফূর্ত্তি পায় না, তাই সে হাঁসিতে সকলের মন মোহেনা।

বড় দুঃখের কথা, সামান্য জড় পদার্থ আজি চেতনেরও মাথা হেঁট করাইল। নিস্পন্দ জড়শক্তি আজি তীব্র চিতি শক্তির ঘাড়ে চড়িয়া বসিল। পদ রেণু আজি শিরোভূষণ হইয়া দাঁড়াইল। এ আক্ষেপ কোথায় রাখিব? মানুষ জড়ের মত হাঁসিতে পারিল না, তাহার হাঁসি সরলতা পবিত্রতা ছড়াইতে ছড়াইতে প্রত্যেক হৃদয়কে মাতাইতে পারিল না। ধিক্কার মানুষের জ্ঞান গর্ব্বকে! ধিক্কার মানুষের বৃদ্ধি বিদ্যাকে!

মানুষের সমস্ত সম্পত্তি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাউক, তাহার উন্নত আশা শিলাতলে নিষ্পিষ্ট হউক।

ভাই! চিরকালটাই কি শোকে দুঃখে কাটাইবে, চিরকালটাই কি ভবঘুরে সাজিয়া ভবের বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিবে? আসিবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে সংসারের নূতন যাত্রী হইলে। * যাইবার সময়েও কি কাঁদিতে কাঁদিতেই যাইতে হইবে? চিনিব বলদের মত কেবল সংসারের বোঝা বহিয়াই মরিলে, চিনিব স্বাদ টুকু পাইলে না, একি কম দুঃখ? একবার হাঁসত ভাই! প্রাণ মন খুলিয়া একবার আনন্দের হাঁসি হাঁসত ভাই। সংসারের পরপারে দাঁড়াইয়া একবার ভাই হাঁস! মূলাধারে প্রাণারামের প্রাণভরা হাঁসিমুখ দেখিয়া পুলকে একটিবার হাঁস! সে হাঁসি দেখিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হাঁসিয়া উঠুক। পাতায় পাতায় লতায় লতায় সে হাঁসির সুধা ক্ষরিয়া পড়ুক। তবেই জগৎ ছাড়িয়া যাইবার সময়েও সকলকে হাঁস' হয়া নিজেও হাঁসিতে হাঁসিতে নিজ নিকেতনে যাইতে পারিবে। ভাই হাঁসি! কতকাল হইল আমরা তোমার সাদা মুখের বিচিত্র চিত্র ভুলিয়া গিয়াছি। পরপদ-তাড়নে আমাদের প্রাণ, মন, আত্মা সকলই বিষাদে ধসিয়া গিয়াছে। তোমার ব্যাপক পবিত্র ক্রোড়ে আমাদিগকে টানিয়া লও। আঁধারের ছায়া মুছাইয়া আমাদের বদনে তোমার বিশাল শ্বেতমূর্ত্তির বিকাশ করিয়া দাও, তোমার প্রসাদে আমাদের ঘরে ঘরে আনন্দের ভেরী পুনরায় বাজিয়া উঠুক।

---

* ভূমিষ্ঠ হইয়াই বালক কাঁদিয়া উঠে।

কোথা জুড়াই।

কত আশা ভরসা লইয়া এ জগতে আসিয়াছিলাম, তাহা কেহ জানে না। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে কত যে বাসনার মল্লিকাফুল ফুটিত, তাহার মধুর সৌরভ জগতের লোকে কেহ কখনও পায় নাই। হৃদয়ের বনভূমে যে ফুল আপনা আপনি ফুটিত, তাহার মধু পান করিতে ভ্রমর কখনও যায় নাই সত্য, বন-দেবতারা তাহা তুলিয়া কখনও— শিরোভূষণ করে নাই সত্য, করুক আর না করুক, তথাপি সে ফুল না-ফুটিয়া থাকিতে পারিত না। মাটি জল ও বীজাদির মহাড়ম্বরে যে ফুল তোমার বাগানে ফুটে, বসন্তের মৃদু মধুর বায়ু ও চন্দ্রমার বিমল জ্যোৎস্নায় যে ফুল তোমার বাগান আলো করে, তাহার কথা দূরে রাখিয়া দাও। ঐ যে অনন্ত আকাশের গায়ে বিনাড়ম্বরে নীরবে স্বভাবের ঘোরে পড়িয়া পুট পুট করিয়া নক্ষত্রগুলি ফুটিতেছে, ঐদিকে তাকাও দেখি। আমার এ হৃদয় মন্দিরে ঐরূপ কতই না ফুলরাজি ফুটিয়াছিল, অমৃত বল্লরীর ফলে ফুলে পল্লবে এ হৃদয় কানন কতই না অলঙ্কৃত সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হায়! একে একে সে ফুলগুলি ঝরিয়া গিয়াছে। সংসারের দাবানলে সে লতা পাতা ফল ফুল পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে! আহা! সেই যে তমালের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল মৃদু মধুর গাথা গাহিত, সেই যে

শান্তির ঝঙ্কারে পাপিয়া শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীর ক্রোড়দেশে বসিয়া আপনারই মনে আপনারই তানে অমৃত লহরীর ফোয়ারা খুলিয়া দিত, হায়। সে সমস্ত প্রলয় পবনে ভাসিয়া গিয়াছে। কেবল বিদগ্ধ কাষ্ঠবাশি বীভৎস কঙ্কাল মালা এ প্রেতরাজ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, হেথায় শৃগাল গৃধিনী কুক্কুর কুক্কুরী কত ছুটাছুট করিতেছে, রায়ু, মেদ মজ্জা মাংসের টুকরা লইয়া পিশাচের দল কাড়াকাড়ি— হুড়াহুড়ি করিতেছে। আর এ যাতনা সহ্য করিতে পারি না। যদি অন্তর্যামী হও অন্তরের পর্দায় পর্দায় খুলিয়া দেখ, সমস্তই খাক হইয়া গিয়াছে, বলিয়া দাও, কোন পথে যাই, বুঝাইয়া দাও। কোথা জুড়াই।

"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই
ফিরি ঘুরি আসি কত কাঁদি হাসি—
কোথা যাই সদা ভাবিব তাই।"

ঐ যে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তুমি বলিতেছ, এই দিকে আইস, আমি ও পথে যাইব না, হাঁসি খুসি আহ্লাদ আমোদ উৎসাহ উদ্বেগের পসরা থরে থরে চারিদিকে সাজাইয়া তুমি আমায় ভুলাইতে চাও, তাহা আমি বুঝি ঐ আনন্দের গুপ্ত নিকেতনে নন্দনের পারিজাত মন্দাকিনীর ফুটন্ত কমল ও দেবতার অমৃত ভাণ্ডারের প্রলোভন দেখাইয়া তুমি আমার জালে জড়াইতে চাও, তাহা আমি জানি। সংসারের প্রেত মূর্ত্তি বাম হস্তে চাপিয়া মনোমোহন কমনীয় কান্তি মগ্ন ছবিটুকু তুমি আমায় কেবল দেখাইতে চাও

আমি তাহাতে মজিব না। ঐ সুখের ধারে দুঃখ, ঐ হাঁসির ধারে কান্না, ঐ সম্পদের ধারে বিপদ, ইহাতে জুড়াইতে পারিব না, ঐ যে জীবন-তটিনীর ধারে ধারে মরণের কণ্টকবন, কুসুম কাননের ধারে ধারে হিংস্র জন্তুর বিকট মূর্ত্তি, ইহাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে চাহে না। এই যে শরতের পূর্ণ চন্দ্রমা সম্মুখে দাঁড়াইয়া কত সাধের হাঁসি হাঁসিতেছিল, দেখিতে দেখিতে অমাবস্যার কাল রজনী সহসা তাহাকে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। এই সৃষ্টির পর প্রলয়, বিহারের পর সংহার, এ দারুণ যাতনা আর কতকাল সহিব? যাহাকে গড়িয়াছ, তাহাকে আবার ভাঙ্গিয়া চুরমার কর কেন? যাহাকে আশা দিয়া বাচাইয়া রাখিয়াছ, তাহার সে ক্ষীণ অবলম্বন আবার কাড়িয়া লও কেন? যাহাকে যাহা দিয়াছ, তাহাই আবার তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লও কেন? এ-দেওয়া নেওয়া এ নিমজ্জন উন্মজ্জন, এ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তুমুল আবর্ত্তে আর কত কাল ঘুরিব। যদি সাগরে ডুবাইতে হয়, ত চির দিনের জন্য একেবারে ডুবাইয়া ধর, আর যেন উঠিতে না হয়। আর যদি ভাসাইতে হয় ত অনন্তের বক্ষে যেন চিরদিন ভাসিতে পারি, তাহারই ব্যবস্থা কর। একবার ডোবা একবার উঠা, একবার জীবন একবার মরণ, এ দোভাষা দোটানায় অকূল স্রোতে পড়িয়া তৃণের ন্যায় যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছি, ইহার কি গতিরেখা পড়িবে না? বিপদের একটানা স্রোত অবিরত টান, তাহা বুক পাতিয়া সহিব, অথবা সম্পদের একতান প্রবাহে ভাসিয়ে দাও, কিছু তাহাও ত :দিবে না, কেবল দিয়ে,

বিপদের পর সম্পদ, সম্পদের পর বিপদ। বিপদের পর আবার সম্পদ আবার হাঁসি আবার কান্না। এই একের পর দুই, দুয়ের পর তিন, তিনের পর আবার এক, ইহার ধারা আর কত কাল চলিবে? এই বিবর্ত্তের পর পরিবর্ত্তন, এই বিরামের পর পরিণাম, এ পরিণামবাদের কি অবসান হইবে না? এই ফুলটি ফুটিল, এই তাহার গন্ধ চারিদিকে ছুটিল, এই মধুপেয়ারা ভোমরা দলে দলে আসিয়া তাহার কাছে জুটিল, মনোমোহন মধুর শোভায় বাগান আলো হইয়া উঠিল। আহা! এ কেমন শান্তিময় কমনীয় দৃশ্য! কিন্তু হায়! আবার পর ক্ষণেই দেখি, সূর্য্য কিরণে ফুলটী শুকাইয়া গিয়াছে, গাছ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে, মাটীর সংস্পর্শে তাহা পচিয়া উঠিয়াছে। দুর্গন্ধে ক্রিমিকীট নৃত্য করিতেছে। বল, দেখি কেন এমন হয়? এ প্রফুল্লতার ধারে মলিনতা এ সৌন্দর্য্যের ধারে কদর্য্য এইরূপ বৈপরীত্যে কাহার ইচ্ছা চরিতার্থ হইতেছে? জানি না এ পরিণামনীতির শেষ কোথায়? কত কাল ধরিয়া কত যুগযুগান্ত ধরিয়া এ পরিণাম-সাগরের ভিতর দিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতে ভাসিতে দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে, কে জানে, কে বলিতে পারে?

পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব, যদি জগতে পরিণাম না থাকিত, তাহা হইলে জগতের ভাল মন্দ সমস্তই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইত। পরিণামই পুরাণতার ধারে নবীনতা, স্ফূর্ত্তির ধারে বিষণ্ণতা আনিয়া দেয়। পরিণামই ধর্ম্মের পর ধর্ম্মান্তর অবস্থার পর অবস্থান্তর লক্ষণের পর লক্ষণান্তর সম্মুখে ধরিয়া দেয়। এই ধর্ম্ম, লক্ষণ, অবস্থার বিভিন্নতাময় পরিণাম-চক্র

চিরদিন ঘুরিতেছে। •এই সুবর্ণবলয় ভাঙ্গিয়া সুবর্ণকুণ্ডল প্রস্তুত হইল, ইহা সুবর্ণ রূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম পরিণাম, এই কুণ্ডলরূপ ধর্ম্মের যে নূতনত্ব পুরাতনত্ব অবস্থা, তাহা অবস্থা পরিণাম, এই অবস্থার আবার যে ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অতীততারূপ সাময়িক পরিণাম, তাহার নাম লক্ষণ পরিণাম ; এই ত্রিবিধ পরিণামই জগতে বৈচিত্রীর উৎপাদন করিতেছে।

চারিদিকেই দেখি, বিচিত্রতার বিজয়-বৈজয়ন্তী পত পত রবে উড়িতেছে। এ বৈচিত্রী, এ পলকে পলকে জগতের বিভিন্নতা, এ চাঞ্চল্যের তীব্র প্রবাহ, এ অস্থৈর্য্যের ঘূর্ণ আবর্ত্ত বড়ই যন্ত্রণাময়। এ দারুণ আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে চাহি না। এ ভীষণ ঘর্ঘর চক্রে জুড়াইতে পারিব না। তবে বলিয়া দাও কোন্ পথে যাই, বুঝাইয়া দাও, কোথা জুড়াই। এই পরিণাম-তত্ত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া তুমি ঐ যে নিথর নিস্পন্দ নিঝুম কূটস্থ দীপ্তিময় পথের কথা বলিতেছ উহা বড় দুর্গম, ক্ষুদ্র সামর্থ্যের কণিকা লইয়া ও পথে কেমন করিয়া যাইব জানি উহাতে বিভিন্নতা, পরিবর্ত্তন, পরিণাম কিছুই নাই কিন্তু ও নিস্তরঙ্গ গভীর সাগরে সহসা কেমন করিয়া ঝাঁপ দিব। পরিণামের ক্রোড়ে আমি চিরদিন লালিত পালিত, পরিবর্ত্তনের জালে আমার প্রকৃতির অণুপরমাণু বিজড়িত, আমি সহসা অপরিণামিতার—স্থিরতাব গম্ভীর সাগরে কেমন করিয়া ডুবিতে পারি বল দেখি। যে বিষ্ঠার কীট, বিষ্ঠার রসে চিরদিন যাহার রসনা তৃপ্তি পাইয়াছে, সহসা অমৃত-কুণ্ড তাহার সম্মুখে ধরিলে সে তাহা কিছুতেই চাহিবে না। একটা গল্প মনে হইতেছে। একটা শূকরের উপর মহাদেবের দয়া হইল

মহাদেব বলিলেন, বাছা শূকর! তোমাদের দুঃখ আমি আর দেখিতে পারি না। তোমাদের জন্য আমি স্বর্গে বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি। তোমরা আমার সহিত স্বর্গে আইস। শূকর একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, এ কথাটার উত্তর আমি এখনই ধাঁ করিয়া দিতে পারি না। শূকরীর সহিত এ বিষয়ে একবার পরামর্শ করিতে হইবে। মহাদেব তথাস্তু বলিলেন। তার পর শূকরীকে ডাকা হইল, শূকরী বলিল, আচ্ছা স্বর্গে যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে, বেশ কথা। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেখানে বিষ্ঠা খাইতে পাওয়া যাইবে ত। মহাদেব বলিলেন, না বাপু, সেখানে উহা মিলিবে না, সেখানে অমৃত পাওয়া যাইবে। তখন শূকরী নাক্ সিট্‌কাইয়া বলিল, আরে রাম, যেখানে আমাদের খাদ্যই মিলিবে না, সেখানে কি যাইতে আছে। সেখানে গিয়া কি অনাহারে মরিব? শূকরীর যখন অমত হইল, তখন শূকরেরও সেই মতে মত দিতে হইল। মহাদেব অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তাই বলিতেছি, সংসারের বিষ্ঠাকুণ্ডে বিষ্ঠা ভোজন করিতে করিতে আমাদের রসনার প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে, মুখ খারাপ হইয়া গিয়াছে। এখন বিষ্ঠা আমাদের পক্ষে অমৃত, অমৃত আমাদের পক্ষে বিষ্ঠা। এ কলুষিত মুখ এ কলুষিত হৃদয় ভক্তির পবিত্র গঙ্গাজলে ধুইয়া, পরিষ্কার ঝরঝরে করিয়া লইতে হইবে। তবে জ্ঞানামৃতের স্বাদ আমরা বুঝিতে পারিব। আমি সাধনা ফলস্বরূপ ভক্তির কথা বলিতেছি না, যাহা প্রেম-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ, তাহার কথা হইতেছে না। তাহা

আমাদের . অধিকারের বহুদূরে। যাহা সাধন—ভক্তি, যাহা জ্ঞানের অঙ্গ, তাহা লইয়াই আমাদের কথা। এই জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব—উভয়ের যুগল মিলন ইহাই পরম সুন্দর, ইহাই প্রার্থনীয়। ভক্তি ছাড়া জ্ঞান, ঘিয়ে ভাজা রসগোল্লার মত বিস্বাদ। ভক্তি মাখা জ্ঞান, রসে ডুবান রসগোল্লার মত মিঠে। এই মিঠে কড়া কড়ি ও কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই শান্তির প্রস্রবণ।

কাশীর মণিকর্ণিকা শ্মশানে নিদারুণ বহ্নিশিখা চির-দিন জ্বলিতেছে। ঐ জ্বলন্ত চিতাস্তূপে কত রাশি রাশি মৃত দেহ পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, আবার সেই মণিকর্ণিকার নিম্ন দিয়া তরতর বাহিনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। শ্মশানের ভস্মরাশি বুকে করিয়া ভাগীরথী নৃত্য করিতে করিতে কি জানি কোন্ দিকে উধাও হইয়া ছুটিয়াছেন। একদিকে জ্ঞানের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া যেন সংসারের পাপ তাপ পুড়াইয়া ফেলিতেছে, অপরদিকে ভক্তির অমৃত নির্ঝরিণী যেন শীতল সলিল ধারায় ভস্মরাশি বিধৌত করিয়া কুলু কুলু রবে অনন্তের পথে ছুটিয়াছে। আহা! এ কেমন মধুর! এ কেমন সুন্দর! জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব মিলন সাধকের গুপ্ত ভাণ্ডারেই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধকশ্রেষ্ঠ নারদ ঋষি জ্ঞানের পরপারে পৌছিয়াছিলেন বলিয়াই দেবর্ষি এই আখ্যা পাইয়াছেন। আবার ভক্তির সাগরে ডুবিয়াছিলেন বলিয়াই হরিগুণ গানের জন্য বীণাযন্ত্র কাঁধে করিয়া রহিয়াছেন। এক হস্তে কমণ্ডলু, অপর হস্তে বীণা-যন্ত্র, একদিকে জ্ঞানের জ্বলন্ত আগুণ, অপরদিকে প্রেমাশ্রু,

এ বিচিত্র চিত্রের অভিনয় এক নারদ ঋষিই দেখাইয়া গিয়াছেন। জনক রাজা পারেন নাই, তিনি শুষ্ক জ্ঞানী, ধ্রুবও পারেন নাই, তিনি কেবলই ভক্ত। আজ জ্ঞানী ভক্তের জ্বলন্ত ছবি যদি কেহ দেখিতে চাও ত নারদের কাছে আইস। নারদ প্রেমে মাতোয়ারা, ভাবে বিভোর, আবার জ্ঞানে ঋষি। তিনি প্রেমে উচ্ছ্বলিত, আবার জ্ঞানে উজ্জ্বলিত। এ আগুণ ও জলের একত্র সমাবেশ তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন।

কাশীধামেই জ্ঞান ও ভক্তির যুগল মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। কাশীর কেন্দ্রস্থলে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সুবর্ণোজ্জ্বল মন্দির দিক্ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার তাহারই সন্নিকটে মা অন্নপূর্ণার শান্তিময় অধিষ্ঠাননিকেতন চির-বিরাজ করিতেছে। বিশ্বনাথের দিকে যখন তাকাই, তখন বোধ হয়, জ্ঞানের জ্বলন্ত হুতাশনে যেন সমগ্র সংসার পুড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, আবার মায়ের দিকে যখন তাকাই, তখন দেখি ত্রিতাপতপ্ত জীবকে শান্তির জলধারায় ডুবাইবার জন্য আনন্দময়ী মা যেন হাত তুলিয়া ডাকিতেছেন। এক দিকে শ্মশান ও অপরদিকে শান্তিনিকেতন, একদিকে জ্বলন্ত আগুণ অপরদিকে প্রেমবারি, এ দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। এক দিকে চিন্ময়ী মূর্ত্তি বিকট তাণ্ডবে নৃত্য করিতেছে, অপর দিকে প্রেমময়ী মা করুণার কটাক্ষে মধুর হাঁসি হাঁসিয়া আশা ভরসার অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছেন। পিতা মাতার এ যুগল মিলন আর কোথাও দেখিয়াছ কি। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৃদয় যদি শান্তির রসে ডুবাইতে হয়, তবে পিতা মাতার শরণ লও। যদি জুড়াইতে চাও, তবে অগ্রে

প্রেমমন্দাকিনীতে ঝাঁপ দাও। তাহারই ভিতরে জ্ঞানামৃত পান করিতে পাইবে। হৃদয়ের মরুভূমে যদি বসন্তের ফুল ফুটাইতে চাও, তবে অগ্রে মা অন্নপূর্ণার চরণোদকে তাহা সিক্ত কর। হতাশ জীবের জুড়াইবার স্থান যদি কিছু থাকে, আশা ভরসার অবলম্বন যদি কিছু থাকে, তবে ঐ চরণ দুখানি।

অধিকার তত্ত্ব।

পূর্ণ অধিকার লইয়া ভবের হাটে কেহ আসে নাই। এক এক বিন্দু সামর্থ্য লইয়া তুমি আমি সকলেই এই মহা মেলায় জড হইয়াছি। এই এক একটী বিন্দুকে সাগরে পরিণত করিতে হইবে, এক একটী অঙ্কুরকে ফল পল্লবের নধর শোভায় সাজাইতে হইবে। সমস্ত অংশগুলি পাকিয়া পাকিয়া ফলটী যখন লাল টুক্ টুকে হইয়া দাঁড়ায়, সমস্ত পাপ্‌ড়ি গুলি ফুটিয়া ফুটিয়া কমলটি যখন চারিধার সুগোল সুঠাম, প্রাণারাম হইয়া দাঁড়ায়, সমস্ত কলা গুলি পুরিয়া পুরিয়া ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া চাঁদটি যখন শোভায় ভরপূর হইয়া দাঁড়ায়, তখনি তাহাদের সুধাময় সৌরভে সকলেরই মন মাতিয়া উঠে। এম্‌নি করিয়াই অফুটন্ত শক্তি গুলি ফুটিয়া ফুটিয়া অপূর্ণ অধিকার গুলি পুরিয়া পুরিয়া এই সংসার-সরোবরে মানুষরূপ পদ্মটী যখন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া বিকশিত হন, তখনই তাঁহার শোভা জগতে ধরে না, তাঁহার

ঝলমলময়ী বিভা জগৎকে হাঁসাইয়া তুলে। কিন্তু যিনি এই অস্ফুটন্ত শক্তি গুলি ফুটিতে না ফুটিতেই, অপূর্ণ অধিকার গুলি পূরিতে না পূরিতেই মহান্ হইতে যান, তিনি নিতান্ত অমানুষ। ধীবে ধীবে এক পা এক পা করিয়া স্বর্গের দিকে চলিয়া যাও, তোমার মার নাই। কিন্তু একেবারে লাফাইয়া অধিকারের গণ্ডীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তুমি যদি স্বর্গেব উচ্চমঞ্চে পৌছিতে যাও, তবে তোমার ইহ পরকাল মাটি হইবে, লোকে টিট্‌কাবী দিবে খঞ্জপদে ভগ্নমনে বসিয়া পড়িবে। তাই বলি, মানুষ হইয়া মর্কট সাজা ভাল কি ?

অপূর্ণ সকল জিনিষেরই একটি সীমা আছে, অবধি আছে। তোমাব শক্তিরাশির অধিকাবেবও একটা সীমা আছে। সীমাব মাঝারেই আমরা লালিত পালিত। সীমাই আমাদের আশ্রা নিকেতন। যতক্ষণ এই সীমাব মাঝারে আমবা ঘুবিয়া বেডাইব, খেলাধূলা করিষা বেডাইব, ততক্ষণই আমাদেব মঙ্গল, ততক্ষণই আমাদের উন্নতি। সীমা যাই ছাড়াইব, গণ্ডী রেখা যাই উল্লঙ্ঘন করিব, আর অমনি বিপদে পড়িব, তাহাতে আর কথাটি নাই। যে দুগ্ধপোষ্য শিশু পায়ে ভব কবিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই, হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে শিখে নাই, তাহাকে কোলে রাখিও, তাহার কচি কচি হাত পা গুলি বুকের ভিতবে যতনে লুকাইয়া রাখিও। কোলই তাহার সীমা—তাহাই তাহাব গণ্ডী। গণ্ডীটি ছিঁড়িলেই তোমাব সাধের ননির পুতুলটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে। আনন্দের বল্লরী অকালে শুকাইবে। পিঞ্জরে থাকিয়া থাকিয়া যে পাখী অনন্তকে ভুলিয়াছে, পাখা বদ্ধ হইয়া

গিয়াছে, তাহাকে একেবারে পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া দিও না সে অনন্ত দেখিয়া চমকিয়া উঠিবে, শিরায় শিরায় কাঁপিয়া উঠিবে, উড়িতে পারিবে না, ক্ষুধার্ত্ত বিড়ালে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। মানুষও অপূর্ণতার শিশু, অজ্ঞানের পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী। অপূর্ণতার কোলে লালিত হইয়াই তাহাকে পূর্ণভাব পাইতে হইবে। কিন্তু অপূর্ণতার অবাধ্য হইয়া নহে—বলাৎকার পূর্ব্বক অপূর্ণতার সীমা অতিক্রম করিয়া নহে। ধাই মা শিশুকে যেমন ধীরে ধীরে "চলি চলি পায় পায়" করিয়া চলাইতে শিখায়, আমরাও তেমি অপূর্ণতাকে ধরিয়া পূর্ণতার রাজ্যে চলিতে শিখিব। পূর্ণতায় ডুবিলে অপূর্ণতা আপনা আপনিই সরিয়া দাঁড়াইবে। ফলটি পাকিলে বৃন্ত তাহাকে আপনা আপনিই খসাইয়া দেয়। তাহার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হয় না।

অধিকার উল্লঙ্ঘনের তুল্য পাপ বুঝি সংসারে আর নাই। কিন্তু অধিকার বুঝিয়া কয় জন চলে? যদি সকলে চলিত, তাহা হইলে সংসার বড় সুখের হইত। বিবাদ বিসম্বাদের পরিবর্ত্তে এ মরুভূমে শান্তির ঝরণা খুলিয়া যাইত, হতাশার বিনিময়ে সফলতার কৌমুদীময়ী মূর্ত্তি লীলা করিত। আর্য্য জাতি এই অধিকার-তত্ত্বটি বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শান্তির স্রোতে একদিন সমাজকে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন। সুধু বুঝিয়াছিলেন না, ভিতরে ডুবিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ করিয়া চারিটি ভিন্ন ভিন্ন অধিকার তাহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহারই ফলে ভারতীয় সমাজ কত কাল ধরিয়া অটল অটুট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্থূল-

বুদ্ধিরা তাহা বুঝিতে পারে না। আর্য্যেরা জানিতেন, প্রকৃতির বিচিত্র পরিণামই সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র চৈতন্য সত্তা বিরাজ করিতেছিল, সেই একমাত্র সত্তা হইতেই ত্রিগুণময়ী বিচিত্রা প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে এই বৈচিত্রীপূর্ণ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছে। বৈচিত্রীই সৃষ্টির সর্ব্বস্ব। বৈচিত্রীর বিনাশেই সৃষ্টির বিলয়। মনুষ্য সৃষ্টিতেই বৈচিত্রীর পূর্ণাভিনয় হইয়াছে। আর্য্যেরা এই আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক অনন্ত বৈচিত্রী পূর্ণ মনুষ্য-সৃষ্টিকে প্রধান প্রধান সত্ত্বাদি চারিটি বৈচিত্রী অনুসারে চারিটি বর্ণের বিভাগ ও চারিটি অধিকার রচনা করিয়া প্রকৃতির বৈচিত্রী নিয়মই পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ কালকার ইউরোপীয় সাম্যবাদ এই বৈচিত্রীর মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। তাহার বিষময় ফলও ফলিতেছে। এই যে সকল বিষয়ে সকলকার সমান অধিকার, এ একটা রাত কাণার কথা। ইহা অসম্ভব। ইহাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইতেছে। তাহার ফলে সাম্যের পরিবর্ত্তে ইউরোপে বৈষম্যের পিশাচ মূর্ত্তি ধেই ধেই নাচিতেছে। বেশী দূরে যাইতে হইবে না, ইংলণ্ডকেই দৃষ্টান্ত ধরিয়া লও। ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর লোক অত্যন্ত ধনবান্ গরীয়ান হইয়া যাইতেছে, আর এক শ্রেণীর লোক নিতান্ত হীন হইতেও হীন হইয়া পড়িতেছে, নরকের কীট হইয়া যাইতেছে। আজ ইংলণ্ডে একটু দুর্ভিক্ষ হইলেই স্তূপে স্তূপে লোক মরিতে শুনা যায়। ভারতে এখনও এত দুর্গতি হয় নাই। অধিকারের যথাযথ ব্যবস্থাতেই ভারতের ঘরে ঘরে শান্তিময়ী কমলার আনন্দময়ী মূর্ত্তি হাঁসিত। এখনও

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে হাঁসিতেছে, পরে বোধ হয় আর হাঁসিবে না।

অধিকারের অব্যবস্থায় ইংলণ্ডে বৃত্তি লইয়া যেমন গণ্ড-গোল উপস্থিত, শিক্ষা লইয়া আজ ভারতেও সেই দুরবস্থা। বর্ত্তমান যুগে একই বিষয়ে অধিকার নির্ব্বিশেষে সকলকে একই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহাতে সকলের বিভিন্ন বিভিন্ন মস্তিষ্ককে গলাইয়া একই ছাঁচে ঢালা হইতেছে। চিন্তা শক্তির বৈচিত্রী নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। যদি এক শতাব্দী ধরিয়া এক জাতীয় চিন্তাই সহস্র সহস্র মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া বহিয়া যায়, তাহাতে মনুষ্য জীবনের উন্নতি কি? কেবল বৃথা সময়ের অপব্যয় নহে কি? লক্ষ লক্ষ মস্তিষ্কে বিচিত্র বিচিত্র চিন্তাই উন্নতির ভিত্তি ভূমি। এই বিভিন্ন বিভিন্ন চিন্তার সংঘর্ষই মনুষ্যকে অমৃতময় স্বর্গীয়তার দিকে লইয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান একবিধ শিক্ষা কি তাহার প্রতি-কূল নয়?

অধিকার জিনিষটা কি তাহা বুঝিতে বোধ হয় এত-ক্ষণ কাহারও বাকী নাই। তোমার প্রকৃতি নিহিত যে শক্তি, তাহার সামর্থ্যই তোমার অধিকার। ব্রাহ্মণের প্রকৃতি সত্ত্ব-শক্তিময়ী, কাজেই সাত্ত্বিক আচার ব্যবহাবেই তাঁহাব অধিকার, তোমার বুদ্ধি দারুণ তর্ক শক্তির গোলোক ধাঁধায় ঘুরিতে চায়, বিশ্বাসের বিনীত বেশ পায়ে ঠেলিয়া দেয়, এমন অব-স্থায় তর্ক শাস্ত্র পাঠেই তোমার অধিকার। তর্ক শাস্ত্রপাঠেই তোমার বুদ্ধির বুভুক্ষা নিবৃত্ত হইতে পারে। ভক্তি শাস্ত্র বা ঋষিদিগের আদেশ রূপ স্মৃতি শাস্ত্র তোমার বুদ্ধির অনুকূল

নহে। স্মৃতি শাস্ত্র বলিতেছে, একাদশীর দিন তোমাকে উপবাস করিতেই হইবে, ইহাতে কোন যুক্তি নাই, তর্ক নাই, বিচার নাই, ঋষির আদেশ মাত্র। তোমাব তর্ক শক্তিময় মস্তিষ্ক ঋষিব আদেশে অবনত হইতে চাহে না। যুক্তির নিকষে করিয়া তুমি ভাল মন্দ বিচাব কবিতে চাও, কাজেই স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ তোমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। যোগীর শরীরে ভোগীব ভোগ্য পরিপাক পায় না, কাজেই ভোগীব ভোগ্য যোগীব অযোগ্য। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

একদিন মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য নিজ আশ্রমে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ব্যাধ আসিয়া তাঁহাব সম্মুখীন হইযা কর-যোড়ে দাঁড়াইল ও বলিল, প্রভো! আমাব স্ত্রী কন্য ব্রতাবসানে পারণা করিবে। সে দিন সে একটি শুদ্ধ সত্ব ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে অভিলাষী। আপনি যদি কৃপা করিয়া আমাব বাটীতে কন্যকাব নিমন্ত্রণটী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। প্রার্থিতার্থপূবক দয়ালু শঙ্করাচার্য্য তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন না। ব্যাধ আপনাকে ধন্য মনে করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। পরদিন মহাডম্বরে ব্যাধ আচার্য্য দেবের আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। পশু পক্ষীর মাংস রন্ধন করিয়া থরে থরে ভাণ্ড সাজাইল। নিজ জাতীয় সামর্থ্য ও অধি-কারের অনুসারে, সে উদ্যোগের কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না। এদিকে ত্রিকালদর্শী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যোগমায়া বলে একটী কুক্কুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যাধ-গৃহে উপস্থিত হইলেন। যেখানে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তত, সেইখানে আস্তে আস্তে চলিলেন। মূর্খ ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী কুক্কুরবেশী আচার্য্য দেবকে চিনিতে

না পারিয়া লগুড়াঘাতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। তদনন্তর তাহারা অনেকক্ষণ তাঁহার অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, তিনি আর আসিলেন না, তখন ক্ষুণ্ণমনে হতাশ ভাবে তাহারা ভাবিতে লাগিল, হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট! বুঝি প্রভুর দয়া হইল না। পরদিন ব্যাধ প্রত্যূষে আচার্য্য দেবের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, কৈ তোমরাত আমার আদর করিলে না। আমি গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছ। ব্যাধ চমকিত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, কৈ আপনি ত যান নাই একটা কুক্কুর গিয়াছিল বটে, তাহাকেই তাড়াইয়াছি, আপনাকে তাড়াই নাই। আচার্য্যদেব উত্তর করিলেন, আমিই সেই কুক্কুর। কুক্কুরের উপযুক্ত খাদ্য কুক্কুরের উদরেই সহ্য হয়। ভোগীর ভোগ্য যোগীর উদরে বিষ। তাই আমি কুক্কুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। ব্যাধ অবাক হইয়া হেটমুণ্ডে চলিয়া গেল।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জীবনের এই ক্ষুদ্র ঘটনাটী হইতে যে অমূল্য উপদেশ পাওয়া যায়, আজ ভারতের নব্য ধর্ম্ম-সাধকদের মধ্যে কয় জন তদনুসারে চলিয়া থাকেন? কয়জন অধিকার বুঝিয়া ধর্ম্মরূপ আহারকে নিজ মানসিক প্রকৃতির পুষ্টি সাধনানুকূল করিয়া লন। আজকাল ভারতে এক শ্রেণীর বদহজমী ধার্ম্মিক দেখা দিয়াছে। উপাসনাকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড, ইঁহাদের চুচক্ষের বিষ। যদি চ প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু ইহাঁদের মনে মনে বিশ্বাস এই যে, এ সমস্ত স্ত্রী প্রকৃতি জড় বুদ্ধিদের অবলম্বনীয়। কথায় কথায়

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভিন্ন ইহাঁদের মন' উঠে না। জ্ঞান বা যোগের লম্বা চৌড়া কথা ভিন্ন ইহাঁরা অন্য কথা কহেন না। যোগবাশিষ্ঠ ও ভগবদ্‌গীতার শ্লোক ইহাঁদের কণ্ঠাগ্রে। যেমন কতকগুলি পিপীলিকা মিলিয়া একটী বৃহৎ খাদ্য বস্তুকে ধরিয়া টানাটানি করে, ইহাঁরাও তেমনি আর্য্য ধর্ম্মের গুরুতর অঙ্গ গুলিকে লইয়া টানা ছেঁড়া আরম্ভ করিয়াছেন। যেন একদল পুঁটিমাছ রুইমাছের বঁড়শীতে ঠোকর মারিয়া জ্বালাতন করিতেছে। ইহাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনে হয়, যেন এক পাল নেংটে ইন্দুর হিমালয়কে ধরিয়া টান মারিতেছে। বেশী দূরে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে হইবে না। কাশী-ধামেই ইহার জলন্ত অভিনয়। এখানে হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে, অলিতে, গলিতে, জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত। বিশেষতঃ এখানে এক শ্রেণীর লোক একটি যোগের ব্যবসা খুলিয়াছেন। ব্যবসাটি বেশ জম্‌কাইয়া উঠিয়াছে. এ ব্যবসায় দালাল আছে, দেশে দেশে এজেন্ট আছে, খরিদদারও যথেষ্ট আছে। এই অদ্ভুত যোগীরা এখানে একটী গুরু খাড়া করিয়া, পাত্রাপাত্রের বিচার নাই, অধিকারী অনধিকারীর ভেদ নাই, যাহাকে তাহাকে ধরিয়া ইহারা যোগের মন্ত্র ফুঁকিতেছেন। কেবল কিছু "ফির"—' কয়েকটী টাকা) ওয়াস্তা। এই যোগী কোম্পানীর উপদেশানুসারে আজকালকার অনেক নব্য বঙ্গীয় বাবু নাক্ টিপিয়া যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, চক্ষু স্থির করিতে শিখিতেছেন, ইহার উপর আবার নব্য বৈজ্ঞানিক যোগী ভায়ারাও আছেন, তাঁহাবাদের অনুগ্রহেও এ দেশে এই প্রকারের একদল অকাল পক্ক যোগী আবির্ভূত হইয়াছেন।

ইহার ফল বড় বিষময় হইতেছে, ইহাতে যোগশাস্ত্রের গরিমা-টুকু ধীরে ধীরে নষ্ট হইবে। অনধিকারে যোগচর্চ্চা, জ্ঞানচর্চ্চা, শাস্ত্র বারম্বার বারণ করিয়াছেন। এই অনধিকার-চর্চ্চার ফলে নব্য যোগীদের মধ্যে কত লোক যে যক্ষ্মাকাসে ভুগিতেছে, হৃদ্‌রোগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, মস্তিষ্ক রোগে পাগল হইতেছে, তাহার তত্ত্ব কেহ লয় না। বড় বিষম সময় পড়িল, আর্য্য-ধর্ম্ম আর্য্যশাস্ত্র লইয়া ছেলে খেলা আরম্ভ হইল।

আজ যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিতে হইলে যে, অধিকার-লক্ষণাক্রান্ত হইতে হয়, তাহা কে দেখে, কেই বা বুঝে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠ পাঠের এই প্রকার অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন,—

"অহং বদ্ধো বিমুক্তঃস্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তমজ্ঞো নবাজ্ঞশ্চ সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান্।"

"আমি মায়াপাশে বদ্ধ, এই মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত হইব।" এই প্রকার যার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, এবং অধিক জ্ঞানশালী ও নিতান্ত অল্পজ্ঞও নহে, এবম্বিধ ব্যক্তিই এই যোগবাশিষ্টপাঠে অধিকারী। বল দেখি নবীন জ্ঞানী ও যোগমার্গী! তোমাতে এই অধিকারের লক্ষণ কিছু আছে কি? আচ্ছা দেখা যাক্। বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়াটা কি তোমার অনুভবের কথা, না খেয়ালের কথা? তুমি বাস্তবিকই কি এই ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে চাও, যদি চাও, তাহা হইলে তোমার যোগবাশিষ্ঠ পাঠ যে ন্যায্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে চাও না, তুমি মিথ্যা কথা

ইহিতেছ, তাহা আমি দেখাইতেছি। যে কোন প্রাণী বন্ধনে পড়ে, সে বন্ধন-জনিত কষ্ট অনুভব করাই তাহার স্বাভাবিক। কোন স্বাধীন পশুকে বাঁধিয়া রাখ, দেখিবে সে তাহাতে কত যন্ত্রণা অনুভব করে, বন্ধন ছিঁড়িতে সে কত চেষ্টা করে। তাহার প্রাণের ভিতরে (যেন) অনলের শত-ধারা ছুটিতে থাকে। তাহার মুখে শান্তি থাকে না, স্ফূর্ত্তি থাকে না, ফুল্লতা থাকে না। ভলকে ভলকে অগ্নিময় নিশ্বাস তাহার হৃৎপিণ্ড হইতে উথলিতে থাকে। ইহাই বন্ধনের পরিচয়, ইহাই বন্ধনের ফল। কিন্তু তোমাতে সে বন্ধনের কিছুই পরিচয় পাই না। তুমি ত দিব্য হাসিয়া খুসিয়া বেড়া-ইতেছ, আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতেছ, স্ত্রী পরি-বারের সোহাগে গা ঢালিয়া সংসারসাগরে পাড়ি দিবার চেষ্টা করিতেছ। ইহা কি তোমার বন্ধন, ইহাই কি বন্ধন-জনিত কষ্ট? যদি তোমার বন্ধনেরই অনুভূতি নাই, তবে কেমন করিয়া তুমি মুক্তিপিপাসু? ইহা নিশ্চয়ই তোমার মিথ্যা কথা। অতএব যোগবাশিষ্ঠপাঠ নিশ্চয়ই তোমার অনধি-কার চর্চ্চা। এই যে তুমি মুক্তি মুক্তি করিয়া ভগবানের কাছে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ, একি তোমার প্রাণের কান্না না মায়াকান্না? কি জানি দয়ার সাগর ভগবান্ যদি একদিন হঠাৎ তোমার মায়া কান্নায় ভুলিয়া তোমাকে মুক্তি দিতে আসেন ও তোমার বন্ধন-স্বরূপ স্ত্রী পুত্রাদিকে একে একে তোমার কোল হইতে ছিনাইতে চান, তাহা হইলেই ত ভারি বিভ্রাট হইয়া দাঁড়ায়। কেন না তুমি ত মুক্তির জন্ম বাস্তবিক প্রস্তুত নও।

তাই বলি ভাই! একেবারে বানরের মত লাফাইয়া

জ্ঞানের উচ্চমঞ্চে উঠিতে যাইও না। রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া সোজা কথা কি? একেবারে ভুঁইফোড় হওয়া ভাল নহে, জ্ঞানের কথায় যোগের কথায় তোমার আমার অধিকার কি? গরিবের ঘোড়া রোগ ভাল কি? আমরা গার্হস্থ্যাশ্রমী, গৃহস্থের পালনীয় ধর্ম্মই আমাদের অধিকারের মধ্যে। আমরা যোগ-শিক্ষা জ্ঞানশিক্ষা কোন্ সাহসে করিতে যাই, নিজের ঘরের খবর নাই, পরের চরকায় তৈলদান আমাদের মানায় কি? নিজের গৃহে আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া ধসিয়া গেল, তাহাতে দৃষ্টি নাই, খোঁজ নাই, পরের ধান্দায় ঘুরিয়া মরি, এমন বিড়ম্বনা আর আছে কি? ভাই! একবার ফিরিয়া চাহ না, একবার ঘরের দিকে তাকাও না। তোমার ঘরে অভাব কি? তোমার হাতে ত "সাত রাজার ধন" রহিয়াছে। আর্য্য ঋষি তোমাকে ত অতুল রত্ন-ভাণ্ডারের গুরুতর অধিকার দিয়াছেন, তবে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মর কেন? তুমি কি অবিশ্বাসী? গুরুদত্ত অধিকার হেলায় হারাইতে বসিয়াছ। এমন পাপ আর নাই, ইহার ফলভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। কোন গরিবের বাছা যদি কোন বড় লোকের সংসর্গে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাতে তাহার চালচলন যেমন বিগড়িয়া যায়, জ্ঞানের কথায় যোগের কথায় থাকিয়া থাকিয়া তোমারও নজরটা তেমনি বাড়িয়া যাইবে। উপাসনা-কাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড তোমার ভাল লাগিবে না, অথচ অনধিকার-চর্চ্চার জন্য জ্ঞান বা যোগমার্গেরও কিছু উন্নতি করিতে পারিবে না। সহস্র সুন্দর ময়ূরের পালকে সাজিলেও দাঁড়-কাকের দাঁড়কাকত্ব নষ্ট হয় না। অথচ দাঁড়কাকের মত

এঁকুল ওকুল দুকুল হারা হইয়া পথের মাঝে বসিয়া তোমাকে তখন কাঁদিতে হইবে, তখন তুমি ভাবিবে—

> সুন্দর কমল ভাসে সাগরের জলে,
> ঝাঁপিয়া পড়িনু তাহে তুলে আনি বলে।
> সাঁতারেরই ঢেউ লাগি ফুল গেল চলে,
> আসিতে মারিনু হায়! পুনঃ ফিরে কূ'ল;
> গেল একুল ওকুল, মরি বিধি।
> একি দায় দুকুল মজালে!

কল্পনার কাব্য লিখিতেছি না, খেয়ালের ছবি আঁকিতেছি না। উপরে যে চিত্র দেখাইলাম, তাহা পূর্ণ সত্য, একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব। একজন পঞ্জাববাসী ইংরাজী শিক্ষিত যুবা যৌবন বয়সে ধনোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তিনি কোন একজন সংস্কৃতজ্ঞ গুরুর নিকটে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া লয়েন। গীতাপাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহার এক অদ্ভুত দিব্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি বুঝিলেন যে, দেহ ইন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা নামে "আমি" একটি জিনিস আছি। তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্দ্ধর্ম্মক, পাপ পুণ্য বিরহিত। সুতরাং আমি যে সমস্ত ভাল মন্দ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করি, তাহার ফল আমার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার দেহই নিজকৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী। আমার আত্মা বেকসুর খালাস। আমার দেহ ক্ষণভঙ্গুর, অতএব তৎকৃত কর্ম্মের জন্য আমার আত্মাকে পরকালে ভুগিতে হইবে না। এই প্রকার চূড়ান্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তিনি একটি বেশ্যা রাখিলেন, একটু মদ খাইতে শিখিলেন। একাধারে

প্রেমনীতি ও জ্ঞাননীতি, আলোক ও অন্ধকার, অমৃত ও হলা-হলের সমন্বয় আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে বাবুটি জ্ঞান ও প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। গীতার উপদেশ সার্থক হইল, পিতৃকুল উদ্ধার হইল, বাবুটির মনোবাঞ্ছা ষোলকলায় পূর্ণ হইল। এই প্রকারে কত বৎসর কাটিয়া যায়, বাবাজির তত্ত্বজ্ঞান আর ফুরায় না। ক্রমে ক্রমে দুরবস্থার একশেষ হইলে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃত ফলে তাঁহার একটু চেতনার উন্মেষ হইল। তখন তিনি বুঝিলেন, আমি এ কি করিতেছি, কৈ সেকালের মহা মহা জ্ঞানীগণের মধ্যে কেহই ত আমার সদৃশ পথে চলেন নাই। হায়! আমি কি মূর্খ! এই প্রকার মর্ম্মবেদনায় পুড়িতে পুড়িতে সংসার ছাড়িয়া তিনি এখন কাশীধামে বাস করিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপের হা হুতাশে তাঁহার যন্ত্রণার সীমা নাই। বৃদ্ধের এই নিদারুণ মর্ম্মকাহিনী তাঁহার মুখ হইতে যে শুনিয়াছে, সেই গলিয়াছে। তাঁহার এক একটী কথা অগ্নিময় অঙ্গারের মত পাষাণ প্রাণকেও ফাটাইয়া দেয়। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া এক এক সময় বলিয়া ফেলেন, "হায়! এবার কিছু হ'ল না, কেবল ময়লা ধুইতে ধুইতেই জীবনটা মাটি হইল।"

আর কি চাও, খেয়ালের অনুসরণ করিয়া, অধিকার ডিঙ্গাইয়া, জীবনের এই বিষময় পরিণাম, অন্তিমে এই নিরাশার ভৈরবী মূর্ত্তি, মুমূর্ষুর এই বিকট চীৎকার, ইহা হইতে আর কি চাও? তোমাদের মন কি টলিবে না? ঘুমের ঘোর কি ভাঙ্গিবে না?

আমি এমন কথা বলি না, যে গৃহস্থ হইলেই জ্ঞান বা যোগে

অনধিকারী। কেবল এই টুকু বলিতে চাই, যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পূর্ণ উন্নতি সাধন না করিয়া জ্ঞান ও যোগে হাত দিও না। গার্হস্থ্যাশ্রম, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ এই সমস্ত মিলাইয়া, খিচুড়ি পাকাইয়া বসিও না। পূজা, পাঠ, ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ, শমদমাদি দ্বারা পবিত্রতা সাধন করিয়া তবে অপেক্ষাকৃত জ্ঞান যোগাদি উচ্চ অধিকারের আশা করিও। মনের উপযুক্ত পবিত্রতা সঞ্চিত হইলেই তোমার আপনা আপনি অধিকার জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল হঠকারিতার ভুবন-ভুলানী মায়ায় ভুলিয়া ধর্ম্মরাজ্যে লম্ফ ঝম্ফ দেওয়া নিতান্তই বালকতা।

আর বাকি কি? নরক গুলজার হইতে আর দেরি কি? আর্য্য ঋষিদের উচ্চ পবিত্র উপাধিগুলিও অনধিকারীর হাতে পড়িয়া আজ নক্‌ড়া ছক্‌ড়া হইতে বসিয়াছে। দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মানন্দ, সহজানন্দ সকলেই একে একে এই ভারত-রঙ্গক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। হায়! কালে কালে হলো কি? বর্ষে বর্ষে একটি করিয়া সন্তান উৎপাদনেই যাঁহার আনন্দ, আজ তিনি ব্রহ্মানন্দ! বিলাসের নন্দনে বসিয়া যিনি ভোগ বাসনার চূড়ান্ত শ্রাদ্ধ করেন, আজ তিনি মহর্ষি। ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, তালপাতার সেপাই, রাজত্ব নাই, অস্ত্র নাই, সৈন্য নাই, অথচ উপাধি-গ্রস্ত রাজা, এ বড় বিড়ম্বনা। এ দুঃখ রাখিবার জায়গা আছে কি? আজ ভস্মাবৃত তেজঃপুঞ্জকলেবর ঋষি হ্যাট, কোট, বুট পরা সকের তপস্বী হইয়া দাঁড়াইলেন, দেবতা বানর সাজিলেন, কি ভীষণ! কি ভয়ানক! আজ মুক্তামালাকে

বানরের গলদেশে দেখিয়া তপোবন-দেবতাকে বিলাসীর গৃহ-লক্ষ্মী দেখিয়া তোমাদের প্রাণ কি কাঁদে না? আজ গঙ্গাজল কূপজলে মিশিল, অমৃত হলাহলে ডুবিল, সাধের সামগ্রী দস্যুতে অপহরণ করিল, এ দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু! তোমাদের কি বুক ফাটে না?

অদ্বৈতবাদ।

তন্তু ছাড়া বস্ত্রের যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, মৃত্তিকা ছাড়া ঘটের যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সমুদ্রের জল হইতে বুদ্‌বুদের যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কতকগুলি তন্তু পুঞ্জীকৃত হইয়া পরস্পর সমষ্টি-বদ্ধ হইয়া যখন পরিবর্ত্তিতাকার হইয়া যায়, তখন তোমরা সেই তন্তুগুলিকে "বস্ত্র" এই একটা নাম দাও। যাহা মৌলিকাবস্থায় "তন্তু" ছিল, তাহাই তন্তুবায়ের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়া স্থূলাবস্থায় "বস্ত্র" এই নাম ধারণ করিল। নাম বিভিন্ন হইল বটে, কিন্তু বস্তু বিভিন্ন হইয়া গেল কি? যেমন গরু হইতে অশ্ব একটা বিভিন্ন পদার্থ, তেমনই তন্তু হইতে বস্ত্র একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হইল কি? যে তন্তু সেই তন্তুই থাকিল, মাঝখান হইতে তোমরা তাহার বস্ত্র এই একটা নাম কল্পনা করিলে, তন্তুবায় সেই তন্তু গুলিরই একটা রূপ কল্পনা করিল, যে সুত্রগুলি হেলা গোছা হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তন্তুবায় সেইগুলি সাজাইয়া গুছা-

ইয়া রূপান্তরিত কবিল। এই যে তন্তুর নাম ও রূপ এই দুইটী তোমাদের কল্পনা।—যাহা কল্পনা, তাহা মিথ্যা—অসৎ পদার্থ। তন্তুর নাম রূপ মিথ্যা, তন্তুই একমাত্র সত্য পদার্থ, সেইরূপ ব্রহ্ম একমাত্র সত্য পদার্থ,—এই নাম রূপাত্মক জগৎ মিথ্যা পদার্থ, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা—"সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" এক মৃৎপিণ্ডের স্বরূপ অবগত হইলে মৃণ্ময় ঘট শবাবাদিও মৃৎ স্বরূপে অবগত হওযা যায। যে মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুত হয়, তাঁহাতেই শরাব নির্ম্মিত হয়, তাহাতেই স্থালীও নির্ম্মিত হয। স্থালী, শবাব, ঘট এই তিনটিতেই মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে। সুতরাং মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে উক্ত তিনটিরও মৃৎস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব মৃত্তিকা ছাড়া উক্ত তিনটীব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকাই বিভিন্ন আকাবে কখনও ঘট, কখনও শবাব, কখনও স্থালী এই নাম প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকাব ঘট এই নাম এবং তাহার কম্বুগ্রীবাদিরূপ কেবল কল্পনা মাত্র। মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ। মৃত্তিকা যেমন ঘট শরাবাদিব উপাদান, ব্রহ্ম সেইরূপ জগতের উপাদান। ঘট শরাবাদি যেমন মৃত্তিকা ছাডা আব কিছুই নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাডা জগৎ আর কিছুই নহে। মৃত্তিকা যেমন ঘট শরাবাদিতে অনুস্যূত, ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে তেমনই অনুস্যূত। মৃত্তিকা জ্ঞাত হইলে যেমন ঘট শরাবাদি অজ্ঞাত থাকে না, ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে জগৎ সেইরূপ অজ্ঞাত থাকে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ, নাম রূপাত্মক, জগৎ মিথ্যা।

সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। এই তিনটি অংশই জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত। জগতের কোন পদার্থই সৎ, চিৎ, আনন্দ বর্জ্জিত নহে। মৃত্তিকা যেমন ঘট, শরাব, স্থালীতে অনুস্যূত, তন্তু যেমন বস্ত্রে অভিন্নভাবে বিরাজিত, সেইরূপ সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, জগতের প্রত্যেক অণু, পরমাণুতে অভিন্নভাবে অবস্থিত। আমার সম্মুখে ঐ যে সুন্দর চিত্রটী রহিয়াছে, ঐ পদার্থটী সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটি অংশের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি ঐ চিত্রটি দেখিতেছি, এই দর্শনাত্মক জ্ঞান উহার "চিদংশ।" ঐ চিত্রটি আমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে এই যে "বিদ্যমানতা" ইহা উহার "সৎ" অংশ, ঐ চিত্রটি দেখিতে সুন্দর, সুতরাং উহা আমার প্রিয়, এই প্রিয়তা উহার আনন্দাংশ, এই সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং "চিত্র" এই নাম ও তাহার রূপ এই পাঁচটী অংশ ছাড়া চিত্র আর কিছুই নহে। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ঐ পাঁচটি অংশের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। তন্মধ্যে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটিই বস্তুর সারাংশ, আর নাম ও রূপ এই দুইটি অসার। কেননা পদার্থের নাম রূপ চলিয়া যায়, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ অংশ পদার্থ হইতে চলিয়া যায় না। সুবর্ণকে অগ্নিতে পোড়াইতে পোড়াইতে তাহার ভেজাল অংশ বাহির হইয়া যায়, এজন্য সে অংশ অসার, সেই ভেজাল অংশ বাদ গিয়া, খাদ্ পান আদি মলিন অংশ উড়িয়া গিয়া সুবর্ণের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে, তাহাই সার পদার্থ। তাহাই স্থিরাংশ। সেইরূপ জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রাকৃতিক পরিণাম নিয়মের জলন্ত অগ্নিতে যখন

কবলিত হয়, তখন তাহার ভেজাল অংশ নাম রূপ উড়িয়া যায়—পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ অংশ চিরদিনই অপরিবর্ত্তিত থাকে। কেন না তাহাই স্থিরাংশ। যে ক্ষুদ্র শিশুটি একদিন খোকা বাবু বলিয়া পরিচিত হইতেন, যৌবনে তিনিই পরিবর্দ্ধিত শরীরে বমন বাবু এই নামে হয় ত প্রচারিত হইলেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম ও বাল্যকালের চেহারার নাম গন্ধও যৌবনে থাকিল না, নাম ও রূপ উভয়ই উড়িয়া গেল। কিন্তু তদ্গত সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি অংশের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল কি? বাল্যকালে তিনি যে নগেনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে বিদ্যমান ছিলেন, এখনও সেই ভাবেই "বিদ্যমান আছেন, লোকে এখনও তাঁহাকে সেই ভাবেই জানে" কতকগুলি লোকের পক্ষে তিনি "আনন্দ" জনকও বটেন, সুতরাং সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিন অংশের ব্যতিক্রম তাঁহাতে কিছুমাত্র হয় নাই। সুতরাং পদার্থের ঐ তিনটী অংশই স্থিরাংশ আর বাকী অস্থিরাংশ। সুবর্ণের ভেজাল অংশ অসার, খাঁটি সোণা যে টুকু, সেই টুকুই স্থিরাংশ। জগতের নাম রূপ সেইরূপ অসার—ধ্বংসশীল—মিথ্যা। উহার সৎ, চিৎ, আনন্দ অংশই সার—স্থিরাংশ—সত্য পদার্থ। সুবর্ণের ভেজাল অংশ যেমন মলিন, জগতের নাম রূপ অংশ তেমনই জড়তা মাখা—কদর্য্য। পাকা খাঁটি সোণা যেমন উজ্জ্বল, জগতের সৎ, চিৎ, আনন্দময় অংশ তেমনই অনন্ত সুন্দর সমুজ্জ্বল। কেন না উহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

সুবর্ণকে যেমন ভেজাল অংশ আশ্রয় করিয়া থাকে,

সেইরূপ নাম রূপাত্মক জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমুদ্রে বুদ্‌বুদের ন্যায় দুগ্ধে ফেনার ন্যায় নাম রূপাত্মক জগৎ ভাসিতেছে। ফেনা ও বুদ্‌বুদ্‌ দুগ্ধ ও জলেরই বিকার, দুগ্ধ ও জল ছাড়া তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দুগ্ধ ও জলেতেই তাহাদের উৎপত্তি হয়, এবং তাহাতেই তাহাদের বিলয় হয়, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মের "বিবর্ত্ত"। ব্রহ্মেতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেতেই জগতের বিলয় হয়। সুতরাং ব্রহ্মরূপ চিদ্‌ঘন দুগ্ধের নাম রূপাত্মক জগৎ ফেনা স্বরূপ। এই উঠিল, এই ডুবিল, এই আছে, এই নাই। জলের বুদ্‌বুদ্‌ ও দুগ্ধের ফেনা যেমন ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা পদার্থ, সেইরূপ ব্রহ্মের জগতও ক্ষণিক পদার্থ।

ব্রহ্মেরই এক মাত্র সত্তা, ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ, ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন পদার্থই নাই। শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হইতেছে। ভ্রম ঘুচিয়া গেলে যেমন শুক্তিকে শুক্তি বলিয়াই বোধ হয়, তখন আর রজতজ্ঞান থাকে না, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ হয়, তখন আর সর্প জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞান ঘুচিয়া গেলে ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ হয়, আর জগতের জ্ঞান থাকে না। সাংসারিক জগতে যৌবনের তরঙ্গে কামবৃত্তির উত্তেজনায় বেশ্যাকে পরম প্রণয়িনী বলিয়া বোধ হয়, কামবৃত্তি ঘুচিয়া গিয়া একটু জ্ঞানের উদয় হইলে সেই বেশ্যাকেই আবার কেবল অর্থ লোলুপ পিশাচী বলিয়া স্থির হয়। সেইরূপ পারমার্থিক জগতে অজ্ঞান-বৃত্তির উত্তেজনা কমিয়া

গেলে এই গৃহদ্বাব-পূর্ণ সংসার শূন্য বলিয়া স্থির হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" "যখন জীব মুক্তাবস্থায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কেবলমাত্র এক আত্মা স্বরূপে পরিণত হন, তখন দ্রষ্টা দৃশ্য, ভোক্তা ভোগ্য এ ভাব থাকে না।" সুতবাং জগতের বাস্তবিকী সত্তা নাই। শুক্তিতে রজতের সত্তা, রজ্জুতে সর্পের সত্তা, আর মরুমরীচিকায় যেমন জলেব সত্তা অবাস্তবিক (প্রাতিভাসিক), সেইরূপ ব্রহ্মে জগতেব সত্তা অবাস্তবিক, জগৎ মিথ্যা পদার্থ। অনেকে আশঙ্কা করিতে পাবেন, সম্মুখে যাহাব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কবিতেছি, হস্তাদি দ্বারা যাহা স্পর্শ কবিতেছি, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার সত্তা অনবরত অনুভব কবিতেছি, এক মুহূর্ত্তও যাহাকে "অসৎ" বলিয়া বোধ হইতেছে না, এমন জলজেয়ান্ত পদার্থকে "মিথ্যা" বলি কেমন কবিয়া? আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ মিথ্যা পদার্থ, তাই তাহাব প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাকে অসৎ বলিয়াই মনে হয়। জগৎকে ত তেমন অসৎ বলিয়া মনে হয় না, তবে ইহা মিথ্যা কেমন কবিয়া হইল। ইহার উত্তরে আমবা বলি, স্বপ্নকালে আমরা হস্তী উষ্ট্র অশ্ব আদি পদার্থ স্পষ্টতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি, স্বপ্নের ঘোরে কখনও মনে হয়, রথে চড়িয়া যাইতেছি, কখনও মনে হয়, কে আমাকে উপর হইতে ফেলিয়া দিল, তখন ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি, এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নকালে সেই সময়কার ঘটনাবলীকে অসৎ বলিয়া মনে হয় না; নচেৎ ভয়ে আঁৎ-কাইয়া উঠিব কেন, এই যে স্বাপ্নিক সৃষ্টি, ইহা কি সত্য

পদার্থ? ইহা যেমন অলীক, সেইরূপ জগৎ সৃষ্টিও অলীক—মিথ্যা। স্বপ্ন সময়ে ঘটনা সমূহ সত্যবৎ ভাসমান হইলেও প্রবুদ্ধ হইলে, (জাগ্রত হইলে) তাহা যেমন মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ জগৎ-সৃষ্টি আপাততঃ সত্যবৎ ভাসমান হইলেও প্রবুদ্ধ হইলে মিথ্যা বলিয়া স্থির হয়। ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেলে স্বপ্নের কুজ্ঝটিকা যেমন চলিয়া যায়, মায়া-নিদ্রা কাটিয়া গেলে জগতের মোহময় আস্তরণ সেইরূপ সরিয়া দাঁড়ায়। জগতের যাহা কিছু, সমস্তই স্বপ্ন মাত্র। আকাশ-কুসুম যেমন অসৎ, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও তেমনই অসৎ, জগৎও তেমনই অসৎ, তবে আকাশ-কুসুম হইতে পার্থক্য এই টুকু; আকাশ-কুসুম কোনকালেই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু জগৎকে ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পাই। কিন্তু জগৎকে ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পাও বলিয়া তোমরা যদি জগৎকে "সৎ" বলিতে চাও, তবে শুক্তিতে রজত-ভ্রম স্থলে ক্ষণকালের জন্য রজতকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তাহাকেও "সৎ" বলিতে তোমার আপত্তি কি? স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও ত ক্ষণকালের জন্য রীতিমত অনুভব হয়, তবে তাহাও তোমার মতে সত্য হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিক সত্যের (সত্তার) লক্ষণ যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, স্বাপ্নিক সৃষ্টি "সৎ" নহে, শুক্তি রৌপ্য "সৎ" নহে। সুতরাং যাহা ক্ষণিক, তাহাকে সত্য বলিতে পারা যায় না। শুক্তি রৌপ্যের ন্যায় স্বাপ্নিক ঘটনা সমূহের ন্যায় জগৎ যখন ক্ষণিক, তখন তাহাকে সত্য বলিবে কিরূপে? শুক্তি রৌপ্য দুই মুহূর্ত্ত স্থায়ী, স্বাপ্নিক ঘটনা দু চার মিনিট

স্থায়ী, জগৎ না হয় দু চার ঘণ্টা—দু দশ দিন—দু দশ হাজার বৎসর—দু চার হাজার কোটি বৎসর স্থায়ী, অনন্ত মহাকালের তুলনায় দু চার হাজার কোটি বৎসর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা বেশী নহে। বরং আমরা যাহাকে এক মুহূর্ত্ত মনে করি, অনন্ত মহাকালের তুলনায় শত সহস্র যুগ তাহার শতাংশের একাংশও নহে। সুতরাং শুক্তি রৌপ্য এবং স্বাপ্নিক সৃষ্টির ন্যায় জগৎও ক্ষণিক—অসৎ পদার্থ।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও জগৎকে "স্থায়ী" বলিতে পারি না। তবে বলিতে পারি "তোমার আমার জ্ঞানে স্থায়ী", যিনি মুক্ত পুরুষ, তাঁহার পক্ষে ত জগৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থায়ী নহে। যাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে ত শুক্তিরৌপ্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থায়ী নহে। যাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, স্বাপ্নিক পদার্থ এক মুহূর্ত্তও তাঁহার পক্ষে স্থায়ী নহে, তোমার আমার ভ্রম যতক্ষণ, ততক্ষণই শুক্তিকে রজত বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণই ব্রহ্মকে নাম রূপাত্মক জগৎ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তোমার আমার ভ্রমাত্মক জ্ঞানই অসৎ জগৎকে সৎ বলিয়া উপস্থিত করিয়াছে, মিথ্যাভূত জগৎকে সত্য বলিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। তোমার জ্ঞান যাহা বলিবে, পদার্থ যে তদনুযায়ীই হইবে, তাহা কে বলিল? তোমার জ্ঞান যদি কোন কারণে আগুনকে জল বলিয়া তোমার কাছে উপস্থিত করে, ত বাস্তবিক কি সে আগুন জল হইবে? তুমি যদি কামলা দোষ-গ্রস্ত চক্ষুর সাহায্যে সাদা পদার্থকে পীত বলিয়া বুঝ,—তাহা হইলে কি বস্তুতঃ সে সাদা পদার্থ পীত হইবে?

সেইরূপ তোমার ভ্রান্ত জ্ঞান অসৎ জগৎকে সৎ বলিয়া যদি তোমার কাছে আনে, তবে কি সে সৎ হইবে? কামলা দোষ-গ্রস্ত চক্ষুকে যেমন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, সেইরূপ মায়া মোহ বিজড়িত অজ্ঞান বিকার-কলঙ্কিত আমাদের জ্ঞানকেও বিশ্বাস করা উচিত নহে।

জীবসৃষ্টি।

—*—

ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নাম "ঈশ্বর দ্বৈত"। আর জীব নিজ সামর্থ্যের ভিতর দিয়া যে সৃষ্টিক্ষেত্রে পৌছিয়াছে, তাহা "জীব দ্বৈত"। বাহিরের দ্বৈত জগৎ পরমাত্মার সৃষ্টি, আর ভিতরের ভোগ্য জগৎ জীবের মানসিক সৃষ্টি। যদি কেবলমাত্র বাহিরের সংসার সাজে সাজাইয়া পরমাত্মা জীবকে মনোবিহীন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইতেন, তাহা হইলে সকল গণ্ডগোলই মিটিয়া যাইত। বাহিরের পদার্থপুঞ্জ যদি ভিতরে বসবাস করিতে না পারিত, তাহা হইলে জীবকে আর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইত না। বাহিরের আপাতমনোমোহন সুন্দর ছবি যদি ভিতরে রেখাঙ্কিত না হইয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া যাইত, তাহা হইলে অন্তিমে, নিরাশা জীবকে আর ঘিরিতে পারিত না। বাহিরের বেনো জল সরোবরে প্রবিষ্ট হইয়া সরোবরের পুত্রস্বরূপ মৎস্যগুলিকে যেমন ভাসাইয়া লইয়া যায়,

তাহার প্রস্ফুটিত কমলদলকে তরঙ্গাঘাতে যেমন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ বাহিরের তরঙ্গে পড়িয়া বহুদিনের কত সাধের সঞ্চিত ধন হারাইয়া জীব অনাথ হইয়া লুটাইয়া পড়ে। বন্যার স্রোতে অপর স্থান হইতে মৎস্য আসিয়া সরোবরে প্রবেশ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা তো তাহার "নিজস্ব" নহে। সেইরূপ বাহিরের যাহা কিছু ভিতরে আসিয়া জমে, তাহার উন্নতিতে ভিতরের নিজের উন্নতি হয় কৈ? তাহার নিজের যাহা ছিল, তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে আর পরমুখ চাহিতে হইত না।

ঈশ্বরের সংসারে আসিয়া তাঁহারই প্রদত্ত ঘর বাড়িতে বসিয়া তাঁহারই ধনকে আমরা নিজস্ব মনে করিয়া লইয়াছি। তাঁহারই সৃষ্ট বস্তুর উপর আমরা একটা ভোগ্যতাময় আবরণ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি। এই টুকু আজ আমরা ভাল করিয়া বুঝিব ও বুঝাইব।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্মুখে যে পদার্থ আসিয়া পড়ে, মন তাহারই দিকে ধাবিত হয়। যেমন পুষ্করিণী হইতে জলস্রোত পয়ঃ-প্রণালী দ্বারা নিঃসৃত হইয়া ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ক্ষেত্রাকারে পরিণত হয় সেইরূপ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক বিষয়াভিমুখী হইয়া বিষয়াকারে পরিণত হয়। অন্তঃ-করণের এই বিষয়াকারতার নামই বৃত্তি। এই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম প্রমাণ চৈতন্য। কথাটা একটু পরিস্ফুট করিতে হইতেছে।

বেদান্ত মতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড শুক্তিতে রজতের ন্যায় চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মে আরোপিত—অধ্যস্ত। যাহা কিছু দেখিতেছি,

শুনিতেছি, বুঝিতেছি, এ সমস্তই ব্রহ্মের ছায়া, ব্রহ্মের বিকাশ, ব্রহ্মরূপ আধারের আধেয়। শুক্তির অস্তিত্ব ছাড়া রজতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এই জন্য শুক্তি রজতের অধিষ্ঠান বলিয়া আখ্যাত। সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের অধিষ্ঠান। এই জন্য ব্রহ্ম সৎ ও জগৎ অসৎ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি না সৎ+চিৎ+আনন্দ। এই তিনটা অংশ ছাড়া যাহা কিছু প্রতীত হইতেছে, সমস্তই অসৎ। কেন না, যদ্বিষয়ক জ্ঞানের ব্যভিচার হয়, সেই বিষয় অসৎ, আর যাহার জ্ঞানের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, তাহা সৎ, ইহাই সদসত্ত্ব বুঝিবার প্রণালী। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেখুন, সম্মুখে একটী দেবালয় রহিয়াছে। ইহাতে দুইটী অংশ আছে, একটী জড়াংশ, অপরটি ব্রহ্মাংশ। "রহিয়াছে" এই যে দেবালয়েব সত্ত্বাংশ টুকু, ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ, ইহাই সৎ, কেননা এত-দ্বিষয়ক জ্ঞানেব ব্যভিচার হয় না। ঐ ঘট রহিয়াছে, ঐ পট রহিয়াছে, ঐ মঠ রহিয়াছে, এ সমস্তেই দেখুন সদ্‌বুদ্ধির ব্যভিচার হইতেছে না, সদ্‌বুদ্ধি অনুগতই রহিয়াছে। কিন্তু এ সমস্তে দেবালয় বিষয়ক বুদ্ধির (জ্ঞানের) ব্যভি-চার (অভাব) দৃষ্ট হইতেছে। অতএব দেবালয় অসৎ, সত্তাংশ স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাই সৎ, যদি সত্তামাত্র ব্রহ্মেরই স্থিরীকৃত হইল, তবে ঘট পটাদিতে সত্তা কেন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, যে ব্রহ্মের সত্তা লইয়াই ঘটাদিরও সত্তা ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন চিনির মিষ্টতা লইয়া সন্দেশের মিষ্টতা ব্যবহার হইয়া থাকে। এতক্ষণ বুঝিলাম যে ঘটপটাদি সমস্তই ব্রহ্মচৈতন্যে আরো-পিত। এই ঘট পটাদির অধিষ্ঠান স্বরূপ চৈতন্য ঘটাবচ্ছিন্ন

চৈতন্য পটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, এই নামে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এইরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তির অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যকে বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলে, ইহার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ ঘটপটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের যখন অভেদ হয়, তখনই উক্ত ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনে কর, তোমার সম্মুখে একটা ঘট রহিয়াছে। ঐ ঘটটির সহিত তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল, সংযোগ হইবামাত্রই অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া সেই ঘটরূপ বিষয়ে গিয়া তদাকারে পরিণত হইল। সেই যে পরিণাম সেই যে বৃত্তি আর ঘট এই দুইটিই এক স্থানে স্থিত হইল। এই দুইটির এক স্থানে স্থিতি প্রযুক্ত এই দুইটির অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যদ্বয়ের অভিন্নতা সম্পাদিত হইল। যদিচ চৈতন্য একমাত্র, তাঁহার ব্যক্তিগত বিভিন্নতা নাই, তথাপি উপাধি ভেদে তাঁহার ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। যেমন আকাশ এক ও অভিন্ন হইলেও ঘট গৃহাদ্যুপাধি ভেদে ঘটাকাশ ও গৃহাকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ও বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্যও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ইত্যাদি বিভিন্নরূপে সিদ্ধ হন। কিন্তু আবার সেই উপাধি দুইটী যদি একস্থানে স্থিত হয়, তাহা হইলে উপাধেয় দুইটির অভেদ হইবেই হইবে। যেমন গৃহাকাশ ও ঘটাকাশ পরস্পর ভিন্ন হইলেও সেই ঘটটি যদি গৃহ মধ্যে স্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ঘট ও গৃহের এক স্থানে স্থিতি প্রযুক্ত ঘটাকাশ ও গৃহাকাশের অভিন্নতা সর্ব্বথা

সিদ্ধ হয়। সেইরূপ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ বুঝিতে হইবে। এই অভিন্নতা হইলেই প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষ কর্ত্তা কে? জীব-সাক্ষী। ইনিই প্রপঞ্চ জগতের দ্রষ্টা ও ভোগকর্ত্তা, ভোগ দ্বিবিধ, গৌণ ও মুখ্য। সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষই মুখ্য ভোগ। বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষই গৌণভোগ। বাহ্য পদার্থই সুখ দুঃখের কারণ, এইজন্য পরম্পরা রূপে বাহ্য পদার্থের সাক্ষাৎকারও গৌণ ভোগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই ভোগের বিষয় যাহা, তাহাই আন্তর জগৎ, তাহাই অন্তঃকরণের পরিণাম, তাহাই জীবের কর্ম্মাধীন নিজসৃষ্টি, তাহাই জীবদ্বৈত বলিয়া পরিগণিত।

যেমন স্ত্রীজাতি পিতা কর্ত্তৃক জনিত হইয়া পিতার আদরময়ী দুহিতা ও পতি কর্ত্তৃক ভোগ্য হইয়া পতির সোহাগময়ী পত্নী, সেইরূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া জগৎ ঈশ্বরদ্বৈত ও জীব কর্ত্তৃক ভোগ্য বলিয়া উহা জীবদ্বৈত। ঈশ্বরের সংকল্প অবিদ্যার বৃত্তি স্বরূপ, সেই সংকল্পই জগৎ সৃষ্টির সাধক। আর জীবের সংকল্প মনোবৃত্তি, উহাই জীবের ভোগ সাধক। এখন আশঙ্কা উঠিতে পারে, যে বাহ্য পদার্থের ঈশ্বর নির্ম্মিত স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত, এই যে একটা ভোগ্যতাকার স্বরূপ স্বীকার করিতেছ, তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট যুক্তি কি? ইহার উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে? ধরিয়া লও; একটী রূপসী সতী যুবতী নিজের স্বামীর পক্ষে আনন্দের প্রস্রবণ, সপত্নীর পক্ষে দ্বেষের জলন্ত অঙ্গার এবং পর পুরুষের পক্ষে দুঃখের বিবভাণ্ডার। এখানে বস্তু স্বরূপতঃ

ঐক হইলেও তাহাকে ত্রিবিধ জনে ত্রিবিধরূপে অনুভব করিতেছে কেন? কেন সকলে একবিধরূপে তাহাকে দেখিতেছে না? জ্ঞানের বিষয় যেরূপ হয়, জ্ঞানও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। বিষয়ের বৈচিত্রী নিবন্ধনই জ্ঞানেরও বৈচিত্রী হইয়া থাকে। অতএব এখানেও জ্ঞানের (ভোগের) বৈচিত্রী সিদ্ধ্যর্থ বিষয়েরও বৈচিত্রী তোমাকে মানিতে হইবে। তবেই তুমি বলিতে বাধ্য, যে স্ত্রীলোকটী বাহ্য স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার যে আর একটী তদতিরিক্ত মনোময় ভোগ্যতাকাব স্বরূপ আছে তাহা নাকি বিচিত্র, তাহা নাকি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন, তাই উক্ত ত্রিবিধ জনের উক্ত স্ত্রী বিষয়ক ত্রিবিধ জ্ঞানের উদয় হইতেছে। উক্ত ভোগ্যতাময় স্বরূপ কেন ভিন্ন ভিন্ন হইল? যেহেতু উহা মনের সৃষ্টি, মন (অন্তঃকবণ) নাকি প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন, তাই তাহার সৃষ্টিও ভিন্ন ভিন্ন। যে পরপুরুষ, সে ব্যক্তির মনে উক্ত স্ত্রীলোকটীকে না পাওয়া বশতঃ রজোগুণোদ্রেক প্রযুক্ত দুঃখের উদয় হইতেছে। যে সপত্নী, তাহার মনে অধিক ভালবাসা প্রযুক্ত তমোগুণোদ্রেক নিবন্ধন দ্বেষের উদয় হইতেছে। যিনি স্বামী, রূপসী স্ত্রী-লোকটী তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সত্বোদ্রেক নিবন্ধন তাঁহার মনে সুখের উদয় হইতেছে। মনোনিহিত সত্বরজস্তমো গুণের ভেদানুসারে মানসিক সৃষ্টিরও বিভিন্নতা হইয়া গেল। এই জন্য সেই ত্রিবিধ জনে একবিধ স্ত্রী-লোকটীকে ত্রিবিধ ভাবে দেখিতেছে। স্ত্রীলোকটী স্বরূপতঃ ঈশ্বরদ্বৈত, আর তাহার সুখময় দুঃখময় ও দ্বেষময় এই তিনটী স্বরূপ জীবদ্বৈত।

যদি বল স্ত্রী বিষয়ক জ্ঞানেরই বিভিন্নতা হয় হউক, কিন্তু স্থূল বলিয়া সেই জ্ঞানেব বিষয় স্ত্রী আকাবের ভেদ কেন মানিব। কৈ জ্ঞানের ভিন্নতা বশতঃ স্ত্রী শরীবের তো কোন ভিন্নতা (বৈলক্ষণ্য) দেখা যাইতেছে না। তোমাব এ কথাব উত্তব পূর্ব্বেই দিযাছি। তথাপি আবও একটু বলিব। স্ত্রীর স্বরূপ দ্বিবিধ, এক মাংসময় অপর মনোময়। মাংসময় শরীরের ভিন্নতা না হইলেও মনোময় শরীবের ভিন্নতা হইতেছে। মনুষ্যের স্বপ্নকালে যেমন বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও একটা মনোময় জগতেব সৃষ্টি হয়, সেইরূপ জাগ্রদ্দশাতেও স্ত্রী-দর্শন-কালে তোমাব অন্তর্জগতে একটা মনোময়ী স্ত্রী উৎপন্ন হইতেছে। তবে স্বপ্নদশায় ও জাগ্রদ্দশায় এইটুকু বিভিন্নতা, যে স্বাপ্নিক সৃষ্টি বাসনাময়, আব জাগ্রৎ সৃষ্টি বৃত্তিময়। (একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি) এই মনোময় সৃষ্টিই জীবের বন্ধন কাবণ, কেন না ইহাই সুখ দুঃখ ভোগেব হেতু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃত্তি হইলে তবে জীব-সাক্ষীর প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষই ভোগপদ-বাচ্য। এই বৃত্তির যদি নিবোধ হয়, এই মনোময় জগতের যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলে জীবকে আর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, জ্বালা যন্ত্রণাব অগ্নিময়ী জ্বালা মালায় আর জ্বলিতে হয় না। এই মনোময় জগতই যত আপদেব মূল। ইহাকেই ভয় করিতে হয়। বাহ্য জগৎকে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, উহা বন্ধেব কাবণ নহে। যে কার্য্যের প্রতি যাহার কারণতা, সেই কার্য্যেব সহিত সেই কাবণের অন্বয় ব্যতিরেক থাকা চাই। যেমন একটা দৃষ্টান্ত লউন, ঘটের প্রতি দণ্ডের কারণতা। দণ্ড থাকিলে তবে ঘটের উৎপত্তি হয়, দণ্ড না

থাকিলে ঘটের উৎপত্তি হয় না। ইহাই অন্বয় ব্যতিরেক।
এইরূপ যদি বুঝিতাম, বাহ্য পদার্থ না থাকিলে বন্ধন হয়
না, তাহা হইলে বন্ধনের প্রতি উহার কারণতা স্বীকার
করিতে পারিতাম। কিন্তু এমন স্থল দেখাইতে পারি,
যেখানে বাহ্য পদার্থ বিন্দুমাত্রও নাই, অথচ বন্ধন হইতেছে।
দেখুন যেমন স্বপ্নাবস্থায়। এ অবস্থায় বাহ্য পদার্থ না থাকি-
লেও জীবের সুখ দুঃখ ভোগরূপ বন্ধন ঘটিতেছে। অতএব
বুঝিতে হইতেছে, মনোময় জগৎই বন্ধনের কারণ।

বহুদিন হইল পিতাকে ছাড়িয়া পুত্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন।
কোনই সমাচার পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু তিনি জীবিত
আছেন। এমন অবস্থায় একজন প্রতারক আসিয়া পিতাকে
বুঝাইলেন যে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা
শুনিবামাত্রেই পিতা কাঁদিয়া উঠিলেন। পুত্রের (বাহ্যবস্তুর)
মৃত্যু না হইলেও প্রতারকের কথা শুনিয়া পিতার মনো-
ময় পুত্র নাকি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, তাই পিতা কাঁদিয়া
উঠিলেন। আবার পুত্রের মৃত্যু হইলেও সমাচার না পাইলে
পিতা কাঁদেন না। কেন না, মনোময় পুত্র তাঁহার মন মাঝারে
তখনও বিরাজ করিতেছে। তবেই বলিতে হয়, মনোময়
জগৎই বন্ধের কারণ। একটা গল্প বলিতেছি। এক বুড়ি
গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখিল, যে স্তূপাকার তুলা বোঝাই
করা কতকগুলা নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে। সেই
স্ত্রীলোকটি তুলা পিঁজিয়া উপবীতাদি তৈয়ার করিয়া জীবিকা
নির্ব্বাহ করিত। তাহার মনে বড় ভাবনা হইল, এই রাশি
রাশি তুলা পিঁজিবে কে? এত তুলা কোথায় যাইবে, কি হইবে।

সে ইহার কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। সে এ কথা ভাবিতে ভাবিতে পাগল হইয়া গেল, কত ডাক্তার দেখিল, কেহই তাহার পাগলামি আরাম করিতে পারিল না। অবশেষে একজন বুদ্ধিমান্ লোক দয়া করিয়া তাহাকে বাড়িতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তিনি তাহাকে মিথ্যা করিয়া বলিলেন, দেখ্ বুড়ি, তুই সে দিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়ে যে অনেক তুলার নৌকা দেখে এসেছিলি, সে গুলো সব আগুন লেগে পুড়ে গেছে। এ কথা শুনিবামাত্রই বুড়ি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আঃ বাবা বাঁচালে। এই কথা বলিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার মনের ভিতর যে স্তরে স্তরে তুলার রাশি জমিয়াছিল, সে গুলো যেন একবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তাহার ভাবনা মিটিল, পাগ্‌লামিও আরাম হইল। তাই বলিতেছি, মনোময় সৃষ্টিই যত আপদের মূল। বাহিরের তূলা বাহিরেই বহিয়া গেল, তাহার কণামাত্রও ত পুড়িল না, এ কথা ঠিক! কিন্তু বুড়ির মনের ভিতরে যে একটা তূলার বিষম চিত্র উঠিয়াছিল, তাহা নাকি মুছিয়া গেল, তাই বুড়ি শান্ত হইল। এই যে প্রতিবিম্ব অথবা বৈদান্তিক ভাষায় এই যে তুলারূপ বিষয়ের সহিত মনের অভিন্নরূপে পরিণাম, ইহাই জীবের নিজ সৃষ্টি। ইহার উপর জীবেরই নাকি কেবল্ হাত আছে, তাই ইহা জীবদ্বৈত।

ভিতর ও বাহির।

ভিতর ও বাহির লইয়াই জগৎ। একটি সদর অপরটি মফঃস্বল, একটি স্থূল অপরটি সূক্ষ্ম, একটি আবরণ অপরটি আবৃত, একটি ভূষণ অপরটি ভূষিত, ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাই জগতের শোভা। জগৎ আবরণকে বড় ভাল বাসে। কেন না, আবরণেই তাহার উৎপত্তি, আবরণের বিনাশেই তাহার বিনাশ। সুতরাং আবরণই জগতের সর্ব্বস্ব। আবরণের অলঙ্কার না থাকিলে জগতের মলিন মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িত, উপরের চাক্‌চিক্য বিনষ্ট হইয়া ভিতরের ভস্মস্তূপ ছড়াইয়া পড়িত। চলচলে মরীচিকা দেখিয়া তৃষ্ণাতুর মৃগ দৌড়িয়া যায়, টুকটুকে মাকাল ফলে বালকের মন মোহিত হয়, কেহই তাহার ভিতরের দিকে তাকায় না। ততখানি পরিশ্রম করিতেও কেহ প্রস্তুত হয় না। জগতের প্রতি আমাদেরও সেই ভাব।

আমরা জিনিস ছাড়িয়া আবরণ লইয়া উন্মত্ত। ফলের ভিতরের শস্য ভাগটুকু ছাড়িয়া আমরা তাহার উপরের আবরণ টুকু চিবাইতে চাই, বড় বিভ্রাটের কথা। আমি তোমাকে ভালবাসি, এ একটা ফাঁকা কথা। তোমার কোন একটি গুণের মাধুরী, কোন একটি ভাবের লহরী, কোন একটি সৌন্দর্য্যের রশ্মি মালা সকলে মিলিয়া তোমার উপর এমনি একটা কুহকময় আবরণ রচনা করিয়াছে, এম্‌নি একটা সজ্জাগজ্জা সাজাইয়াছে, আমি তোমাকে ভুলিয়া তাহাকেই

ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি! "তোমাকে" ভাল বাসি নাই,
তোমার আবছায়াকে ভাল বাসিয়াছি। আমার মনশ্চক্ষু
সম্মুখে প্রথমে তোমার বিচিত্র আবরণটিকেই দেখিতে পাই-
য়াছে। সেই আবরণেব মধ্যে তুমি রূপ যে আবার একটা
অতিরিক্ত জিনিস আছ, তাহার সঙ্গে আমাব মনের কোন
জানা শুনা নাই, আলাপ পবিচয় নাই। কাজেই অজানা
অচেনা তুমি, তোমাকে মন কেমন কবিয়া ভাল বাসিবে?
তোমাকে জানিতে হইলে তোমার সঙ্গে আলাপ পবিচয় করিতে
হইলে বড বিপদে পড়িতে হয়। প্রকৃতত তোমাকে জানিতে
হইলে প্রথমে তোমার এই মোহন শাবীবিক ছবিটিকে ভুলিতে
হইবে। তোমার সেই মধুর কোমলকান্তি সুহাস্য বদনখানি
ভুলিতে হইবে। তোমাব অমিয় ভাব-পূর্ণ মমতা ও ভালবাসার
খনি অন্তঃকরণটিকেও বিদায় দিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে,
তাহাব বিপরীত ভাবনাও ভাবিতে হইবে। এই যে তোমার
শরীরটা ইহা একটা রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জার পিণ্ড ভিন্ন কিছুই
নহে। এই যে তোমাব মনটা, ইহা তোমার মায়িক বন্ধন-
রজ্জু—ভব-খর্পরেব নিদারুণ অসি। এই যে "তুমি" ভিন্ন যাহা
কিছু স্থূল দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সকলই জড়ত্বেব পরিণাম
মাত্র, বিকারেব বিস্ফুরণ মাত্র। সকলেরই অণু পবমাণুতে
অনিত্যতা মাখা। ইহা ছাড়া তুমি একটা জিনিষ আছ। এত
গুলি স্তর ছাড়াইয়া এতখানি পরিশ্রম করিয়া তবে তোমাকে
জানিতে হইবে। সুরূপকে বিরূপ ভাবিয়া, অমৃতকে হলাহল
ভাবিয়া প্রাণের প্রিয়তমকে পায়ে ঠেলিয়া "তোমাব" কাছে
পৌঁছিতে হইবে। বড় বিষম কথা! এ বড অসাধ্য সাধন।

ইহা আমার মনের সামর্থ্যের বহির্ভূত। কাযেই আমি তোমাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না। তোমার আবরণ লইয়াই মুগ্ধ হইলাম। তোমার আবরণ ক্ষণভঙ্গুর, আমার ভালবাসাও ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু আত্মজ্ঞ যোগীর ভালবাসা নিত্য। কেননা তিনি আবরণ ভেদ করিয়া জিনিষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। তিনি একটি কুক্কুরকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তদপেক্ষা উন্নত জীব মনুষ্যকেও সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তিনি জানেন, কুক্কুরত্ব মনুষ্যত্ব ভিন্ন হইলেও কুক্কুরাত্মা মনুষ্যাত্মা ভিন্ন নহে। আবরণ ভিন্ন হইলেও জিনিষ কিন্তু অভিন্ন, উপাধি ভিন্ন হইলেও উপহিত অভিন্ন। আমাদের চক্ষে কুক্কুর একটা চতুষ্পদ লাঙ্গুলধারী হেয় জন্তু বিশেষ। অন্তর্দর্শী যোগীর চক্ষে তাহাই আবার শুদ্ধ, বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব—চিতিশক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি। আমাদের চক্ষে কামিনীর কান্তিময়ী কায়-ললিতা কতই কমনীয়, কিন্তু যোগীর চক্ষে তাহা মেদ, পূয, রক্তের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। একজন স্থূলদর্শী মূর্খের চক্ষে একখানা তালপাতার জীর্ণ খুঙ্গী পুঁথী হয় ত হেয় বলিয়া পুড়াইবার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু বিদ্বানের চক্ষে তাহা শিরোধার্য্য অমূল্য নিধি। তীব্রবিশ্বাসী প্রেমিকের প্রাণে "হরি" এই কথাটী কত মধু ঢালিয়া দেয়, তিনি "হরি" এই নাম শুনিয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া যান। স্থূলতার কীট আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা কেবল "হ" "রি" এই অক্ষর দুইটাই শুনিয়া থাকি। আজ আমাদের আর্য্যপ্রকৃতি আর্য্যভাব এম্নি মলিন আবরণে ডুবিয়া গিয়াছে,—পূর্ণিমার চন্দ্রমা এম্নি কলঙ্কে বিরূপ হইয়া গিয়াছে, স্বচ্ছ দর্পণে এম্নি কলুষ রাশি জমিয়াছে, যে প্রকৃত শাস্ত্রীয়

সত্যের প্রতিবিম্ব আর তথায় পড়ে না। আজ ন্যায়শাস্ত্র পড়িলে কোথায় শুদ্ধ-বুদ্ধির উদয় হইয়া ব্রহ্ম-মননে নিযুক্ত হইব, কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে তাহা না হইয়া একটি ঘোর নাস্তিক হইয়া বসিলাম। আজ বেদ পড়িয়া বৈদিক প্রকৃতি লাভ করিয়া কোথায় জীবনকে ধন্য মনে করিব, কিন্তু হায়! তাহা না হইয়া বেদ আমার চক্ষে চাষার গান হইয়া দাঁড়াইল। সে কালের লোকে কি জানি বেদ পড়িয়া কি বুঝিত। আমি কিন্তু তেমনটি বুঝিতে পারি না। সম্মুখে মেঘের কালিমা যেমন সূর্য্যকে নেত্র-পথের অতীত করিয়া দেয়, তেমনি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে কি একটা আবরণের বিকট মূর্ত্তি বৈদিক প্রতিভার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। যিনি শাস্ত্রের আবরণ ভেদ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকৃত প্রতিপাদ্য বুঝিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী। যিনি সে টুকু পাবেন নাই,—তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও মূর্খ, যিনি সে টুকু পাবিয়াছেন, তিনি অশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও পণ্ডিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। চৈতন্যদেব যখন নীলগিরিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ের একটী কথা বলিতেছি।

একদিন চৈতন্য দেব পথে যাইতেছিলেন, তাঁহার পথ পার্শ্ববর্ত্তী কোন গৃহ হইতে ভগবদ্গীতা পাঠের অশুদ্ধ উচ্চারণ ধ্বনি তাঁহার কর্ণদেশে বাজিল। তিনি সেই শব্দের অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে একটী গৃহে একটী ব্রাহ্মণ-সন্তান বড়ই প্রেমের সহিত একখানি গীতা পাঠে নিযুক্ত। তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারা গণ্ডস্থল দিয়া বহিয়া যাইতেছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার গাত্র হইতে যেন স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ফুটন্ত চন্দ্রমায়

জন্যে তাঁহার মুখখানি গৃহ আলো করিয়া রহিয়াছে। চৈতন্যদেব স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি গীতার যে অংশ আবৃত্তি করিতেছ, ইহার সমস্ত অর্থ কি বুঝিয়াছ,—যদি বুঝিয়া থাক, তবে অশুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে কেন? তুমি গীতা কাহার কাছে অধ্যয়ন করিয়াছ; সে গুরুর নাম কি? ব্রাহ্মণকুমার উত্তর করিলেন, আমি গীতা কাহারও কাছে পড়ি নাই। গীতার অর্থ আমি বুঝি না। গুরু-আজ্ঞায় কেবল আবৃত্তি করিয়া যাইতেছি মাত্র। চৈতন্যদেব আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গীতার অর্থ কিছুই বুঝনা, অথচ কিসের ভাবে উন্মত্ত হইয়া অশ্রুজল ত্যাগ করিতেছ; তিনি উত্তর করিলেন, আমি যখন গীতা খুলিয়া গীতার একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে যাই, তখনই আমার সম্মুখে সেই পীতাম্বরধারী শ্যামল-জলদবপু লীলারসময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথে সারথি অর্জ্জুনের সহিত বসিয়া যেন হাঁসিতে থাকেন, আমি আমার সেই প্রাণের ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। তাই কাঁদিয়া ফেলি। চৈতন্যদেব অবাক্ হইয়া তাঁহার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন, বৎস! তোমারই গীতা পাঠ সার্থক। তুমিই গীতার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছ, সাগরে ডুবিয়াছ, আর সব পণ্ডিতেরা কেবল গীতার বাহ্যর স্তূপরূপ বোঝা বহিয়াই মরে। কেবল গীতার মুখস্ পরিয়া নটের কার্য্য করে। তুমি দেবতা, তোমার পায়ের ধূলা লইতে হয়!

আমরাও চৈতন্যদেবের সুরে তাহাই বলিতে চাই। বাস্তবিক শাস্ত্র পড়িয়া যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যের দিকে তাকায় না, সে বড় হতভাগ্য। আবরণের কুহকে না মজিয়া জিনিষের দিকে দৃষ্টিপাত করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। বাহিরের অবগুণ্ঠন হইতে

ভিতরের দিব্য প্রভাকরণই উন্নতির লক্ষ্য। স্থূলকে পৃথক্ করিয়া সূক্ষ্মের বিভিন্ন অস্তিত্ব নিরূপণ করাই মনুষ্যজীবনের ব্রত। কিন্তু যাঁহারা প্রথমে একবারেই স্থূলকে বিনষ্ট করিয়া, স্থূলকে পরিত্যাগ করিয়া, স্থূলের সাহায্য না লইয়া সূক্ষ্মের দিকে দৌড়িতে থাকেন, তাঁহাদের পতন পদে পদে। তাঁহারা ভ্রান্ত জীব। যাঁহারা স্থূলকে সূক্ষ্ম নিরূপণের যন্ত্র করিয়া লন, তাঁহারাই প্রশংসনীয়। অগ্রে স্থূলের স্থূলত্ব বোধ না জন্মিলে সূক্ষ্মের সূক্ষ্মত্ব বোধ হইতে পারে না। অগ্রে স্থূল শরীর ও লিঙ্গ শরীর এই দুইটী আপেক্ষিক স্থূলত্ব পৃথক্ পৃথক্ করিয়া না বুঝিলে ইহাদের সাহায্য না লইলে আত্ম-স্বরূপ বোধ হইতে পারে না। যিনি সাধক, তিনি ধীরে ধীরে একটীর পর একটী করিয়া আবরণ উন্মোচন করিতে করিতে আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবেশ করেন। প্রথমে অন্নময় কোষ, তার পর প্রাণময় কোষ, তার পর মনোময় কোষ, তার পর বিজ্ঞানময় কোষ, তার পর আনন্দময় কোষ, এই প্রকার পর পর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আত্মা অপেক্ষা স্থূল আবরণগুলি ভেদ করিতে করিতে সাধক যখন সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে মগ্ন হন, তখনই তাঁহার কামনার শেষ হইতে থাকে। তখনই তিনি প্রাণারাম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিকে দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হন। কিন্তু তখনও তিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পান না। তখনও তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় নাই। কাযেই পূর্ণভাবে তখনও তিনি আত্মাকে অধিকার করিতে পারিতেছেন না। বাঞ্ছিত বস্তুকে পূর্ণভাবে অধিকার করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। তিনি—মর্ম্মবেদনায় অধীর; তখন তিনি ভাবিতেছেন,—

"তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলাম আর পেলাম না।
"তারে আমার আমার মনে করি, আমার হয়ে আর হলো না॥
"সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হ'য়ে,
মরমে জলছে আগুন আর নেবে না।"

যখন তাঁহার ব্যাকুলতার একশেষ হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি নিরোধ সমাধি অবস্থায় পৌঁছিলেন। যাহা কিছু সংপ্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় অনিরুদ্ধ ছিল, নিরোধ-সমাধিতে তাহার সম্পূর্ণ বিলয় হইল। তখনই তিনি নিরাবরণ নিষ্কল ব্রহ্ম হইয়া দাঁড়াইলেন। ইহাই সূক্ষ্মতার নিরপেক্ষ চরম সীমা।

তুমি না দয়াময়ী ?

এত ডাকি, তবু সাড়া দাওনা কেন? এত কাঁদি, তবু ত তোমার প্রাণ গলে না? মাথা কুটিয়া কুটিয়া সারা হইলাম। ধূলায় লুটাপুটি খাইতে খাইতে অস্থিপঞ্জর খসিয়া গেল, তবু ত দেখি। তোমার দয়া হইল না। এমন আকুলি বিকুলি কাতর প্রাণে পাষাণকে ডাকিলে, সে উত্তর দিত। প্রেতিনীর পদতলে এই-রূপ লুটাইয়া পড়িলে সে হয় ত কোলে তুলিয়া লইত। আমার এ কাতরক্রন্দনে শ্মশানের নির্জীব প্রাণীও জাগিয়া উঠিত। কিন্তু তুমি নাকি চিন্ময়ী চৈতন্যময়ী মা, তাই এ পীড়িতের চীৎকারে জাগ্রত হও না; তুমি নাকি দীনদয়াময়ী করুণার কল্পলতিকা, তাই এ দীনের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাও না! তুমি

নাকি রাজরাজেশ্বরী মা অন্নপূর্ণা, তাই এ নিরন্ন ক্ষুধাতুরের মরমকাহিনী তোমার দরবারে প্রবেশ করিতে পারে না। এত দিনে বুঝিয়াছি মা! তোমার চাতুরী। কেবল জগৎকে তাহা বুঝাইতে বাকী আছে।

সাধক হয ত বলিবেন, তুমি ডাকিতে জান না, তাই তিনি শুনিতে পান না। প্রাণের সঙ্গীত তালে তালে তাঁহার কাছে গাইতে জান না, তাই তিনি প্রসন্ন হন না। আমি বলি, তেমন ডাকাব মত ডাকে তিনি যদি উত্তর দেন, তাহা হইলে সে ত ডাকার গুণ, ডাকারই মাহাত্ম্য। তাহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য কি প্রকাশিত হইবে? সাধকের সাধনার গুণে, মন্ত্রেব তেজে শব কঙ্কাল জাগিয়া উঠিয়া সাধককে যদি সাড়া দেয়, তাহা হইলে তাহা ত সাধনার তেজ, সাধনার বল, সাধনারই মাহাত্ম্য। তাহাতে শবের মাহাত্ম্য কি, শবের শক্তি কি? সাধকের আত্ম-শক্তি সেই শবের ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া সাধকের কামনাপ্রসূ হন, সুতরাং সেত অদ্বৈত-বাদ, সে উপাসনা হইলেও তাহার ভিতরে অদ্বৈতবাদ— একাত্মবাদ বালুকাস্তূপের ভিতরে ফল্গুনদীর মত চিক্ চিক্ করিতেছে। আমি যে দ্বৈতবাদী ভক্ত, আমি ভিতরে বাহিরে উভয়ত দ্বৈতবাদী, আমার আত্মশক্তি নাই, আমার সমস্ত শক্তিই যে তাঁহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত। আমার কোন্ শক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিব? আমি যে তাঁহারই শক্তিতে সঞ্জীবিত, তিনি যে শক্তিময়ী মা! তিনি ত শব নহেন তিনি আমার সদাই জীবন্ত জাগ্রত দেবতা। তিনি ত জড় নহেন, তিনি যে চিদানন্দময়ী চৈতন্যময়ী মা। তবে ডাকার

মত ডাকে তাঁহাকে জাগাইব কি? তিনি যে সদাই জাগ্রত। মন্ত্রের গুণে তাঁহার চৈতন্ত করিব কি, তিনি যে চিন্ময়ী।

যাহারা "ডাকার মত ডাকে" তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহে, তাহারা বিশ্বাস করে যে তাহাদের ডাকাতে এমনি শক্তি আছে, যে তাহার গুণেই তিনি প্রবুদ্ধ হইবেন। তাহারা ত নিজের শক্তিরই উপাসক, তাহারা ত নিজের উপরই নির্ভর করিল, তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর তাহাদের থাকিল কৈ? "আমি ভজন পূজন করিতে জানি না, আমার কোন শক্তি নাই, কোন গুণ নাই। তিনি নিজগুণে দয়া করিয়া আমার এ আঁধার গৃহ যদি আলো করেন, আমার এ অন্ধকূপ আনন্দ-কানন করিয়া তুলেন, তবেই আমার ভরসা।" ইহাই ঐকান্তিক নির্ভরের ভাষা। ভক্তের ভাষা এইরূপই হইয়া থাকে। যিনি সদাই প্রসন্ন আনন্দরূপ, তাঁহাকে আর নূতন করিয়া প্রসন্ন করিতে যাইবে কি? তোমার এ ক্ষুদ্র প্রসন্ন করিবার চেষ্টায় চির-প্রসাদ-শালিনী প্রেমানন্দময়ী তিনি কি আর অধিক প্রসন্ন হইবেন! আলোকের আধার সূর্য্য তোমার ক্ষুদ্র-দীপ-শিখায় কি আর অধিক প্রকাশিত হইবেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিব, ইহা মন হইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

যিনি সদাই জাগ্রত, তাঁহাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা বৃথা। যিনি সদাই প্রসাদপূর্ণ, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টাও বৃথা। তবে উপায় কি? উপায় আর কিছুই নহে, একমাত্র উপায় কেবল তাঁহার "দয়া।" তাঁহার দয়ার কোন কারণ নাই, কোন যুক্তি নাই। তাঁহার অতুল দয়া, কোন সূত্র

অপেক্ষা করিয়া প্রবাহিত হয় না। তাঁহার অহৈতুকী দয়া তোমার "ডাকার মত ডাক" অপেক্ষা করে না, সময় হইলেই তাঁহার দয়া পতিত দগ্ধ জীবকে শান্তির পথ দেখাইবে। এই আশা টুকু আমাদের ভরসা। দয়ালুর কাছে দীনের এ আশা চিরদিনই আছে। তিনি কেন আমাদিগকে দয়া করিবেন, এ যুক্তির কথা দয়ার ব্যাপারে খাটিতে পারে না। দয়া যুক্তির মুখাপেক্ষা করে না। দয়াবানের স্বভাবই এই যে দীনের দুঃখ তিনি মোচন করিবেন। এই যে সে দিন ভারতের অধীশ্বরী জুবিলির সময়ে কতকগুলি কয়েদীকে কারামুক্ত করিলেন, কেন করিলেন? তাহার ত কোন যুক্তি নাই। দয়া তাঁহার, তাই তিনি কয়েদীর দুঃখ দূর করিলেন।

সামান্য পার্থিব জগতের একজন অধীশ্বরী যদি এইরূপ দয়া করিতে পারেন, তবে যিনি ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাত্রী রাজ-রাজেশ্বরী, তাঁহার পক্ষে দয়া কি অসম্ভব কথা! তিনি কি দয়া করিয়া আমাদের মত আবদ্ধ জীবকে সংসার-কারামুক্ত করিতে পারেন না? জগতে এক শ্রেণীর দয়ালু আছেন, যাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করিলে, মরমের কান্না কাঁদিলে তবে তাঁহাদের দয়া হয়। কিন্তু তাঁহারা স্বার্থপর। প্রার্থনা না করিলেও যাঁহারা আপনা আপনিই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দীন-দুঃখ-বিমোচনে ব্যগ্র হন, তাঁহারাই উচ্চ শ্রেণীর দয়াবান্। তাঁহাদেরই দয়া কারণ-বিহীন, স্বার্থ বিহীন, অহৈতুকী। জগন্মাতার করুণকটাক্ষ এইরূপ দয়ারই আধার। তাঁহার এই দয়া স্বভাব-সূত্রে প্রবাহিত না হইলে জীবের আশা ভরসা কোথায়? তাঁহাকে প্রার্থনা বা মিষ্টস্তবে ভুলাইয়া

জীব। তুমি যে স্বকার্য্য সাধন করিবে মনে করিতেছ, তাহা ভুল। তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তবে তোমার উপাসনা স্তুতি মিনতি আদি যে নিষ্ফল, তাহা নহে। তোমার উপাসনা আদি তোমার নিজের জন্য, তোমার নিজ আধ্যাত্মিক জগতের কল্যাণের জন্য, এ সমস্ত যে তুমি তাঁহার জন্য তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য মনে কর, ইহাই তোমার ভুল।

দেবি। জানি আমরা পতিত, পাপী, তাপী, নরাধম। কিন্তু ইহাও ত জানি, তুমি "পতিতপাবনী।" তাই ত তোমার কাছে জোর করিয়া দাঁড়াইতে ভরসা হয়। অগ্নির দাহিকাশক্তি নিরর্থক হইত, যদি জগতে কাষ্ঠ নামক দাহ্য পদার্থ না থাকিত। তোমার মাহাত্ম্য তোমার কৃপাদৃষ্টির তেজ সমস্তই ব্যর্থ হইত, যদি পাপী তাপী নরাধম আমরা জগতে না আসিতাম। আমরা আছি তোমার জন্য, তোমারই মাহাত্ম্যের বিজয়-গাথা জগতে ঘোষিত করিবার জন্য। খাদ্য যেমন ক্ষুধার জন্য, পানীয় যেমন তৃষ্ণার জন্য, ঔষধ যেমন পীড়ার জন্য, আমাদের জন্য তেমনি তোমার কৃপা-বারি।

তোমার "সৎচিৎ, আনন্দ" এ সমস্ত কিছুই চাহি না, আমাদের যে টুকু অংশ, আমরা তাহাই চাই। যে টুকুতে আমাদের দাবি দাওয়া আছে, যে টুকুর উত্তরাধিকারী হইতে আমরা বাধ্য, সে টুকু তুমি দিবে না কেন? আমরা গরীব, আমরা দীন দুঃখী কাঙ্গাল। তাই ত তোমার সদাব্রতের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছি। তুমি দুয়ার খুলিবে না। আচ্ছা খুলিও না। ঐ দুয়ারেই আমরা পড়িয়া রহিব। নড়িব না, শত বিঘ্ন বাধা বুকে করিয়া ঐ খানেই পড়িয়া রহিব। কখনও ত

তোমাকে দুয়ার খুলিতে হইবে। যখন কোন তোমার প্রিয় ভক্ত মর্ম্মভেদী আহ্বানে ত্রিজগৎ কাঁপাইয়া তোমাকে ডাকিবে, তখন সে ডাকের তেজে ত তোমার টনক নড়িবে, তখন ত তোমারও সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া ভক্তের মস্তক তলে তোমার কৃপাবারি বৃষ্টি হইবে। তখন আমরাও সেই বৃষ্টির জলে এ কর্দ্দমসিক্ত কলেবর ধুইয়া লইব, ফাঁকি দিয়া তোমার করুণার নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিয়া লইব। তোমার চাতুরী আমাদের চাতুরীর কাছে পরাজিত হইবে।

বন্ধন-তত্ত্ব।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের নাম পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি। আত্মার এই ত্রিবিধ দুঃখ সংযোগের নাম বন্ধন। এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়াই আত্মার চরম লক্ষ্য। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড জ্ঞান বিজ্ঞান আদি যাহা কিছু উপায়, সমস্তই এই বন্ধন-বিমুক্তির জন্য আর্য্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। উক্ত উপায় সমূহের স্বর্গ-ভোগাদি গৌণ উদ্দেশ্য হইতে পারে, কিন্তু উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবকে মুক্তির পথে বন্ধন-বিমুক্তির পথে অগ্রসর করা। এই বন্ধনের উৎপত্তি কেমন করিয়া, ইহার স্বরূপ কি, প্রকৃতি কি, ইহার বিনাশই হয় বা কেমন করিয়া, এই সমস্ত তত্ত্ব এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়। আত্মার দুঃখ সংযোগাত্মক

বন্ধন স্বাভাবিক কি নৈমিত্তিক, কি ঔপাধিক ইহাই প্রথমে বিচাব করিতে হইবে। যদি বন্ধন আত্মাব স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয় অর্থাৎ আত্মা স্বভাবতঃ যদি বদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বন্ধন হইতে আত্মাব কদাচ মুক্তি হইতে পারে না। যে পদার্থের যাহা স্বভাব, তাহা হইতে তাহাব কথনও বিমুক্তি হইতে পারে না, যেমন উষ্ণত্ব অগ্নিব স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম হইতে অগ্নি কথনও বিচ্যুত হইতে পাবে না। স্বভাব পদার্থেব চির অনুগামী। বন্ধন আত্মাব স্বভাব হইলে তাহা কখনও আত্মাকে পবিত্যাগ কবিবে না। শতবার বিধৌত করিলেও স্বাভাবিক মলিনতা অঙ্গাবকে কিছুতেই ছাড়ে না। তাই ঈশ্বব-গীতাতে উক্ত হইযাছে।

যদ্যাত্মা মলিনঃ স্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ।
নহি তস্য ভবেন্মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি।

"যদি আত্মা স্বভাবতঃ মলিন, অস্বচ্ছ দুঃখাদি বিকার যুক্ত হয়, তাহা হইলে শত জন্মেও চেষ্টা করিলে তাঁহার মুক্তি হইবে না।" তবেই বুঝা যাইতেছে, আত্মার বন্ধন স্বাভাবিক নহে।

যদি বল, স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেও পদার্থের বিয়োগ হইতে পারে, যেমন অগ্নির উষ্ণত্ব ধর্ম্ম দ্রব্যবিশেষ-সংযোগে অগ্নি হইতে বিচ্যুত হয়, যেমন শুক্ল বস্ত্রকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিলে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম শৌক্ল্যের অপগম হয়, যেমন বীজের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অঙ্কুর-শক্তি অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বন্ধন পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও তাহা জ্ঞানাদি উপায় দ্বারা অপনীত হইতে পারে। অতএব আত্মার

বন্ধনকে স্বাভাবিক বলিতে দোষ কি? দোষ বিলক্ষণ আছে। তাহা বুঝাইতেছি। কোন দ্রব্যবিশেষ-সংযোগে অগ্নির উষ্ণত্ব ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অভিভূত হয়। লোহিত বর্ণ সংযোগে শুক্ল বস্ত্রের শুক্লত্ব একবারেই উচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু তিরো হিত হয়, তাই রজকের সাহায্যে পুনরায় তাহাতে শুক্লবর্ণ পরিস্ফুট করা যাইতে পাবে। এইরূপ বীজের অঙ্কুর শক্তিও অগ্নি দ্বারা অভিভূত হয় বটে, কিন্তু বীজ হইতে সমূলে উৎপাটিত হয় না। সময়ান্তরে যোগীর সঙ্কল্প শক্তি সেই দগ্ধ বীজেই অঙ্কুর শক্তিকে প্রস্ফুটিত করিতে পারে। যদি বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি একবারেই বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে যোগীর শত চেষ্টাতেও তাহার পুনরুত্থান হইত না। কেননা যাহা 'নাই', তাহার আর উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল, পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিনাশ হয় না, কিন্তু তিরোভাব হইতে পারে। যদি আত্মার বন্ধনকে স্বাভাবিক মানিয়া, জ্ঞানাদি উপায় দ্বারা তাহার তিরোভাব হয়, এইরূপ স্বীকার কর, তাহা হইলে শুক্ল বস্ত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম শুক্লত্ব যেমন এক সময়ে কারণ বিশেষ দ্বারা তিরোভূত হইয়া সময়ান্তরে পুনরুদ্ভূত হয়, সেইরূপ আত্মার বন্ধনও জ্ঞানাদি দ্বারা এক সময় অভিভূত থাকিয়া সময়ান্তরে পুনরুদ্ভূত হইতে পারে। তাহা হইলে তোমার মতে জীব দিন কতক মুক্তি সুখ উপভোগ করিয়া পুনরায় বন্ধন দশাগ্রস্ত হইবে। স্বর্গাদি ভোগের মত মুক্তিও তোমার মতে ক্ষয়শীল হইয়া দাঁড়াইল। মুক্তি যে নিত্য পদার্থ, তাহার ক্ষয়িত্ব কাহারও ত বাঞ্ছনীয় নহে? অতএব বন্ধনের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করিতে গেলে বিষম দোষ হইয়া পড়ে।

বন্ধন স্বাভাবিক নহে। বন্ধন নৈমিত্তিক কি না তাহা এখন দেখা চাই। যদি বন্ধনকে কালরূপ-নিমিত্ত-জনিত বলিয়া স্বীকার কর, তাহাও খাটিতে পারে না। কালবিশেষে আত্মা বদ্ধ হন, কালবিশেষে আত্মা মুক্ত হন, এইরূপ কাল সম্বন্ধ-নিবন্ধন যদি আত্মার বন্ধন-মুক্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে আমরা বলি যে অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল ব্যাপক পদার্থ। যাহা ব্যাপক, তাহার সহিত সমভাবে সকল পদার্থেরই সম্বন্ধ থাকে। যেমন আকাশব্যাপক পদার্থ, তাহার সহিত ঘট-পটাদি সকল পদার্থের একটা সংযোগাত্মক সমান সম্বন্ধ আছে। যে কালের সহিত সম্বন্ধ থাকায় আত্মা তোমার মতে বদ্ধ হইতেছেন, সেই কালের সহিত মুক্ত আত্মারও ত যোগ আছে, কেননা, কাল সর্ব্বসম্বন্ধী। তাহা হইলে তোমার মতে মুক্তআত্মাও বদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারও দুঃখ ভোগের হাত হইতে এড়াইবার যো থাকে না। সুতরাং কালরূপ নিমিত্ত নিবন্ধনও আত্মার বন্ধন বলিতে পার না।

যদি বল, ভোগায়তন স্থূল দেহ ধারণাদিরূপ যে সাংসারিক অবস্থা, এই অবস্থা নিবন্ধনই আত্মার বন্ধন, তাহাও প্রতিকূল যুক্তির সম্মুখে টিকিতে পারে না। আত্মার কোন ধর্ম্মই নাই, কোন অবস্থা নাই। আত্মা অপরিণামী-নির্ধর্ম্মক, বিকার-রহিত, সঙ্গ-রহিত। লিঙ্গ শরীরই স্থূলদেহ ধারণ করেন, লিঙ্গ শরীরই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং স্থূল দেহ ধারণাদিরূপ অবস্থা জড় লিঙ্গ শরীরের, চেতন আত্মার নহে। অতএব জড়ের অবস্থা চেতন আত্মার বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। একের ধর্ম্ম অপরের বন্ধন কারক কেমন

করিয়া হইবে? একের গলদেশে রজ্জু, অপরে বন্ধন-যন্ত্রণা ভোগ করিবে কেন? যদি বল আত্মার "অবস্থা" স্বীকার করিতে বাধা কি? বাধা বিলক্ষণ আছে। শ্রুতি বলিতেছেন "অসঙ্গোহয়ং পুরুষ" ইতি, "আত্মা সঙ্গরহিত।" সঙ্গ শব্দের অর্থ বিকার জনক সংযোগ। আত্মার কোনরূপ বিকারজনক সংযোগ নাই। সুতরাং অবস্থারূপ বিকার আত্মার সম্ভবে না। কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হইয়া থাকে। আত্মার অবস্থারূপ বিকার স্বীকার করিতে গেলে আত্মা পরিণামী হইয়া পড়েন। যাহা পরিণামী, তাহাই ধ্বংসশীল। যেমন স্থূল শরীরের বাল্য যৌবনাদি অবস্থারূপ পরিণাম হইয়া থাকে, এই জন্য তাহা অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ অবস্থা পরিণাম মানিলে আত্মারও অনিত্যত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। সুতরাং আত্মা অবস্থাবিহীন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। আত্মা যদি অবস্থা-বিহীন হইলেন, তাহা হইলে অবস্থা জনিত বন্ধনও তাঁহাতে সম্ভবে না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা আত্মা বদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং শুভাশুভ কর্ম্ম আত্ম-বন্ধনের হেতু, এ কথাও ঠিক নহে। কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে। কেননা আত্মা কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম বর্জ্জিত, ইহা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক যে অন্তঃকরণ, কর্ম্ম তাহারই ধর্ম্ম। সুতরাং জড়ের যাহা ধর্ম্ম; তাহা চেতনের বন্ধকারণ হইতে পারে না। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর একটা কথা, প্রলয়কালে আত্মা বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার উপাধি অন্তঃকরণও বিদ্যমান থাকেন। ধর্ম্মী যদি বিদ্যমান থাকিল, তাহা

হইলে তাহার ধর্ম্মও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে বাধ্য। সুতরাং প্রলয়কালে কর্ম্ম সুক্ষ্মাবস্থায় অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া থাকিল। কর্ম্ম সত্বে কর্ম্ম জনিত বন্ধনও স্বীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে প্রলয় কালেও আত্মার দুঃখ ভোগরূপ বন্ধনের আপত্তি হইয়া পড়ে। প্রলয়ে আত্মার দুঃখভোগ কাহারও ত মতসিদ্ধ নহে। সুতরাং বন্ধন শুভাশুভ কর্ম্মরূপ নিমিত্তজনিত এ কথা টিকিল না।

বন্ধন স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক নহে। এতক্ষণ ধরিয়া ইহা বুঝা গেল। বন্ধন ঔপাধিক, ইহাই সিদ্ধান্ত। বন্ধনের ঔপাধিকতা কিরূপ, তাহা পরিস্ফুট করা যাইতেছে। শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিকের কাছে একটী লোহিত বর্ণের জবা কুসুমকে রাখিয়া দাও। দেখিবে জবা কুসুমের সন্নিকর্ষে শুভ্র স্ফটিকের বর্ণও লোহিত হইয়া গিয়াছে। সহজ শুভ্র স্ফটিকের এই যে আরোপিত লোহিত বর্ণ, ইহা তাহার নিজস্ব ধর্ম্ম নহে। অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ইহা তাহার ঔপাধিক ধর্ম্ম। যে হেতু জবাকুসুম রূপ উপাধির সংযোগে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে। ঠিক এই দৃষ্টান্তের সহিত মিলাইয়া আত্মার বন্ধনের ঔপাধিকতা বুঝিতে হইবে। ধরিয়া লও, অন্তঃকরণ জবাকুসুমস্থানীয়, আর আত্মা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, শুভ্র, নির্ম্মল। জবাকুসুমে লৌহিত্য আছে, অন্তঃকরণেও দুঃখাদি ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। স্ফটিক যেমন স্বভাবতঃ শুভ্র, আত্মাও সেইরূপ স্বভাবতঃ শুদ্ধ—দুঃখাদি বিকার বিহীন। জবা কুসুমের লৌহিত্য যেমন স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়, অন্তঃকরণের দুঃখাদি ধর্ম্মও সেইরূপ আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়। স্ফটিকের লৌহিত্য ধর্ম্ম যেমন

ঔপাধিক, আত্মার দুঃখ সংযোগ রূপ বন্ধনও সেইরূপ ঔপাধিক ধর্ম্ম। তাই প্রাচীন আচার্য্যেরা বলিয়াছেন।

"যথাহি কেবলোরক্তঃ স্ফটিকো লক্ষ্যতে জনৈঃ।
রঞ্জকাদ্যপধানেন তদ্বৎ পরম পুরুষঃ।"

জবাকুসুম স্ফটিকের নিকট হইতে অপসৃত হইলে স্ফটিক যে শুভ্র সেই শুভ্রই থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণ আত্ম-সন্নিধি হইতে অপসৃত হইলে আত্মা বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হন। ইহাই আত্মার মুক্তি। অন্তঃকরণ-সংযোগে বন্ধনের অস্তিত্ব, অন্তঃকরণ-বিয়োগে বন্ধনের অভাব। সুতরাং জীবাত্মার সহিত অন্তঃকরণ-সংযোগই বন্ধনের প্রতি কারণ, অন্তঃকরণস্থিত দুঃখাদি আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আত্মাকে বন্ধন-যন্ত্রণা অনুভব করায়। আত্মা স্বভাবতঃ নির্লিপ্ত হইলেও অন্তঃকরণই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত করে। যেমন আকাশ স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও ঘটরূপ উপাধি-সংযোগে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মা স্বভাবতঃ ব্যাপক শুদ্ধ, শান্ত হইলেও জীবের অন্তঃকরণ রূপ উপাধি সংযোগে পরিচ্ছিন্ন, মলিন রূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং যত কিছু দোষ উপাধির, আত্মার নহে। বন্ধনাদি সমস্তই অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আত্মার পক্ষে তাহা কল্পিত মাত্র। এই কল্পিত ধর্ম্মকে আত্মা নিজস্ব মনে করিয়া বদ্ধ হন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল, অন্তঃকরণের সম্পর্কে থাকিয়াই আত্মা বদ্ধ হইয়াছেন, অন্তঃকরণের সহিত বিযুক্ত হইলে তাঁহার মুক্তি হইতে পারে। এই অন্তঃকরণ-সংযোগকে সাংখ্যমত-বাদীরা "প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ" এই আখ্যা দিয়াছেন।

অবিবেকই এই সংযোগের প্রতি কারণ। অনাত্মার সহিত আত্মার যে অভেদভাবে জ্ঞান, তাহাকেই "অবিবেক" বলে। প্রকৃতির কার্য্য অন্তঃকরণাদি জড় বর্গকে অনাদিকাল হইতে জীব আত্ম-দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছে। এই যে অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত জীবের মোহ, ইহাকেই "অনাদ্যবিদ্যা" বা "অবিবেক" বলে। এই অবিবেকের বলেই জীবাত্মা অন্তঃকরণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন। সাধনাদি দ্বারা বিবেক-জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলে এই অবিবেক দূরীভূত হয়। প্রকৃতি, হইতে পুরুষ ভিন্ন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে বিবেক জ্ঞানের উদয় হয়। বিবেক ভেদজ্ঞান, অবিবেক অভেদজ্ঞান, ভেদজ্ঞান অভেদজ্ঞানের বিরোধী। ভেদ-ভাবনা বলবতী হইলে অভেদ জ্ঞানরূপ অবিবেক চলিয়া যায়। অবিবেক বিনষ্ট হইলে অবিবেকের কার্য্য অন্তঃকরণ আত্ম সংযোগও তাহার সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। কারণ-বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যেরও বিনাশ হইয়া থাকে,, ইহাই নিয়ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্তঃকরণ-সংযোগেই বন্ধনের উৎপত্তি। অন্তঃকরণ-সংযোগ যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার বন্ধনও খসিয়া যাইবে। এই বন্ধনের ধ্বংসের নাম মুক্তি। সাংখ্যমতে মুক্তি অভাব-স্বরূপ, সুখরূপ ভাব পদার্থ নহে। ধ্বংসাভাবের বিনাশ হয় না। ভাবের বিনাশ হয়। মুক্তি নাকি নিত্যপদার্থ, তাই তাহাকে সাংখ্যাচার্য্যেরা অভাব স্বরূপ বলিয়াছেন।

আবাহন।

(৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে লিখিত)

দুঃখীর দেশে রাজরাজেশ্বরী মা আসিতেছেন দীন হীন কাঙ্গালের দেশে দয়াময়ী মা দয়া করিয়া শুভাগমন করিতেছেন, তাই দিকে দিকে উৎসবের বাজনা বাজিতেছে। ভিখারির জীর্ণ পর্ণ কুটীরে দিব্যধামবাসিনী জগজ্জননী আসিয়া বিরাজ করিবেন তাই ক্ষীণ প্রাণে আনন্দের লহরী উথলিয়া উঠিতেছে। ঘোরান্ধকার সমাচ্ছন্ন গভীর গিরিগুহায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন যোগীও যাঁহার বিদ্যুদ্বিকাশ ক্ষণেকের জন্যও অনুভব করিতে পান না সেই চিদ্‌ঘনকাদম্বিনী মহামায়া নিজ ভুবনমোহন মাধুরীর ধারায় দিগ্দিগন্ত আলোকিত করিয়া পতিত জনের উদ্ধারার্থ স্বয়মেব প্রাদুর্ভূত হইবেন, তাই আশার আশ্বাসে আশাহীন ভরসাহীন জীব আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করিয়া মনোলয় করিতে না পারিলে যাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয় না, সেই চিদানন্দরূপিণী দেবতা আজ অধম নিস্তারিণী মা হইয়া দর্শন দিবেন, তাই ভুবন ভরিয়া আনন্দের কল্লোল উঠিতেছে। শ্রুতি যাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মন ও বাক্য, যাঁহার গোচরীভূত হয় না সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমাত্মরূপিণী মা আজ গতিহীন অনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া করুণা কল্পলতিকা হইয়া অবতীর্ণ হইবেন, তাই আজ দীন দুঃখীর ঘরে

ঘরে আনন্দেব পশারা বসিয়া গিয়াছে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইয়া জগজ্জননী আজ করুণার সদাব্রত-শালায় দশহস্তে দুঃখী কাঙ্গালের বাঞ্ছিত সাধের সামগ্রী বিলাইবেন, তাই কামনার দাস আমবা আনন্দে আট খানা হইতেছি।

এস মা। এ রোগ-শোক জরা-জীর্ণ দেশে আরোগ্যবিধায়িনী হইয়া মা তুমি এস। এ উজাড় শ্মশান-প্রান্তরে সঞ্জীবনী চিন্ময়ী শক্তি হইয়া মা তুমি এস! এ দাবদহন-দগ্ধ মরুভূমে অমৃতের প্রবাহিনী হইযা মা তুমি এস! বড আশায় বড় ভরসায় মা। তোমার আবাহন করিতেছি। হৃদয়ের গুপ্তনিকেতনে গুছাইয়া গুছাইয়া কত কথা লুকাইয়া রাখিয়াছি, মা। তোমায় বলিব। দুঃখের কথা, জ্বালাযন্ত্রণাব কথা, মর্ম্মবেদনার কথা তোমাকে আমরা শুনাইব। সংবৎসরে মনঃপ্রাণের অন্তস্তম্ভে যে চিতা-ভস্ম জমিয়াছে, তাহাই তোমাকে উপহার দিব। কত শত অব্যক্ত যাতনায় আমাদের অস্থিপঞ্জর খসিয়া পড়িতেছে, মা,! তোমার তাহাই নিবেদন করিব। দেবি! এ জগতে দুঃখীদের "আপনার" বলিবার কেহ নাই। দূর হইতে দুঃখী ভিখারী দেখিলে সকলেই দ্বারদেশ বন্ধ করিয়া দেয়। জগতের এক কোণে ঘৃণিত—পদদলিত—শক্তিহীন মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছি। তাই শক্তি স্বরূপিণী মা! তোমার আশ্রয়াঞ্চলে মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদিতে চাই। মা! এবার তোমার পূজায় আমাদের দুঃখই কেবল উপকরণ হইবে। নয়ন-জল তোমার পাদ্য হইবে, রুধির ধারা তোমার চন্দন কুঙ্কুম হইবে, হৃৎপিণ্ড তোমার কুসুম হইবে,. বিলাপ-গাথা তোমার মন্ত্র হইবে। অস্থি মজ্জা মেদ মাংস সম্ভারে নৈবেদ্য সাজাইয়া

মা! তোমায় নিবেদন করিয়া দিব, বক্ষঃস্থল উৎপাটিত করিয়া মা! তোমার হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দিব। জলন্ত যাতনার চিতানল দিয়া মা! তোমার নীরাজনা করিব। মা! আমরা জন্মদুঃখী, দুঃখ ছাড়া আর আমাদের ভাণ্ডারে কোন সম্বল নাই। তাই দুঃখময় সামগ্রী সম্ভারেই মা! তোমার অর্চ্চনা করিব। তোমাকে তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে।

দুরবস্থার আর বাকি কি? বল নাই, বুদ্ধি নাই, ধন নাই, সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই, মনুষ্যত্বের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। ক্ষুধার্ত্ত কুকুর এক মুষ্টি অন্ন পাইলে যেমন চরিতার্থ হইয়া যায়, সেই রূপ কোন রূপে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিলেই আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই। আর কিছু কামনার বস্তু জগতে খুঁজিয়া পাই না। এমনই দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দারুণ জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ভুলিয়া দিন দিন পথভ্রষ্ট হইতেছি। পরপদ তাড়নে লাঞ্ছিত হইয়া শরীর মন আত্মার স্বাধীনতা হারাইয়া ধূলিকণার সহিত মিশিয়া যাইতেছি। আশা নাই, ভরসা নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, তেজ নাই, স্রোতের সেহলার মত উদ্দেশ্যহীন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ভাসিতেছি। মাথার উপর দিয়া শত ঝঞ্ঝাবাত বর্ষিয়া যাইতেছে, বক্ষোদেশে মহাশূল তীমবেগে প্রোথিত হইতেছে, জীর্ণ শীর্ণ অস্থিকঙ্কালময় দেহে প্রাণটা ধুক্ ধুক্ করিতেছে। আর বাঁচিবার আশা নাই মা! অন্তিম কালে নগেন্দ্রনন্দিনি! একবার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াও! জনমের মত ও জগদ্দুলাল-মাধুরীমাখা মুখখানি একবার দেখিয়া লই। সাধ মিটাইয়া ও ভুবনমোহন প্রতিমা দেখিয়া জুড়াইয়া যাই। মা! মরিব, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু তোমার উপা-

স্বক হইয়া হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা তোমার পূজক হইয়াও আজ পৌত্তলিক হিন্দু মরিল, ইহাতে তোমারই কলঙ্ক যে চারিদিকে রটিবে, তাহাই ভাবিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়। মা! আর আমাদের বাঁচিয়া লাভ কি? মরণই আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। জীবন যে জঞ্জালময় হইয়া উঠিয়াছে। এ কালা মুখ জগতের কাছে আর দেখাইতে পারি না। লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। মা! এ অবসাদময় জীবনভার ফুরাইয়া দাও! এ জ্বালাযন্ত্রণাপূর্ণ অনুভূতির অবসান করিয়া দাও! এ শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনা হইতে অব্যাহতি দাও! ইহাই প্রার্থনা।

কামনা ও বৈরাগ্য।

অগ্নি ও জলে, আলোক ও অন্ধকারে যেমন একটা বিরোধিতার সম্বন্ধ, কামনা ও বৈরাগ্যে সেইরূপ একটা বিজাতীয় সম্বন্ধ আছে। কামনা জীবকে যে পথে লইয়া যায়, বৈরাগ্য সে পথ হইতে ফিরাইয়া তাহাকে অন্য পথে পরিচালিত করে। কামনা জীবকে রাগ ও ভোগ, আসক্তি ও অনুরক্তি, বিহার ও সংসারের পথে লইয়া যায়, বৈরাগ্য জীবকে ত্যাগ ও যোগ, বিরক্তি ও অনাসক্তি, অনাহার ও সংহারের দিকে ভাসাইয়া দেয়। কামনা কমনীয়া কামিনীর মত পূর্ণিমার বিমল কিরণজালজড়িত তটিনীর তীরদেশে বসিয়া জীবকে ভোগ বিলাসের পরামর্শ দেয়, আর বৈরাগ্য জ্ঞানগম্ভীর উদাসীনের ন্যায়

জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে শ্মশানের বিকট চিত্র অঙ্কিত করিয়া জীবকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দেয়। কামনা প্রবৃত্তির পথে, বৈরাগ্য নিবৃত্তির পথে নিজ রাজ্য বিস্তার করে। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ, এ রাগ ও ত্যাগ মার্গ এই দুইটী পন্থা আমাদের সম্মুখে পড়িয়াছে। কলিযুগের জীব আমরা কোন্ পথে যাই, ইহাই এখন প্রশ্ন।

অভাব-বুদ্ধি জীবকে যত দিন ঘিরিয়া থাকিবে, কামনা ততদিন নিশ্চয়ই জীব-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে, যে দিন জগতের সমস্ত অভাব মিটিবে, সেই দিনই জীব পূর্ণকাম হইতে পারিবে। যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন কামনা প্রিয়তমা সখীর ন্যায় জীবকে জগতের কত নিকুঞ্জ-কানন দেখাইয়া বেড়াইবে। সুতরাং জাগতিক অবস্থায় কামনা জীবের স্বতঃসিদ্ধ সঙ্গী। কামনার হাত এড়াইয়া কেহই এক পা চলিতে পারেন না। কামনার কুহক-জালে প্রত্যেক জীবই অন্ধীভূত। কামনা-রজ্জুর আকর্ষণে নাক-ফোঁড়া বলদের মত এ জগৎ অবিরত ঘুরিতেছে। কামনার মোহিনী মূর্ত্তিকে জগৎ এতদূর ভাল বাসিতে অভ্যাস করিয়াছে, যে নিষ্কামতার মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকিতেও জগৎ ভীত হয়। সুতরাং স্বভাবতঃ যে কামনার দিকে জীবের গতি, সেই গতির স্রোত উল্টাইয়া বৈরাগ্যের অনন্ত কুণ্ডে ঝম্প দেওয়া বর্ত্তমান কলিযুগে জীবের পক্ষে কতদূর সাধ্যায়ত্ত, তাহাই বিচার করিতে হইবে।

জগতে শিক্ষা দ্বিবিধ। এক প্রকৃতি ও অনুরাগের অনুকূল শিক্ষা, দ্বিতীয় তাহার প্রতিকূল। বিদ্যা শিক্ষাই বল, আর

ধর্ম্ম শিক্ষাই বল, সকল শিক্ষারই এই দুইটী শ্রেণী আছে। শিক্ষা-ভেদে শিক্ষকও দুই প্রকার। আবার শিক্ষার্থী অধিকারীও দুই প্রকার, অধম আর উত্তম। মধ্যমের কথা এখন ছাড়িয়া দাও। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও অনুরাগ তত্ত্বের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া তদনুকূল শিক্ষার বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক, বাতাসের অনুকূল গতি ও জোয়ারের সুবিধা বুঝিয়া যে মাঝি নৌকা চালায়, তাহার পটুতাকে সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে, সেইরূপ ছাত্রের প্রবৃত্তি স্রোতের জোয়ার ভাঁটা বুঝিয়া যে শিক্ষক শিক্ষা তরণিকে এ সংসার সাগরে চালিত করিবেন, তিনিই ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর প্রাণের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। যে শিক্ষক ছাত্রের প্রবৃত্তি ও অনুরাগের প্রতিকূলে শিক্ষা দণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তাঁহাকে সুশিক্ষক বলা যাইতে পারে না। সময়ে সময়ে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা হয় ত নিষ্ফলও হইতে পারে। পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটি কেবল খেলা করিয়া বেড়াইতে চায়। তাহার খেলিবার প্রবৃত্তি পড়া শুনার বাসনাকে পরাজিত করিয়াছে। তাহার এই ক্রীড়াময়ী প্রবৃত্তিকে দমিত করিয়া তাহাকে পড়া শুনার রাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে। যিনি আনাড়ি শিক্ষক, তিনি মারিয়া ধরিয়া বলপূর্ব্বক শিশুটির ক্রীড়া প্রবৃত্তি চাপিয়া তাহার মন পড়াশুনার দিকে নোয়াইবেন, ইহাই তাঁহার চেষ্টা। কিন্তু যিনি প্রকৃত শিক্ষক, তিনি সেই ক্রীড়া প্রবৃত্তির ভিতর দিয়াই শিশুকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিবেন। এই দ্বিবিধ চেষ্টার মধ্যে শেষোক্ত চেষ্টাই যে ফলবতী, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন একজন ধনীর এক মাত্র

পুত্র ছিল। এক মাত্র পুত্রের প্রতি ধনীর স্নেহও যথেষ্ট ছিল। কাযেই দিন দিন ছেলেটি আদুরে গোপাল হইয়া দাঁড়াইল। সেই আদুরে গোপালকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ধনী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কোন শিক্ষকই তাহাব মন লেখা পড়াব দিকে আকৃষ্ট কবিতে পারিলেন না। সে সর্ব্বদা পায়রা লইয়া খেলা কবিত, তাহাকে মারিয়া ধরিয়া বলপূর্ব্বক পড়াইতে বসাইবার কল্পনা শিক্ষককে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কেননা, সে আদুরে গোপালকে মারিবাব ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কাযেই শিক্ষকেরা বিফল মনোবথ হইয়া চলিয়া গেল। অনেকের পিতার বহু চেষ্টার পব একজন চতুব শিক্ষক তাহাব অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষক প্রথমে আসিয়া ছাত্রের কাছে পড়া শুনার কোন গোলযোগ তুলিলেন না। কেবল দিন কতক মিষ্ট কথায়, আদব আপ্যায়িতে তাহাব মন ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাব সহিত খেলাও জুড়িয়া দিলেন। এক দিন তিনি বলিলেন দেখ, তোমাব পায়রার সংখ্যা বড অল্প, এত অল্প পায়রা লইয়া কোন কায হইবে না, আরও দুইশত পায়রা কেন। খুব বড় করিয়া একটা টোং করিতে হইবে। ছাত্র দেখিল ভারি মজা। সে যাহা চায়, গুরু তাহারই অনুকূল। সুতরাং সানন্দ মনে ছাত্র তাহাই করিল। গুরু একদিন বলিলেন, দেখ, এতগুলা পায়রার এক একটা নাম ও চিহ্ন রাখা চাই। নহিলে একটাকেও চিনিতে পারা যাইবে না। এই বলিয়া গুরু লক্ষ্য, খুব্‌খি এই সমস্ত নামের পরিবর্ত্তে "ক" "খ" এই এক একটি অক্ষর প্রত্যেক পায়রার নাম রাখিলেন। তিনি এইরূপ সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ এক একটা টুকরা কাগজে লিখিয়া

ছাত্রকে প্রত্যেক পায়রার গায়ে আঁটিয়া দিতে বলিলেন ও বুঝাইলেন, যখন যেটার নাম ধরিয়া ডাকিব, তুমি তৎক্ষণাৎ সেই পায়রাটি আমার কাছে হাজির করিবে। তাহা হইলে পায়রাদের শেখাইবার পক্ষে আর কোন গোলযোগ থাকিবে না। শিষ্য মহানন্দে তাহাই করিতে লাগিল। পক্ষীর জাত বড় চঞ্চল, শিষ্য যাই একটা পায়রার গায়ে একটা অক্ষর আঁটিয়া দিল, আর অমনি সে ফুৎ করিয়া উড়িয়া পলাইল, সে আঁটা অক্ষর কোথায় খসিয়া পড়িয়া গেল। এইরূপ এক একটি অক্ষর দুই দশবার আঁটিতে আঁটিতেই শিষ্যের অক্ষর পরিচয় হইয়া গেল। তারপর "ক" পায়রায় "আ" পায়রায় মিলিয়া যে পায়রা উৎপন্ন হইল, তাহার নাম রাখা হইল "কা"। এইরূপ "কা" "কী" "খী" আদি বর্ণমালাও শিষ্যের অভ্যস্ত হইয়া গেল। তারপর শিক্ষক পায়রা ও অন্যান্য পক্ষীর গল্পময় একখানা পুস্তক শিষ্যকে পড়াইতে সুরু করিলেন। সেই গল্প পড়িতে শিষ্যের মন এত নিবিষ্ট হইল, যে তাহার পায়রা খেলা আর ভাল লাগিত না। এইরূপ গুরু খেলা ধূলার ভিতর দিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিলেন।

ইহারই নাম অনুরাগানুকূল শিক্ষা। এই শ্রেণীর শিক্ষা জগতে না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রের মত মন্দ অধিকারীদের আর বিদ্যালাভের উপায়ই থাকে না। যে ছাত্র আপনার ক্রীড়াময়ী বাসনাকে শিক্ষকের তাড়নাময় খর্পরে বলিদান দিয়া লেখা পড়ায় মন বসাইতে পারে, সে ত উত্তম অধিকারী। তাহার জন্য অনুরাগানুকূল শিক্ষায় প্রয়োজন নাই, উত্তম শিক্ষকেরও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহারা মন্দ অধিকারী, যাহারা জগতের আদুরে

গোপাল, তাহাদের জন্ত অনুরাগানুকূল উত্তম শিক্ষকের প্রয়োজন। অধম ছাত্রের সহিত উত্তম শিক্ষক এবং উত্তম শিক্ষকের সহিত অধম ছাত্র, এ উভয়ের মিলনকে রাজযোটক বলা না যাইতে পারে, কিন্তু কুৎসিৎ মিলনও বলা যাইতে পারে না। উত্তম অধিকারী হয়ত নিজ সামর্থ্যের বলে অধম শিক্ষকের কাছ হইতে ফললাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শিক্ষকের কোন বাহাদুরী নাই। যে শিক্ষক নিজ সামর্থ্যবলে অধমকে উত্তম করিতে পারেন, তিনিই বাহাদুর। আস্তাকুঁড় হইতে যিনি হীরা বাহির করিতে পারেন, তিনিই প্রশংসার পাত্র, হীরার খনি হইতে হীরা বাহির করা বেশী কথা নয়। সরোবরে কমলফুল ফুটান সহজ কথা, কিন্তু যিনি মরুভূমে ফুটন্ত ফুল ফুটাইতে পারেন, তিনিই জগতে পদাঙ্ক রাখিয়া যান। তাই বলিতেছি যে শিক্ষা মানবীয় প্রকৃতি ও অনুরাগের ভিতর দিয়া ক্রিয়া করিতে পারে, সেই শিক্ষাই বেশী কার্য্যকরী, তাহাতে ফল শীঘ্র পাওয়া যায়। বেশী সময় নষ্ট হয় না। বিদ্যা শিক্ষার রাজ্যে যেমন বিধি, ধর্ম্মরাজ্যেও তাহাই। অন্ততঃ মন্দ অধিকারীদের জন্ত অনুরাগানুকূল শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা কলিযুগের মন্দ অধিকারী—সংসারের আদুরে গোপাল। আমরা কামনায়—অনুরাগের অনুকূল ধর্ম্ম-শিক্ষা চাই। যদি কেহ উত্তম অধিকারী থাকেন ত তাঁহার কথা হইতেছে না। আমাদের নিজের শ্রেণীর কথাই বলিতেছি। আমরা বৈরাগ্যের বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত। ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্ত কামনা ছাড়িয়া আমরা বৈরাগ্যে যাইতে পারিব না। লেখাপড়া শিক্ষার জন্ত আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের স্থায় খেলাধুলা ছাড়িয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে

পারিব না। তবে যে লেখাপড়া শিক্ষা খেলাধূলার ভিতর দিয়া হইতে পারে, যে ধর্ম্মশিক্ষা বিশাল তটিনীর মত কামনার ক্রোড় দিয়া বহিতে পারে, আমরা সেই শিক্ষা চাই। আমরা কামনার মৃদু মধুর মলয় পবনে প্রাণ মন ভাসাইতে চাই, বৈরাগ্যের তপ্ত বায়ুতে আত্মার কোমল বর্ম্ম পোড়াইতে চাহি না। আমরা কামনা-কল্পলতিকা মা অন্নপূর্ণার চারু-চরণের শীতল সলিল ধারায় অবগাহন করিতে চাই। জ্ঞান বৈরাগ্যের জলন্ত শিখাময় মহা-শিবের সংহারিণী মূর্ত্তির করাল-কবলে ভস্মীভূত হইতে চাহি না। আমরা কামনার ললিত পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে ঢালিতে চাই, বৈরাগ্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া বিকট তাণ্ডবে অগ্নিলীলা করিতে পারিব না। আমরা রাগমার্গের ভিখারী, ত্যাগমার্গকে দূর হইতে নমস্কার করি।

আমরা কামনার ধ্বংস চাহি না, কিন্তু কামনার পূরণ চাই, আমরা কামনার নিবৃত্তি চাই বটে, কিন্তু তোমরা যে ধরণে চাহ, আমরা সে ধরণে চাহি না। তোমরা গলা টিপিয়া কামনাকে চাপিয়া রাখিতে চাহ, আমরা কামনাকে উস্কাইয়া তাহার চরিতার্থতা সংসাধিত করিয়া তাহাকে আপনা আপনি ফুরাইতে বলি। কামনাকে চাপিলে অনিষ্ট আছে। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেখ। তোমার গায়ে একটা ফোড়া হইয়াছে, ফোড়ার পুঁয রক্ত স্বভাবতঃ ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। কিন্তু যিনি আনাড়ি চিকিৎসক, তিনি হয়ত কোন ঔষধ বিশেষ দ্বারা সে ফোড়াটিকে বসাইয়া তাহাকে আরাম করিতে চান। কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান্ কবিরাজ, তিনি কোন প্রলেপ দ্বারা ফোড়াটিকে পাকাইয়া তাহার পুঁযরক্ত আপনা আপনি ফুটিয়া বাহির হইবার

সুবিধা করিয়া দেন। ফোড়াটিকে বসাইয়া দিলে আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য বিনা কষ্টে তাহার উপশম হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে সে বদরক্ত জমিয়া সে স্থানের রক্ত বিকৃত করিয়া অন্যদিক্ দিয়া আবার দগ্‌দগে ঘা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু তাহার পুঁয রক্ত বাহির করিয়া দিলে প্রথমতঃ একটু কষ্ট হয় হউক, তাহা যে চিরকালের জন্য আরাম হইবে, তাহা বুঝা উচিত। সেইরূপ কামনাকে চাপিয়া রাখিয়া বসাইয়া ফেলা উচিত নহে। তাহাকে ফুটাইয়া তাহার পুঁয রক্ত বাহির করিয়া দেওয়াই উচিত। অপক্ক বৈরাগ্যের কাটগড়ায় কামনাকে চাপিয়া রাখিলে তাহার অতৃপ্তিময় অভাবময় কষ্ট হইতে আপাততঃ নিস্তার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে অপূরন্ত কামনা সে অতৃপ্ত বাসনা আবার অন্যদিক্ দিয়া শতধারে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। তাই পরম যোগীরও যোগভ্রংশের কথা, পরম বিরাগী পুরুষেরও অপ্সরার রূপে বিমুগ্ধ হওয়ার কথা শাস্ত্রে কত শুনা যায়। সুতরাং বাসনাকে না চাপিয়া তাহাকে প্রস্ফুটিত করাই বিধেয়। জানি, বাসনার পুঁয রক্তময় মুখ যতই ফুটাইবে, ততই অতৃপ্তিকর জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, জানি ঘৃতাহুতিতে জলন্ত অনলের ন্যায় বাসনার সহস্র জিহ্বা ততই ধক্ ধক্ জলিয়া উঠিবে, কিন্তু ইহাও জানি, কোনরূপে এই কষ্টটুকু কাটাইয়া এই সাংসারিক জগতের গণ্ডী ছাড়াইয়া ঐ অনন্ত আকাশের বিশাল বক্ষে বাসনাকে ছড়াইয়া ফেলিলে আরত অতৃপ্তি থাকিবে না। তখন যে বাসনা আত্মহারা দিশাহারা হইয়া কুল কিনারা হারাইয়া অগাধ সাগরে ও অথাই সলিলে কোথায় তলাইয়া যাইবে। তখন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তোমাদের অতৃপ্ত বাসনা-

বৈরাগ্যের পদতলে দলিত—মর্দ্দিত—পিষ্টপেষিত হইয়া মরমের অভিশাপ-বাণী কতবাব ঘোষণা করে, আমাদের কোমল কামনা বিভুর চারুচরণ-চুম্বনে চরিতার্থ হইয়া ঐ রাস-রসিক-রসেশ্বরের রসময় তরঙ্গে গা ভাসাইয়া কোথায় চলিয়া যায়। তোমাদের কামনা বিশুষ্ক কঙ্কালময়ী মূর্ত্তি লইয়া প্রেতভূমে শববাশির পদ-তলে বিলুণ্ঠিত হয়, আমাদের বাসনা ঐ রাজরাজেশ্বরের দববারে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পদ-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া তাঁহার গুণগাথা গান করে। তোমাদের জ্ঞান বৈরাগ্য ঘাতকের ন্যায় করালবেশে সাজিয়া কামনার কোমল-কণ্ঠ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়, আমাদের প্রেম ভক্তি, কামনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে প্রেমময় প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথের পার্শ্বচারিণী করিয়া দেয়। তোমাদের জ্ঞান বৈরাগ্য সংসারের কালি ঝুলি-মাখা বলিযা কামনাকে ঐ জ্ঞানময় নির্ম্মলধামের দ্বারদেশ হই-তেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, আমাদের প্রেম, ভক্তি, কামনা বালিকার সে কালিঝুলি মুছাইয়া তাহার রংটী আরও টুকটুকে ফুটফুটে করিয়া মা অন্নপূর্ণাব ক্রোড়দেশে তাহাকে বসাইয়া দেয়। স্নেহের সোহাগময়ী দুহিতা যেমন কোথাও ভয় পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের কোলে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের কামনা সংসারের দুরভিসন্ধিময় মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া যখন জগজ্জননীর ক্রোড়ে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাঁহার স্নেহমাখা অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া সুস্থির হইবে, সেই দিনই আমা-দের কামনা সার্থক হইবে। কিন্তু এখন আমরা কামনাকে ছাড়িতে পারিব না। তাহার কচি মুখের মধুব হাসি আমরা বড় ভালবাসি। সংসারে রাখিয়া দিন কতক তাহাকে এখন লালন

পালন করিব, তার পরে মায়ের অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া দিব, ঘরের মেয়ে ঘরে চলিয়া যাইবে। শক্তির কণিকা শক্তির সাগরে ডুবিবে, অনুকৃতি প্রকৃতিতে মিশিবে, আসক্তি প্রেমময়ীর লীলাপটান্তরালে অন্তর্হিত হইবে।

কামনা মাত্রেই সংসারাসক্তির পথে লইয়া যায়, ইহা ঠিক নহে। সাংসারিক কামনা চিত্তবিক্ষেপকর হইলেও ভগবৎ-কামনা সে পথের পথিক নহে। স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, পিপাসা, আসক্তি, অনুরক্তি এই সমস্ত বৃত্তি লইয়া, কামনার রাজত্ব। আর শম, দম, তিতিক্ষা যম, নিয়মাদি লইয়া জ্ঞান- বৈরাগ্যের রাজত্ব। সংসার কামনার প্রথম ভূমি, কিন্তু ভগবৎ-প্রেম-সমাধি তাহার কেন্দ্রভূমি—চরম-সীমা। সেইরূপ "সংহার" (সংসারত্যাগ) বৈরাগ্যের প্রথম ক্ষেত্র বটে, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠাই তাহার শেষ লক্ষ্য। লক্ষ্য উভয়েরই এক, কিন্তু পন্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থাৎ বিরোধী। প্রবৃত্তির পথে পথিকের চলিতে কোন কষ্ট নাই। কেননা সে পথ সুকোমল শয্যার শান্তিময় আস্তরণে আচ্ছাদিত। নিবৃত্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ। বিভীষণ হিংস্র জন্তু সে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং ইহা কষ্টময়। এমন কষ্টের পথে কেন যাইব বল দেখি। সান্নিপাতিক বিকারে রোগী যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছে, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য এক বিন্দু বারি তাহার মুখে দিবার যো নাই। তাহা হইলে তাহার বিকার আরও বাড়িয়া উঠিবে। দুই জন ডাক্তার তাহাকে দেখিতেছে, দুই জনেরই উদ্দেশ্য রোগীর রোগ আরাম করা, কিন্তু উভয়ের চিকিৎসা প্রণালী ভিন্ন। এক জন রোগী তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইলেও

তাহাকে এক বিন্দু জল না দিয়া তাহার তৃষ্ণা প্রবৃত্তি চাপিয়া তাহাকে আরাম করিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে যে রোগী আপাততঃ তৃষ্ণায় মারা যায়, তাহার কি? ব্যারাম আরাম হওয়া ত পরের কথা। তাই আর এক জন ডাক্তার অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি রোগীকে জলপান করিতে দিলেন বটে, কিন্তু সেই জলের সঙ্গে বমনকারক চূর্ণ মিশাইয়া দিলেন। রোগী জল পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। খানিকক্ষণ বাদে সে জল হুড় হুড় করিয়া বমন হইয়া গেল, তাহার তৃষ্ণা মিটিল, তার পর ডাক্তারের ঔষধ গুণে সে আরাম হইল। সেইরূপ জীব ভবরোগে আক্রান্ত। জাগতিক জ্বালামালায় কাতর, নানাবিধ সাংসারিক আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা-পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ। এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়া তাহার প্রাণের বাসনা। কিন্তু যে চিকিৎসক তাহাকে পিপাসায় শুকাইয়া আরাম করিবার কল্পনা করেন, কলিযুগের জীব তাঁহার কাছে যাইতে ভীত হয়। জীব তাঁহারই শরণ চায়, তাঁহারই কৃপা ভিখারি হইতে প্রস্তুত আছে, যিনি তাহার পিপাসা কাতর কণ্ঠে একবিন্দু জল দিবেন এবং সেই জলের সঙ্গে ভগবৎ-প্রেম-চূর্ণ মিশাইয়া দিবেন, যে চূর্ণ উদরস্থ হইলে সমগ্র সংসার উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে, চির পিপাসিত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, তাপিত জীবন শান্তির ফোয়ারায় অবগাহন করে, সেই চূর্ণ মিশাইয়া কাম্য বস্তুর উপভোগ করাইয়া যে গুরু ভবরোগ-শান্তির ব্যবস্থা করেন, জীব তাঁহারই চরণ তলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। যে ঔষধ খাইতে মিষ্ট, অথচ ব্যাধির আশু শান্তি হয়, তেমন ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া কটুতিক্ত ঔষধে কাহার প্রবৃত্তি হয় বল দেখি? যাহার উপায় মিষ্ট, উদ্দেশ্যও মিষ্ট, এমন মিষ্টতা-

ময় পদার্থকে কলিযুগের পিপীলিকা আমরা কখনও কি ছাড়িতে পারি ?

আমার নিজস্ব।

নয়ন মন রঞ্জন কত পদার্থ জগতে সজ্জিত রহিয়াছে, সম্মুখে কত সুশোভন বিচিত্র সামগ্রী পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। এ সমস্ত পাইয়াও মনত তৃপ্ত হয় না। ইহা অপেক্ষা আরও কি যেন কামনার সামগ্রী সে খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা অপেক্ষা মন যেন আরও কি চায় ? আবার যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাই না, মন বুদ্ধির অতীত স্থানে যাহার তত্ত্ববার্ত্তা লুক্কায়িত, তেমন জিনিষকে পাইয়াও ত মন তৃপ্ত হইতে চাহে না। যাহাকে আমি আমার বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, যাহাকে পাইলে মনঃপ্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বত এব তৃপ্তোস্মি বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তেমন জিনিষকে পাইবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা লালায়িত। যাহাকে আমার জিনিষ বলিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে পারি, আমার সাজে সজ্জিত হইয়া আমার ভাবে "আমার" হইয়া যাহা আমার কাছে আসে, তাহাকে লইয়া আমি জুড়াইতে চাই। আমার হৃদয় যাঁহার মোহন মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে, আমার ক্ষুদ্র প্রকৃতি যাঁহাকে "নিজস্ব" বলিয়া অধিকার করিতে পারে, আমি তাঁহারই চারুচরণ-রশ্মির ভিখারী।

জানি আমি পাপী, তাপী নরাধম। এই পাপীর দেবতা হইয়া এই অগতির গতি হইয়া, এই অনাথের নাথ হইয়া

যিনি দেখা দেন, আমি তাঁহাকে চাই। সাধকের হৃদয়-মন্দির যিনি আলো করেন, আমি তাঁহাকে লইয়া কি করিব? সাধকের যাহা সাধের ধন, আমার মত অসাধকের হৃদয় তাঁহাকে কি ধারণা করিতে পারে? ধ্রুব প্রহ্লাদের হৃদয়ের যিনি সম্পত্তি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় তাঁহাকে কি স্পর্শ করিতে পারে? উপাদেয় রাজ-অন্ন আমার মত ব্যাধিগ্রস্তের উদরে পরিপাক পাইবে কেন? সুতরাং ধ্রুব প্রহ্লাদের ঈশ্বরকে আমি চাহি না। কেন না সে হৃদয় আমার নাই, জ্ঞানীর ঈশ্বর যোগীর ঈশ্বর সাধকের ঈশ্বরকে আমি চাহি না, আমি আমার ঈশ্বরকে চাই। আমার প্রিয়তম সামগ্রীকে "আমার" ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া লইতে চাই।

আপনার আপনার ভাবে জগতের সকলেই আপনার জিনিষকে ভালবাসে। পরের চক্ষু লইয়া কেহ আপনার জিনিষকে ভালবাসে না, পরের হৃদয় লইয়া কেহ আপনার জিনিষকে সুন্দর দেখে না। আপনার চক্ষে যাহা ভালবাসার সামগ্রী, পরের চক্ষে তাহা ঘৃণিত হউক, তুচ্ছ হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কুৎসিত কদাকার পুরুষ পরের চক্ষে ঘৃণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার সতী স্ত্রীর পক্ষে সে ভালবাসার জিনিষ—স্নেহ আদর মায়া মমতার অনন্ত প্রস্রবণ। সতী যে হৃদয়-দর্পণ দিয়া তাহার পতিকে দেখে, সেই হৃদয়খানি লইয়া যদি তুমি দেখিতে, তাহা হইলে সেই বিকট কদাকার পুরুষে অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিতে পাইতে। সুতরাং নিজস্ব লইয়াই ভালবাসা। মদ্ভাব-ভাবিত হইয়া যাহা আমার অধিকারে আসে, আমার আসক্তি কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া সেই দিকে শতধারে ছুটিয়া থাকে।

এই মস্তাবের সহিত যাহার সংস্রব নাই, জগতের লোক তাহাকে এক মুখে সুন্দর—উত্তম—উপাদেয় বলিলেও আমার ভালবাসার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পাবে না। এই "আমার ভাবের" সহিত ভগবানের যত খানি সম্বন্ধ, তিনি তত খানি আমাব ঘনিষ্ট। "আমার" বলিয়া ভালবাসার জিনিষকে যদি পূরো অধিকার করিতে না পাইলাম, তবে তৃপ্তি পাইব কেন? তাই "তোমার" ঈশ্বরের কাছে যাইতে আমি বড ভয় পাই। আমার আমিত্ব যাঁহাব চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারে, সেই প্রাণ-সখার কথা বলিয়া দাও। আমার মরমের কাহিনী যাঁহার দরবারে পৌছিতে পাবে, সে নিগূঢ় তত্ত্ববার্তা বুঝাইয়া দাও। দুঃখে শোকে যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া বাষ্প-গদ্গদ লোচনে যাঁহাব দিকে তাকাইলে যিনি দুর্গতিহরা মা হইয়া দৌড়িয়া আসেন, তাঁহার চরণ-রেণুর সহিত আমার আমিত্ব যাহাতে মিলিত হইতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া দাও। জানি তিনি ত্রিজগতেব মা, কিন্তু তাহাতে আমার কি? তাঁহার এ ব্যাপক মূর্ত্তিকে নিজস্ব বলিয়া আমার এ ক্ষুদ্র প্রকৃতি ধারণা করিতে পারিবে কেন? ত্রিজগতের মা যদি আমার মা হইয়া দেখা দেন, তবেই ত আমার ভরসা। জগন্নাথ যদি আমার হৃদয়-নাথ হইয়া অবতীর্ণ হন, তবেই ত দুঃখী জীব তৃপ্ত হইতে পারে। আমার ক্ষুধায় যিনি মা অন্নপূর্ণা, রোগে যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, কামনায় যিনি কল্পতরু, তাহাকে লইয়াই আমার কথা। তোমার "সত্যং শিবং সুন্দরং" লইয়া আমার আশা মিটিবে না।

পদার্থ যতক্ষণ মৌলিক, ততক্ষণ তাহা ব্যাপক। পদার্থ খণ্ডিত

হইলে আর তাহার ব্যাপকতা থাকে না। প্রকাণ্ড একখানি বস্ত্র যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌলিকাবস্থায় অখণ্ডিতাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহার ব্যাপকতা থাকে অর্থাৎ নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে সেই বস্ত্র হইতে কেহ বা জামা, কেহ বা পাজামা, কেহ বা উষ্ণীষ প্রস্তুত করিতে পাবে, কিন্তু যখনই তাহা খণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ জামা আদি প্রস্তুত হইবে, তখন সেই খণ্ডিত মূর্ত্তি হইতে ব্যাপকতা চলিয়া যাইবে। তোমাব গায়ের জামা আমার গায়ে হইবে না। আমার পাজামা তোমাব উপযুক্ত হইবে না। কিন্তু তাহাদের মৌলিকাবস্থায়—বস্ত্রাবস্থায় স্বেচ্ছানুসারে নিজ নিজ মনোমত জামা আদি প্রস্তুত কবিতে পারিতাম। জামা আদিব মৌলিকাবস্থা-বস্ত্র যেমন অনেকের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, জামা আদি তেমন পারে না। সুতরাং তোমার গায়ের জামা যেমন আমার গায়ে হয় না, তেমনই মৌলিকাবস্থাপন্ন পরব্রহ্ম হইতে খণ্ডিত সগুণ ব্রহ্ম—তোমার মনোমত ঈশ্বর "আমাব" পক্ষে উপযুক্ত হইবে কেন? মৌলিকাবস্থাচ্যুত জামা আদি যেমন প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ পরব্রহ্মচ্যুত সগুণ ব্রহ্ম—উপাস্য দেবতা প্রত্যেক হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন। পরব্রহ্ম হইতে নিজ নিজ মনোগত উপাস্য দেবতাকে গুরুর সাহায্যে আমরা বাছিয়া লইতে পারি, কেন না তিনি ব্যাপক। সুতরাং যাহা তোমার মনোগত প্রিয়তম আত্মীয়, তাহাকে "আমার" ভাবিয়া বুকে রাখিয়া জুড়াইতে পারিব কেন? তোমার "নিজস্বকে" "আমার স্ব" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব কেন? যাহা তোমার শান্তিদায়ক, তাহাতে আমিও যে শান্তি পাইব, এমন কোন কথা নাই। যে ঔষধে তোমার ব্যাধির শান্তি হয়, আমার তাহাতে কিছুই না

হইতে পারে। তুমি হয় ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, কর্ম্ম, তীর্থের কত কথাই বলিবে, কিন্তু আমার হৃদয় তাহাতে যদি না মানে, তবে, আমি তাহা লইয়া কি করিব। আমার জিনিষ আমাকে দিলে আমি তৃপ্ত হইতে পারি, ইহাই আমার অন্তরের ভাষা।

সংসার যদি আমার ভালবাসার জিনিষ দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে লইয়াই তৃপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল সংসারে ভালবাসার জিনিষ পাওয়া অসম্ভব। কেননা, আমার ভালবাসার বিচিত্র গতি। আমার মনঃপ্রাণ তিল মাত্র স্থির নহে। বায়ুমণ্ডল যেমন অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে, আমার মনঃপ্রাণ সেইরূপ অবিরত মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইমাত্র যাহার পিপাসু আমি, এইমাত্র যাহা পাইবার জন্ম ব্যাকুল আমি, হয় ত পরমুহূর্ত্তে আমি আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সে পিপাসা সে ব্যাকুলতা কোথায় চলিয়া যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের সে ভাব কোথায় ডুবিয়া যায়। এইমাত্র যাহার আকাঙ্ক্ষী হইয়া বাজারে ক্রয় করিবার জন্ম তোমাকে পাঠাইলাম, তুমি তাহা আনিতে না আনিতে আমার মন হয় ত বদলাইয়া গেল, তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেও আমার ইচ্ছা হইল না। অদ্য যাহাকে প্রিয়তম বলিয়া বুকে রাখিয়া সোহাগ করিতেছি, কল্য হয় ত তাহাকে কালসর্প ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি। অদ্য যাহার মিলন-প্রত্যাশার আনন্দের মধুর স্বপ্নে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, কল্য তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়া সেই সম্ভাবিত প্রিয়তম বস্তুকে জীর্ণ-কঙ্কাল বোধে পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং সংসার আমার মনোমত জিনিষ দিতে পারে কৈ? সংসার যেমন পরিবর্ত্তনশীল

চঞ্চল, আমার মনও সেইরূপ চঞ্চল। চঞ্চল পদার্থ চঞ্চল মনকে তৃপ্তি দিতে পারিবে কেন? যখন উভয়েই চঞ্চল, তখন উভয়ের সমসূত্রপাতে মিলন অসম্ভব। পদার্থদ্বয় একত্র স্থির হইলেই মিলন সম্ভব। অস্থিরের কি কখনও মিলন হইতে পারে। অস্থির মন ও সংসারের যদি সমসূত্রপাতে মিলনই হইতে পারিল না, তবে সংসারকে "আমার জিনিষ" ভাবিয়া মনোগত করিয়া লইতে পারিব কেন? যেখানে অস্থিরতা নাই, চঞ্চলতার ছায়া মাত্র যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, পরিবর্ত্তনের কলঙ্ক যেখানে বিন্দুমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, সেই অচঞ্চল পরম পুরুষের আশ্রয়াঞ্চলে মন যেদিন লুক্কায়িত হইবে, সেইদিন তাহার সমস্ত অস্থিরতা বিনষ্ট হইবে। চপলতা চঞ্চলতা কোথায় চলিয়া যাইবে। সেই নিশ্চলতার সাগরে নিমগ্ন হইয়া মন সমাহিত হইয়া যাইবে। মন তখনই মনের মানুষের সহিত এমনই সম্মিলিত হইয়া যাইবে, যে আর তাহার কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। চির অবিচ্ছেদই ভালবাসার লক্ষ্য। সংসার ভালবাসার এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে না। তাই সংসার আমার নিজস্ব হইবার উপযুক্ত নহে।

ভালবাসা নহিলে জীব সুখী হইতে পারে না। পরকে ভালবাসিয়াই জীব সুখী হইতে চায়। সুতরাং নিজের সুখের সামগ্রীকে জীব পরের উপরই ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। পরের মুখাপেক্ষা করিয়াই জীব জগতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। স্ত্রী স্বামীর উপর নিজের সুখের ভার চাপাইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, স্বামী স্ত্রীর উপর সুখের বোঝা অর্পণ করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। মুগ্ধ জীব পরের হাতে নিজের সুখ-ভাণ্ডারের চাবি দিয়া নিশ্চিন্ত হয় কেন? যাহা জীবনের অবলম্বন, সেই সুখ-সুধাকে পর হস্তগত করিতে

আমরা লালায়িত কেন? নিজের মূল্যবান্ সম্পত্তিকে নিজের অধিকারে না রাখিয়া আমরা পরের উপর নির্ভর করিতে চাই, এ বড় আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। যাহা আমার শান্তির—তৃপ্তির—আদরের আধার, তাহা যতই আমার অনায়াস লভ্য হয়, ততই আমার পক্ষে মঙ্গল। শয্যাশায়ী তৃষ্ণার্ত্ত পীড়িতের শিয়রে যদি জলপূর্ণ কলস বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে জলের জন্য তাহাকে চিন্তা করিতে হয় না। সুখের কলস যদি আমরা শিয়রে রাখিতে জানিতাম, তাহা হইলে দুঃখের কশাঘাতে আমরা কখনই পীড়িত হইতাম না। বাস্তবিক সুখ দুঃখ যাহা কিছু সমস্তই আমাতে। অবিদ্যাবশে ভ্রান্তির ঘোরে পরের উপর সুখ দুঃখ আমরা চাপাইয়া ফেলি। তাই সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়।

আমার সুখের জিনিষ—আমার ভালবাসার জিনিষ—আমার আপনার হইতেও আপনার জিনিষ আমার সহিত নিত্য নিয়ত বিদ্যমান। আবার আমার দুঃখদায়ক শত্রু হইতেও পরম শত্রু আমারই ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা, আত্মা ও অনাত্মা এই দুই লইয়াই ত আমি। অবিদ্যা আমার শত্রু, বিদ্যা আমার মিত্র। দুঃখমূল অবিদ্যাকে আমার ভিতর হইতে উৎপাটিত করিতে পারিলে আমি দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সুখস্বরূপ আত্ম-স্বরূপিণী বিদ্যাকে পাইলে আমি নিত্য সুখের অধিকারী হই। সুতরাং সুখ দুঃখ সমস্তই আমাতে। অতএব যাহা আমার আয়ত্তের মধ্যে, তাহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হই কেন? আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ, আমার নিজের ঘরেই রহিয়াছে, সেই গৃহের দ্বার খুলিতে জানি না বলিয়াই বাহিরে

দুঃখের প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ ধাবিত হই। আমার অন্তরে অপূর্ব্ব-রত্নের দিব্য শোভায় ভরপূর হইলেও বাহিরে রত্নান্বেষণে লালায়িত হই, অন্তর্জগতে শত চন্দ্র নিংড়ান সুধার ধারা অবিরত প্রবাহিত হইলেও তাহার আস্বাদে বঞ্চিত হইয়া বাহ্ সুখের মরুমরীচিকায় দৌড়িয়া যাই। যিনি আমার নিজ হইতেও নিজ, আপনার হইতেও আপনার, অথচ পরম সুখময়, তাঁহাকে ভালবাসিতে ক্ষণেকের জন্তও ইচ্ছা হয় না, কিন্তু যাহা আমার পর, যাহার সহিত আমার দূর হইতেও দূরতর সম্পর্ক, আমার ভালবাসা তাহাকে লইয়াই চরিতার্থ হইতে চায়! যাহা আমার প্রকৃত নিজস্ব, তাহাকে ছাড়িয়া পরের চরণে আমরা ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিতে চাই, নিজকে পর ভাবিয়া পরকে নিজস্ব ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে চাই। অহো! বিড়ম্বনা!.

জীবন ও মরণ।

মনুষ্য বাঁচিতে চায় কেন? কি সুখে কি আশা ভরসায় মোহিত হইয়া মানুষ এ কর্ম্মক্ষেত্রে দীর্ঘজীবী হইতে চায়, এ কথার সদুত্তর কেহ স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারে না। দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির বজ্রাঘাতে মনঃ প্রাণ অবিরত শীর্ণ বিশীর্ণ হইতেছে, অবসাদ নৈরাশ্যের নিবিড় কালিমাস্তূপে অন্তরাত্মা ডুবিয়া রহিয়াছে, দুশ্চিন্তার তীব্র বৃশ্চিক দংশনে অন্তস্তল কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, তথাপি মানুষ বাঁচিবার জন্ত লালায়িত, সংসার-সংগ্রামের

ভীষণ ঝটিকার ঘূর্ণাবর্ত্তে নিপতিত তৃণের ন্যায় এ জীবন-তরণি প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, কর্ম্মরাশির ঘর্ঘর চক্রে অবিশ্রান্ত মনুষ্য জীবন পিষ্ট পেষিত হইতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্ষণেকের জন্য স্থির হইবার যো নাই, কেবল চাঞ্চল্যময় পরিবর্ত্তন-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হইতেছে, তথাপি মনুষ্যের প্রাণে বাঁচিবার সাধ! আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। প্রতি পলে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনের তীব্র প্রবাহ জীব-জীবনকে কোথায় উধাও করিয়া লইয়া যাইতেছে, আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, হুড হুড দুড় দুড করিয়া দুকূল ভাঙ্গিয়া কাল প্রবাহ মনুষ্য জীবনকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কত মরু প্রান্তরের উপর দিয়া কত শবকঙ্কালপূরিত শ্মশান ভূমির উপর দিয়া কত কৃমিকীটের কিলিবিলিময় প্রেত পল্লীর উপর দিয়া, কত জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপের ভিতর দিয়া দুর্নিবার্য্য অদৃষ্ট চক্র কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক মনুষ্য-জীবনকে হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এত যাতনা এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও মনুষ্য সংসারে স্থিতিশীল হইতে চায়, চিরদিন দারুণ দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়াও মনুষ্য জীবনের ভিখারি! তপ্ততৈলপূর্ণকটাহে চিরদিন কাটা কৈ মাছের মত ছটপট্ করিয়াও মানুষ বাঁচিবার বাসনা কেন করে, এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারে না।

মনুষ্যের জীবন একটী কঠোর তপস্যা, এমন তপস্যা বুঝি আর হয় না। আর্য্যঋষি যে তপস্যা করিতেন, আমাদের মত সংসারী জীবের জীবন তপস্যা তাহাকেও হারাইয়া দিয়াছে। কৃচ্ছ্রসাধনই ত তপস্যা, গভীর কষ্টের হ্রদে নিমগ্ন হইয়া কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টাই ত তপস্যা। ইহাই যদি তপস্যার

লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমাদের মত সংসারী জীব অপেক্ষা তপস্বী আর কে আছে? ধন জন সম্পত্তিরূপ সুখময়ী বিকার আশায় আমরা কি না করি? আমরা সাগর ছেঁচিয়া মাণিক উঠাইতে চাই। শত বজ্রাঘাত সহ্য করিয়াও আমরা অর্থোপার্জ্জন করিতে লালায়িত হই। সংসারের প্রখর সূর্য্য কিরণের মধ্য-স্থলে দাঁড়াইয়া আমরা সর্ব্বদাই ত পঞ্চতপা। আমরা এই তপ-স্যার বিনিময়ে চাই সংসারের ক্ষণিক সুখ, আর্য্য-ঋষি তপস্যার বিনিময়ে চাহিতেন নিত্য স্থির সুখ, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সুখের তুলনায়, তাঁহার তপস্যার কষ্ট লঘুতর, অতএব তাঁহার তপস্যা ততটা গুরুতর কঠোর নহে। কিন্তু আমরা যে সুখের ভিখারী, তাহার তুলনায় আমাদের তপস্যার কষ্ট অনেক গুরু-তর। সুতরাং এমন কঠোর তপস্যা আর হইতে পারে না, তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, আর্য্য-ঋষি অপেক্ষাও আমরা কঠোর তাপস। একজন সম্রাট একজন ফকিরকে বলিয়াছিলেন, আপনি বেশ ত্যাগী পুরুষ। আপনার মত ত্যাগী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে ফকির হাসিয়া বলিলেন, আমি ত্যাগী পুরুষ নহি, আপনিই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ। আপনার ত্যাগ-শক্তির কাছে আমরাও পরাজিত। সম্রাট বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ইহার তাৎ-পর্য্য কি? আমার মত পরম ভোগী পুরুষকে আপনি ত্যাগী বলিলেন কিরূপে? ফকির বলিলেন যে, আমরা অমূল্য সম্পত্তি ব্রহ্মপদ পাইবার জন্য সামান্য তুচ্ছ সংসার সুখকে ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র ত্যাগ, কিন্তু আপনি অমূল্য ব্রহ্মপদকে তুচ্ছ বোধে ত্যাগ করিয়া সামান্য সংসার-সুখে রত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার ত্যাগ বড়। আপনি ক্ষুদ্র সম্পত্তির জন্য মহান্ সম্পত্তিকে

ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং আপনার ত্যাগ শক্তির কাছে আমা দের ত্যাগ-শক্তি পরাজিত। ফকিরের ভাবে বুঝিতে হয়, সংসারী জীবের জীবন-তপস্যাই প্রকৃত কঠোর। কেন না, ইহা বর্ত্তমান ও উত্তরকালে চারিদিকেই কষ্টময়। আর্য্য-ঋষির তীব্র তপস্যা ততটা কঠোর নহে, কেন না তাহার পরিণামে সুখ আছে।

ভোগ কালে ও পরিণামে যাহা কেবলই দুঃখময়, সেই জীবনের প্রেমে কি জানি কেন জগৎ মুগ্ধ? জীবন জীবন করিয়া জগৎ পাগল! পশু পক্ষী তরু লতা পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী গ্রহ নক্ষত্র চেতন অচেতন সকলেই জীবনের জন্য লালায়িত! সকলেই স্থিতিশীল হইতে চায়, ধ্বংস কেহ চাহে না। সকলেই অবিনশ্বর হইতে চায়, অমর হইতে চায়। বুঝি না, জীবনে কি অমৃত আছে, কি কুহক আছে, তাই তাহার টানে জগৎ মাতোয়ারা। কি ধনী কি দরিদ্র, কি সম্রাট কি ভিখারি, সকলেই সমানভাবে জীবনকে ভালবাসে। কুষ্ঠরোগে যাহার সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া গিয়াছে, তীব্র যন্ত্রণায় মর্ম্মগ্রন্থি যাহার খসিয়া যাইতেছে, আজীবন অন্তর্নিহিত অগ্নিরাশির জ্বালামালায় যে পুড়িয়া খাক হইতেছে, তাহার পক্ষেও জীবন যেমন স্পৃহনীয়, কলকণ্ঠী কামিনীর ভুজপাশে জড়িত বিলাসী যুবারও জীবন তেমনই স্পৃহনীয়। জীবনের মিষ্টতা জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, জীবনের মাধুরী জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভিখারির জীর্ণ কুটীর হইতে রাজরাজেশ্বরের বিলাসমন্দির পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্বত্র সমান আধিপত্য। ধনজন-পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরীতে জীবনের দীপ-শিখা যেমন প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, জীবনের উপকরণরাশি যেমন প্রতিভাত হইয়া থাকে, ঘোর গহন-

কাননের নিবিড় নীরবতার মধ্যেও সেইরূপ সমানভাবে জীবনী-শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। জীবনকে পাইবার জন্য জীবনের ক্ষেত্রকে পরিসর করিবার জন্য জীবনের অনুপান-রাশিকে বাড়াইবার জন্য জীবজগৎ অবিরত চেষ্টাপরায়ণ, মরণকে তাড়াইবার জন্য জগতে চিরদিন সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। মরণের ঘোর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তির দিকে জগৎ সভয়-চকিতনেত্রে তাকাইয়া থাকে। মরণের বিষাক্ত স্পর্শকে দুর্ভেদ্য প্রস্তরময় প্রাচীর দিয়া জগৎ আট্‌কাইয়া রাখিতে চায়। মরণকে দূরে রাখিয়া জীবনকে সাদরে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবার জন্য জগৎ ব্যস্ত!

কিন্তু বাস্তবিকই কি মৃত্যু এত ভয়ের জিনিষ। মৃত্যুরাজ্য বাস্তবিকই কি এতই ভীষণ, কে জানে। কে বলিতে পারে?" মৃত্যুধাম হইতে যদি কেহ ফিরিয়া আসিয়া বলিত, মৃত্যুর ভয়ানকত্বের সাক্ষ্য দিত, তাহা হইলে সে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর আর কোন কথা চলিত না। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর একটা বিকট-মূর্ত্তি জগতের সম্মুখে যদি ধরা হইয়া থাকে, তবে সে অনুমান সে যুক্তি কতটা টেক্‌সই, কতটা অখণ্ডনীয়, তাহা একবার দেখা চাই। প্রাকৃতিক তত্ত্ব বড়ই দুরবগাহ। পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির উপর প্রাকৃতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-ভিত্তি স্থাপন করা আর বালুকাস্তূপের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা একই কথা। আজ তোমার কল্পনা—অপরিপুষ্ট চিন্তা যে তত্ত্বকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিল, কল্য দেখিতেছি, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তোমার অপরিপুষ্ট চিন্তার উপর—অনুমিতির উপর বিশ্বাস কি? নিজের মনকে

এবং অপরকে কোনরূপে বুঝাইতে পারিলেই যে সেই বুঝার জিনিষটা পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইবে, এমন কথা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। মৃত্যু সম্বন্ধেও সেই কথা। আজ মৃত্যুতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ধারণা প্রবাহিত হইতেছে, কল্য যে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না কে বলিল? সুতরাং মৃত্যু সম্বন্ধে যে যুক্তি লইয়া তুমি একটা বিভীষণ চিত্র খাড়া করিয়াছ, তাহাই যে ঠিক, তাহাই যে অকাট্য সত্য, এ কথা তুমি শতবার বুক ফুলাইয়া বলিলেও আমি মানিতে পারিব কৈ? এখন মৃত্যু-তত্ত্ব একটু বিচার করা যাক্।

আর্য্যশাস্ত্র বলেন, আত্মার (লিঙ্গশরীরের) সহিত দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম জন্ম, আর দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইতে বিচ্যুতির নাম মৃত্যু। সুতরাং সোজা কথায় আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি ছাড়া মৃত্যু আর কিছুই নহে। আত্মার ভৌতিক দেহ অবস্থায় স্থিতির নাম জন্ম, আর তদ্বিচ্যুতির নাম মৃত্যু। মৃত্যুকালে আত্মা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যায় মাত্র, একটা পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ নূতন বস্ত্র গ্রহণ করেন, সেইরূপ পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা নূতন দেহ ধারণ করেন। সুতরাং বস্ত্রান্তর গ্রহণের ন্যায় আত্মার দেহান্তর গ্রহণের নাম মৃত্যু। অতএব পরিবর্ত্তন ছাড়া অবস্থান্তর প্রাপ্তি ছাড়া মৃত্যু আর কিছুই নহে। এই পরিবর্ত্তনকে মানুষ এত ভয় করে কেন? যে পরিবর্ত্তন যে পরিণাম-বাদ সৃষ্টি-তত্ত্বের মূলনীতি, প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতি অণু পরমাণুতে যে পরিণাম-রেখা বিজড়িত সেই স্বভাবসূত্রে চির অভ্যস্ত চির

পরিচিত নিয়মের উপর মানুষের এত ভয় কেন? বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যখন যৌবনাবস্থার উদ্ভব হয়, আবার যৌবনাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন বৃদ্ধাবস্থার উৎপত্তি হয়, তখন সে অবস্থা-পরিবর্ত্তনকেত মানুষ ভয় করে না। বালক যৌবনাবস্থায় মরিয়া যায়, যুবা বৃদ্ধাবস্থায় মরিয়া যায়, কৈ এ মৃত্যুকে কেহ ত ভয় করে না, সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় মরিয়া গিয়া আত্মা যদি কোন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হন ত তাহার জন্ম ভয় হইবে কেন? দেহ ছাড়া যাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহাদের মতে দেহের ধ্বংস হইলেই সব ফুরাইয়া গেল, মরণকে তাঁহারা ভয় করিতে পারেন, কিন্তু আত্মবাদী হিন্দু—আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসশীল হিন্দু মরণকে ভয় করিতে পারেন না। যাঁহার দৃষ্টিশক্তি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া থাকে, তাহার চক্ষে সূর্য্য যেমন কখনও অস্ত যান না, এক স্থানে অস্ত যাইলেও অন্য স্থানে সূর্য্য যেমন উদিত হইতেছেন, সেইরূপ আত্মচক্ষু হিন্দুর চক্ষে আত্মা এক দেহে এক স্থানে অস্তমিত হইলেও অন্যস্থানে অন্য দেহে অন্য যোনিতে উদিত হইতেছেন। সূর্য্যের উদয় অস্ত যেমন ব্যাপার, আত্মার দেহ ধারণ ও দেহ-পরিত্যাগরূপ জীবন মরণও তেমনই একটা ব্যাপার মাত্র। সুতরাং আস্তিকের পক্ষেত কোন ভয়ের কারণ নাই। মৃত্যুর পর পাপীর নরকযন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে, পুরাণ এইরূপ একটা ভয়ের কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিকই তাহাতেও ত কোন ভয়ের কারণ নাই। আমরা মনুষ্য হইয়া যখন জন্মিয়াছি, তখন পাপাংশ ও পুণ্যাংশ উভয়ই আমাদের আছে। যদি পাপাংশ কিছুমাত্র না থাকিত; তাহা হইলে দেবতা হইয়া জন্মিতাম, যদি পুণ্যাংশ

কিছুমাত্র না থাকিত, তাহা হইলে পশুপক্ষী তির্য্যগাদি নীচ যোনিতে জন্মিতাম। সুতরাং পাপ ও পুণ্যের অংশ লইয়া যখন জন্মিয়াছি, তখন পর জন্মে এই পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে। বর্ত্তমান জীবনে যেমন পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতেছি, আগামী জীবনেও ত সেইরূপ পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিব। ইহ জীবনে যেমন সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, পর জীবনেও তেমনই সুখ দুঃখ ভোগ করিব। ইহ জীবনে যেমন কামিনী কাঞ্চন লইয়া সুখ ভোগ করিতেছি, আগামী জীবনেও সেইরূপ রম্ভা তিলোত্তমা পারিজাত লইয়া আনন্দ ভোগ করিব। আবার ইহজীবনে রোগ শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণায় যেমন পুড়িয়া মরিতেছি, আগামী জীবনে সেইরূপ কুম্ভীপাক রৌরবের দুঃখ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিব। ইহ জীবনের দুঃখ যাতনা যেমন আমাদের সহ্য হইয়া যাইতেছে, তেমনি পর জীবনেরও দুঃখ কষ্ট সহ্য হইয়া যাইবে। ইহ জীবনের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য যেমন আমাদের অনুভবশক্তি তদুপযোগী রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, পরজীবনেও সেইরূপ হইবে। মনুষ্য হইয়া বিষ্ঠার রস অনুভব করিতে গেলে দারুণ কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু বিষ্ঠার কীট হইয়া বিষ্ঠার রস আস্বাদ করিলে তাহাতে দুঃখ হইবে কেন? সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করিতে হইবে কেন? বর্ত্তমান জীবনে এমন কি সুখের সাগরে ভাসিতেছি, যে পর জীবনে তাহা ঘটিবে না বলিয়া ভীত হইবার কারণ আছে। দুঃখ চারিদিকেই ত আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। বিষাদের প্রেতমূর্ত্তি চারিদিকেই ত নৃত্য করিতেছে। যখন যে দুঃখ আসে, তখনই তাহা তীব্রাত্তিতীব্র বলিয়া বোধ

ইয়। তোমার একমাত্র পুত্র মরিয়া গিয়াছে, তোমার একমাত্র জীবনের ধ্রুব তারা কালের বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার সাধের ধন তোমার বক্ষে শূলাঘাত করিয়া কে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তুমি যে যাতনায় পুড়িতেছ, বল দেখি তোমার সে যাতনা সে কষ্ট শত সহস্র রৌরব নরকের যাতনা অপেক্ষা গুরুতর কি না? তোমার হৃদয়-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রাণের প্রণয়িনী স্ত্রী আজ হয় ত মারা গিয়াছে, তোমার হৃদয়োদ্যানের ফুটন্ত ফুল কাল হস্তীর পদতলে হয় ত বিমর্দ্দিত হইয়াছে, তোমার প্রেমের পুত্তলী সোহাগের সামগ্রীকে দুরন্ত দস্যুতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, যে মুখপদ্মের দিকে তাকাইলে তোমার দাবদগ্ধ হৃদয়-মরুক্ষেত্রে শীতলজলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইত, আজ সেই শ্মশান তল-লুণ্ঠিত মুখখানিকে বুকে রাখিয়া মরমের অশ্রুজলে তুমি ভূমিতল সিক্ত করিতেছ, বল দেখি নরকের কোন্ কষ্ট তোমার এ মর্ম্ম-বেদনার সমান হইতে পারে? তাই বলিতেছি, দুঃখ আমাদের পক্ষে কোন নূতন জিনিষ নয়, ইহা আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত। এই জানা শুনা চেনা পদার্থের সহিত পরলোকে যদি আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে তাহার জন্য ভয় কিসের?

মৃত্যুর সাগরে আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি। এক তিলার্দ্ধ সময় আমরা মৃত্যু ছাড়া নই। কল্য যে আমি বিদ্যমান ছিলাম, অদ্য সে আমি আর নাই। সে আমি মরিয়া গিয়াছি। আবার অদ্য যে আমি বর্ত্তমান আছি, আগামী কল্য এ আমি থাকিব না। সুতরাং মুহূর্মুহু আমার মৃত্যু হইতেছে। বিষম কাল-সর্প আমাকে মুহূর্মুহু গ্রাস করিতেছে। মৃত্যুরূপ অজাগর সর্পের

প্রকাণ্ড উদরে আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছি। আমার পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স হইয়াছে, যদি আমার পরমায়ুর উর্দ্ধসংখ্যা পরিমাণ পঞ্চাশ বর্ষ হয়, তাহা হইলে কাল-অজগর আমাকে অর্দ্ধেক গিলিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ কাহাকেও বা সিকি কাহাকেও বা অর্দ্ধেক কাহাকেও বা পূর্ণরূপে মৃত্যু গ্রাস করিতেছে। সুতরাং একটু একটু করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু আমাদিগকে কবলিত করিতেছে। অতএব মৃত্যুর কামড় আমরা সর্ব্বদাই ত সহ্য করিতেছি। তবে শেষ কামড়ের জন্য এত ভয় কেন? যে মুহূর্ত্তে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু আমাদিগকে গিলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং মৃত্যুর মুখে আমরা সর্ব্বদাই ত রহিয়াছি, মৃত্যু যদি বাস্তবিকই আমাদিগের ভয়ের জিনিষ হয়, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগকে এতখানি গিলিয়া ফেলিলেও আমরা ভয়ে আতকাইয়া উঠি না কেন? আমাদের এতখানি বয়স চলিয়া গিয়াছে, অথচ জীবনের প্রকৃত কোন কার্য্যই হইল না। কৈ ইহার জন্য ত ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠে না। সুতরাং মৃত্যুর জন্য ভয় আমাদের ভ্রম বশতঃই হইয়া থাকে। মৃত্যুকে ভয় করিবার তেমন কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। যে মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে, এমন চিরসঙ্গী চিরপরিচিত প্রিয় মিত্রকে ভয় করিতে হইবে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। এক মুহূর্ত্তের তরেও যাহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ নাই, এক নিমেষের জন্যও যাহার বিরহ-যন্ত্রণা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয় না, এমন চিরদিনের সাথী চিরাভ্যস্ত প্রিয়বান্ধবকে ভীতি-সঙ্কুচিত-নয়নে দেখিতে হইবে, ইহা বড়ই বিচিত্র কথা। জগতের ছত্রে ছত্রে

মৃত্যু বিরাজ করিতেছে। ফলে ফুলে পল্লবে মৃত্যুর সুষমা জাগিয়া উঠিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিজয়-দুন্দুভি জগতে ঘোষিত করিয়া কালের অনন্ত ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে, সুতরাং মৃত্যুর সহিত জগতের এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিলেও মৃত্যুরাজ্য একটা অপরিচিত, কি জানি, কিম্ভূত কিমাকারময় বলিয়া জগৎ তথায় যাইতে ভীত হয় কেন?

যাঁহারা বলিয়া থাকেন, শরীরের ধ্বংস হইলেই সব ফুরাইয়া যায়, মৃত্যুর পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর আমাদের চিহ্নমাত্র থাকে না, তাঁহাদের মতেও ত মৃত্যুকে ভয় করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। মৃত্যুর পর আমার যদি একবারেই অস্তিত্ব বিলোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ত আমি বার বার জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক জঠর-যন্ত্রণার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তাহা হইলে আর আমাকে সংসারে পুনরাবৃত্ত হইয়া বার বার দুঃখ যন্ত্রণাত ভোগ করিতে হয় না। সংসারে পুনরাবৃত্তির নামই ত বন্ধন। বার বার জন্ম পরিগ্রহণ করার নামই ত বন্ধন-শৃঙ্খল। এই বন্ধন হইতে যদি আমি ত্রাণ পাই, তাহা হইলেই ত আমি মুক্তি-সুখের অধিকারী হইলাম। আর্য্যশাস্ত্র ইহাকেইত "মুক্তি" বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই যদি ভৌতিক শরীরের ধ্বংস হইলে "আমার" ধ্বংস হইত, তাহা হইলে কোন ভাবনা ছিল না। যে দিন আমার মনোময় শরীর ধ্বস্ত হইয়া যাইবে, যে দিন আমার এ ক্ষুদ্র আত্মা অনন্ত পরমাত্মায় ডুবিয়া যাইবে, যে দিন এ ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌ অনন্তসাগরের উন্মুক্ত বক্ষে বিলীন হইয়া যাইবে, সেই দিনই আমার প্রকৃত মৃত্যু। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে, অনন্ত আকাশে মিশিয়া যায়, সেইরূপ

আমার শরীর ও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন আত্মা শরীরাদি বিনষ্ট হইয়া গেলে যেদিন অখণ্ড পরমাত্মার সত্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইবে, সেই দিনই আমার প্রকৃত মৃত্যু। যেদিন আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম মরিয়া যাইবে, যেদিন আমার বৃত্তিরাশি বিলুপ্ত হইয়া মনঃপ্রাণের সহিত আত্মার সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে, যেদিন শরীর চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া যাইবে, সেই দিনই বুঝিব আমার প্রকৃত মরণ হইয়াছে। যে মৃত্যু হইলে সংসারে আসিয়া আর পুনর্ব্বার জন্মিতে বা মরিতে হয় না, যে মৃত্যু হইলে শরীরেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণের সাহায্যে আত্মাকে ভবঘুরে সাজিয়া আর কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরিতে হয় না, যে মৃত্যু হইলে আসক্তি, মায়া, মমতার বিরহ-যন্ত্রণায় আর অনন্ত-কাল জলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয় না, তেমন মৃত্যুর ভিখারী নয় কে? যে মৃত্যু পাইবার জন্য যোগী যোগ-সমাধিতে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, জ্ঞানী জ্ঞান-নীরে ভাসিয়াছেন, তেমন মৃত্যুর কাঙ্গাল জগতে নয় কে? মৃত্যুই ত অমৃতধাম—মৃত্যুই ত অমরমন্দির। মৃত্যুই জগতে অক্ষয় পদার্থ। মৃত্যুর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আর্য্য শাস্ত্রই জগতে প্রথমে অঙ্কিত করিয়াছেন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ মৃত্যু-ধামে অগ্রসর হইবার জন্যই জীবকে গভীর তত্ত্ব কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন; বেদান্তশাস্ত্র ছাড়া মৃত্যুর শাস্ত্র আর নাই। বেদান্তের ভাষা ছাড়া মৃত্যুর ভাষা আর নাই। বেদান্তের ভাব ছাড়া মৃত্যুর তেমন ভাব আর কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই।

মৃত্যুর জন্য বাস্তবিকই ততটা উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। ভৌতিকদেহের মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়াদি সংমূর্চ্ছিত হইয়া যায়, অনুভূতি-শক্তি অভিভূত হইয়া যায়, সুতরাং বাহিরের লোকে মনে করিলেও মুমূর্ষু মরণের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে

না। ঘোর সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হওয়ায় যেমন সুখ দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না, মরণ কালেও সেইরূপ হয় না, ইহাই ত বিধাতার বিচিত্র লীলা। অতএব মৃত্যুকালে ঘোর কষ্ট হইলেও তাহা যখন অনুভূত হয় না, তখন কষ্ট হওয়া না হওয়া একই কথা। সুতরাং মৃত্যুজনিত কষ্টের যে একটা ভয়, তাহা অমূলক। কিন্তু ইহার উপর আর একটা ভয় আছে। আসন্ন মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যদি মনে হয়, হায়! এই প্রিয় সংসারকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছি, যাহাদিগকে "আপনার" বলিয়া এতদিন ভাল বাসিয়া আসিয়াছি, আমার অভাবে তাহাদের কি দশা হইবে, এই গাছ পালা ঘর দুয়ার বিষয় আশয় কত কষ্টে তৈয়ার করিয়াছি, এই সমস্ত আমার সাধের সম্পত্তি কি হইবে, কে ভোগ করিবে, ইত্যাদি দুর্ভাবনায় মুমূর্ষুর চিত্ত যদি ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই সে ভয় সাংঘাতিক, সে কষ্টের আর তুলনা নাই। প্রকৃততঃ মায়া মমতার কষ্টই মৃত্যুকালে ভয়ের সামগ্রী। ইহা ছাড়া মৃত্যুতে আর ভয়ের অংশ কিছুই নাই। এটুকু কাটাইতে পারিলেই মৃত্যুর বিভীষণত্ব আর কিছুই থাকে না। সংসারী জীবের পক্ষে মায়া মমতা থাকা অবশ্যা-বশ্যকীয়। মায়া মমতা না থাকিলে সংসার জীর্ণ কঙ্কাল বলিয়া বোধ হইত। মায়া মমতাই সংসারের দুঃখময় অংশকে আবৃত করিয়া মধুর করিয়া রাখিয়াছে। মায়া মমতাই সংসারের বিকট মূর্ত্তিকে স্বর্গের বরণীয় করিয়া উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। বৈদান্তিক মায়া মমতার মস্তকে পদাঘাত করিতে পারেন, কিন্তু সংসারী জীব মায়া মমতার আশ্রয় লইতে বাধ্য। যে স্বভাবের সূত্রে আমরা মায়া মমতাকে পাইয়াছি, সেই স্বভাবের বশেই যদি

ইহ সংসারের মায়া মমতার বন্ধন আমাদিগকে পরিহার করিতে হয় ত তাহার জন্য আমাদের দুঃখ বা ভয় হইবে কেন? মায়া মমতায় মুগ্ধ হওয়াটা যেমন আমাদিগের স্বাভাবিক সহজসিদ্ধ, মায়া মমতার পরিহারটা সেইরূপ সহজসাধ্য করিয়া লইতে পারিলে আর ত কোন জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। পার্ব্বতীয় লতা যদি প্রস্তরের তলদেশ ভেদ করিয়া গভীর ভাবে বদ্ধমূল হয়, ত সে গাঢ় সংবদ্ধ শিকড়কে উঠান বড় সহজ কথা নহে, কিন্তু সেই লতা বালুকাস্তূপের উপর বদ্ধমূল হইলে তাহাকে উপড়াইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। সেই রূপ মায়া-মমতাকে সংসারের গভীর গর্ভে বজ্রবৎ দৃঢ়রূপে প্রোথিত না করিয়া যদি তাহাকে বালুকাময় স্তূপের উপর ভাসা ভাসা রূপে বসাইয়া রাখি, তাহা হইলে কার্য্য কালে তাহাকে উৎপাটন করিতে আর কোন দুঃখ হয় না। কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাইতেছে। যখন কোন সিভিলিয়ান সাহেব জেলার নূতন মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন, তখন তাঁহাকে বসবাস করিবার জন্য একটী মনোমত বাংলার আশ্রয় লইতে হয়। কত পছন্দসই ঘর কন্নার আসবাব তাঁহাকে কিনিতে হয়। গাড়ি ঘোড়া পছন্দ করিয়া রাখিতে হয়। মনোহর উদ্যানটী পছন্দ করিয়া পুষ্প বৃক্ষে সাজাইতে গুজাইতে হয়। প্রিয়তম চাকর বাকর খানসামা আদিকে শিখাইয়া পড়াইয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হয়। তাঁহাকে একটী রীতিমত সংসার পাতাইতে হয়। কিছু দিন বাদে সাহেবের কার্য্যকাল ফুরাইয়া যখন বিলাত যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন সাহেব ঘর কন্নার সমস্ত জিনিষ পত্র সিকি মূল্যে নিলামে বিক্রয় করিয়া তিনি বাড়ি যাইবার জন্য

প্রস্তুত হন। তাঁহার সাধের জুড়ি গাড়ি তাঁহার আদরের ঘোড়া তিনি অম্লান বদনে বিদায় করিয়া দেন। কত যত্নে যে সমস্ত জিনিষ বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সাহেব নির্ম্মম হৃদয়ে সে গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া যান। সে গুলির দিকে একবার জ্রক্ষেপও করেন না। সেই সমস্ত জিনিষ পরিত্যাগে সাহেবের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। কেন না সাহেব জানিতেন, যতদিন তাঁহাকে কার্য্য-ক্ষেত্রে থাকিতে হইবে, ততদিনই ঐ সমস্ত জিনিষ পত্রের সহিত তাঁহাব সম্বন্ধ। কার্য্য কাল ফুরাই-লেই সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে। সুতরাং ঐ সমস্ত জিনিষের উপব তাঁহার মায়া মমতা ছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত তঁাহার পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সর্ব্বদাই সূক্ষ্মভাবে বিজড়িত থাকিত, কাযেই তাঁহাব মায়া মমতা ততটা বদ্ধমূল হইবাব অবকাশ পায় নাই। তাই সে গুলি পরিত্যাগ করিবাব সময় তাঁহার ততটা দুঃখের উদ্রেক হয় না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেব মত সংসারী জীব আমবাও এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কবিতে আসিযাছি। কর্ম্মকাল ফুরাইলেই আমাদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান কবিতে হইবে। আমাদের যদি মনে থাকে, যতদিন সংসাবে কর্ম্ম করিব, ততদিনই সংসারের জিনিষপত্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, কর্ম্মকাল ফুরাইলেই সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে। এই চিন্তা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত আমাদের অন্তরে জাগরুক থাকিলে মায়া মমতা বদ্ধমূল হইতে পায় না। তাহা হইলে মরণ কালে ঘব দুয়ার স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া অত্যুৎকট বিভীষিকায় ভীত হইতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত চিন্তার বালুকাময়স্তূপে মায়া মমতার ভিত্তি যদি রচনা করিতে পারি, তাহা হইলে মরণকালে সে

ভিত্তিকে টলটলায়মান করিতে আর বেশী বেগ পাইতে হয় না। মায়া মমতার ঐন্দ্রজালিক প্রলোভনের হাত এড়াইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আসক্তির মোহন ছবি আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন আমরা ব্যস্ত, তেমনই প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিহার করিবার জন্য আমাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই, সংসারী জীব মাত্রেরই এ অভ্যাস টুকু প্রয়োজনীয়। এ অভ্যাস টুকু থাকিলে আর মৃত্যুভয়ে কাঁপিতে হয় না। সাংসারিক কোন জ্বালাই তাহা হইলে আর আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পাবে না।

যোগাভ্যাস।*

পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" মানসিক বৃত্তিরাশির নিরোধের নাম যোগ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বৃত্তিরাশি মন এবং শরীরের প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। মনের প্রক্রিয়া বিশেষের ফল শরীরে এবং শারীর-ক্রিয়া বিশেষের ফল মনে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি মনঃশক্তিকে শরীরের কোন বিকৃত স্ফীত ভাগ হইতে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া যায়, তবে ঐ স্ফীত ভাগ প্রায়ই বিশুষ্ক হইয়া যায়। আর যদি শরীরের কোন দুর্ব্বল অঙ্গে নিজ মনের বেগ সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, তবে উক্ত অঙ্গ নিশ্চয়ই বলশালী হইয়া উঠে। এইরূপ আমরা

---

* এই প্রবন্ধটি একজন যোগীর উপদেশ অনুসারে লিখিত হইয়াছে।

ইচ্ছাশক্তির বলে ইচ্ছানুরূপ শরীরের আকার • প্রকার গঠন করিতে পারি। আবার শরীরের আকার ভাবভঙ্গী অনুসারে আমরা মনকেও কখনও তদ্ভাব-ভাবিত করিতে পারি। যদি কেহ মন খেদযুক্ত অবস্থায় থাকিলেও সে সময়ে শরীরকে প্রফুল্লভাব-ব্যঞ্জক অবস্থায় রাখিতে পারে, তবে তাহার মনও তখন প্রফুল্লভাব ধারণ করে। সুতরাং শরীরের ক্রিয়া বিশেষে মন পরিবর্ত্তিত হয়, আবার মনের ক্রিয়া বিশেষে শরীরও পরিবর্ত্তিত হয়।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিভিন্ন বিভিন্ন গতি দ্বারা মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ গতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং এই বিশেষ বিশেষ গতি হইতেই মনোবৃত্তি রাশির উদয় হয়। শ্বাসের ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধভাগস্থ বায়ুকে উপরের দিকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতে পারিলে অর্থাৎ সমস্ত উদর, উদরোর্দ্ধ ভাগস্থ পেশীবন্ধ এবং ফুস্‌ফুসের পেশী সমূহকে যথোচিত কার্য্যশীল করিতে পারিলে মনের ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কুচিত বৃত্তি সকল বিদূরিত হয়। ক্ষুদ্র মনোবৃত্তি সমূহের প্রবলতায় বন্ধসংলগ্ন মাংসপেশী সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে এবং এতদ্দ্বারা ঔদরিক তাবৎ যন্ত্রই স্ব স্ব স্থানচ্যুত হইয়া যায়। কিন্তু মূলাধার হইতে নিশ্বাস আকর্ষণ করিলে পেশীবন্ধলগ্ন মাংসপেশীরাশি পুষ্ট হয়, এবং অন্যান্য যন্ত্রও স্ব স্ব স্থানস্থ হইয়া আসে এবং সঙ্কুচিত মনোবৃত্তি রাশি তিরোহিত হইয়া যায়। মনের কোন উদাস বৃত্তিকে দূর করিতে হইলে তদ্বৃত্তি বিরুদ্ধ নিশ্বাসেরই গতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে মাত্র।

এইজন্য যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম অর্থাৎ বায়ুসংযমের ব্যবস্থা

ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হঠদীপিকায় লিখিত আছে যে নিশ্বাসের গতি থাকিলেই মনোবৃত্তি ক্রিয়া করিতে থাকে। নিশ্বাসের গতি বন্ধ হইলে মনোবৃত্তিও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। কিন্তু বায়ু অবরোধপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ জন্য চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে আরও অন্য প্রকার ক্রিয়া বিশেষের অভ্যাস আবশ্যক।

যোগক্রম।

সম শীতোষ্ণতাপূর্ণ স্থানে যুবা পুরুষ প্রতি শত ভাগের সাড়ে চারি ভাগ আঙ্গারীকায় বায়ু প্রশ্বাস দ্বারা নির্গত করিয়া থাকে, এবং যোগাভ্যাস দ্বারা এই বায়ুই পরিপাক করা প্রথম প্রধান উদ্যোগ, এবং এইজন্য যোগাভ্যাসী এরূপ গুহাতে নিবাস করিবেন, যেখানে মনুষ্য শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের সমান উষ্ণতা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। যোগাভ্যাসী শারীরিক পরিশ্রম করিবেন না, তাড়িৎশক্তি প্রবাহক অর্থাৎ পরিচালক ধাতু পদার্থাদি স্পর্শ করিবেন না, অপরিচালক বস্তু, যথা চর্ম্ম, রোম, কুশাদির উপর স্থির হইয়া উপবেশন করিবেন, মৌনী থাকিবেন, রাত্রিতে একবার মাত্র অল্প পরিমাণে তৃণ তণ্ডুলের (তিনি চাউল) পায়স ভোজন করিবেন, অল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ জলপান করিবেন ও অল্প নিদ্রা যাইবেন। এতাবৎ অভ্যস্ত হইলে হিংসা ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়, চৌর্য্য, লোভ এবং মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগের অভ্যাস ক্রমশঃ করিবেন অর্থাৎ অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্তেয় অপরিগ্রহ এবং সত্যের অবলম্বন করিবেন। যখন এতাবতের সম্পূর্ণাভ্যাস হইবে, তখন নিজ

চিত্তবৃত্তির মলিনতা দূর করিবার নিমিত্ত তপস্যা বা উপবাস, শৌচ অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরভাগ বায়ু দ্বারা ও বহির্ভাগ জল দ্বারা ধৌত করিবে। সন্তোষ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যাত্ম-বিদ্যাভ্যাস এবং ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ নিজ কর্ম্মফলরাশিকে ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিবে। এই পাঁচটী নিয়মের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে করিতে হইবে।

আসন।

যখন এতাবতের কিছু কিছু অভ্যস্ত হইবে, তখন আসনাভ্যাস করা আবশ্যক। গোরক্ষনাথ প্রধানতঃ ৮৪ প্রকার আসনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তত্তাবতেব মধ্যে স্বস্তিকাসন ও সিদ্ধাসনই অত্যন্ত সুগম এবং অধিকতর ফলদায়ক। স্বস্তিকাসন, যথা—বাম চরণ দক্ষিণ উরুর তলে এবং দক্ষিণ চরণ বাম উরুর তলে রক্ষা করিয়া মেরু দণ্ডকে সরল ভাবাপন্ন করিয়া উপবেশন করিবে। সিদ্ধাসন যথা—বামপদ গুল্ফ দ্বারা গুহ্যস্থান অর্থাৎ মলদ্বার ও অণ্ডকোষের মধ্যস্থল আপীড়ন এবং দক্ষিণ গুল্ফ লিঙ্গমূলে রক্ষা পূর্ব্বক মেরুদণ্ডকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন করিবে। অভ্যাস দ্বারা এবং দিগাকাশ প্রভৃতি কোন অসীম পদার্থের পরিচিন্তন দ্বারা আসন দৃঢ় হইয়া থাকে। যখন যোগাভ্যাসী স্বস্তিকাসন বা সিদ্ধাসনে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সুখ পূর্ব্বক স্থির হইয়া বসিতে পারিবেন, তখন ভ্রূ মধ্যে নিজ দৃষ্টি রক্ষার জন্য অভ্যাস করিবেন। যখন অশ্রুপাত না করিয়া এবং পলক না ফেলিয়া

এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিবেন, তখন জলন্ধর বন্ধের অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিবেন। জলন্ধর বন্ধ, যথা— চিবুকে বক্ষের উপর কণ্ঠাস্থিদ্বয়ের মধ্যে সংলগ্ন ও কণ্ঠকে-সঙ্কুচিত করিবে এবং সঙ্কুচিত কণ্ঠনাল দ্বারা ধীরে ধীরে নিশ্বাসকে ঊর্দ্ধ-দিকে আকর্ষণ করিবে এবং নিশ্বাস লইতে যতক্ষণ লাগিবে তাহার দ্বিগুণ সময় উক্ত বায়ু মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া নিম্নে নামাইয়া আনিবে।

অজপা সাধন।

ঘোর নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে একবার নিশ্বাস ও প্রশ্বাসে ৪ সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়। এই গণনায় প্রতি মিনিটে আমাদের ১৫ বার, প্রতি ঘণ্টায় ৯০০ বার, ২৪ ঘণ্টায় বা দিবা রাত্রিতে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে হয়। যোগাভ্যাস কালে প্রতি শ্বাসে "হং" এবং প্রতি প্রশ্বাসে "সঃ" এইরূপ শব্দ অনুভব হইয়া থাকে। নিশ্বাস গ্রহণকালে "হং" এবং বায়ু ত্যাগ কালে "সঃ" এই কল্পিত শব্দ দ্বয়ের প্রতি বিশেষ ধ্যান রাখিতে হইবে। অভ্যাস ও শীঘ্রতাবশতঃ "হং" "সঃ" শব্দ দ্বয় প্রতিলোমিত হইয়া "সঃ—হং" বা "সোহহং" এইরূপ অনুভূত হয়। তখন মন প্রতি শ্বাসে "সো" এবং প্রতি প্রশ্বাসে "হং" এই কল্পিত শব্দ দ্বয়ের প্রতি অভিনিবেশ করিবে। অধিকতর অভ্যাস এবং অধিকতর শীঘ্রতা বশতঃ "সোহহং" এর "স" এবং "হ" এই ব্যঞ্জনদ্বয় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন কেবলমাত্র

গু+অম্ অর্থাৎ "ওঁ" ইত্যাকার বোধ হইবে। যোগাভ্যাসী তৎকালে প্রতি নিশ্বাসে ও প্রতি প্রশ্বাসে "ওঁ" এই শব্দের প্রতি বিশেষ অভিনিবিষ্ট হইবে। এইরূপ মানসিক জপকে "অজপা" কহে। যদি কাহারও এরূপ সংশয় হয়, যে আমরা দিবা রাত্রির মধ্যে ২১৬০০ বার নিশ্বাস গ্রহণ করি, কিন্তু সুষুপ্তি কালে যখন আমরা অচেতন ও ঘোর নিদ্রিত থাকিব, তখন কিরূপে প্রতিশ্বাস প্রশ্বাসে "ওঁ" শব্দের ধ্যান সম্ভব? সত্য বটে, সুষুপ্তিকালে মন নিজ কারণে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু জাগ্রদবস্থার বাসনা নিদ্রাকালেও কার্য্য করিতে থাকে, নতুবা জাগ্রত হইলে নিদ্রার পূর্ব্বের কথা সকল আমবা বিস্মৃত হইয়া যাইতাম।

ষট্চক্র।

যখন যোগাভ্যাসীর "অজপা" সাধনে পূর্ণ অভ্যাস হইবে, তখন মজ্জাতন্তুময় যে যে বিচিত্র চক্র শরীরের মধ্যে স্থানে স্থানে সংস্থিত আছে, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। সাধক অভ্যাস দ্বারা আভ্যন্তরিক দৃষ্টি সহযোগে দেখিবেন যে মস্তিষ্ক মধ্যে কর্পূর বর্ণ একটী সহস্রদল কমল আছে। সেই সহস্রারবিন্দ ব্রহ্মরন্ধ্র চক্র নামে অভিহিত, উহা পরম গুরুর স্থান। ভ্রূমধ্যে বিদ্যুদ্বর্ণ একটী দ্বিদল কমল আছে, উহা আত্মার স্থান। আজ্ঞাচক্র নামে কথিত হইয়া থাকে। কণ্ঠমধ্যে ধূম্রবর্ণ ষোড়শ দল কমল, উহা প্রাণের স্থান, বিশুদ্ধ চক্রনামে অভিহিত।

হৃদয় মধ্যে পীতবর্ণ দ্বাদশ দল কমল। উহা শিবের স্থান, অনাহত চক্রনামে প্রসিদ্ধ। নাভিমধ্যে নীলবর্ণ দশ দল কমল, উহা বিষ্ণুর স্থান, মণিপুর চক্র নামে আখ্যাত। লিঙ্গমূলে রক্তবর্ণ ষড়্দল কমল, উহা ব্রহ্মার স্থান, স্বাধিষ্ঠান চক্র বলিয়া অভিহিত। লিঙ্গ ও গুহ্য দেশের মধ্যে স্বর্ণবর্ণ চতুর্দ্দল কমল, উহা বিঘ্নবিনাশন গণপতির স্থান, আধারচক্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যখন সাধক নিজ অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা এই সকল চক্র স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, তখন তিনি মেরুদণ্ডকে সরলভাবে রাখিয়া কণ্ঠ সঙ্কুচিত, চিবুক বক্ষোপরি সংস্থাপিত করিয়া স্বস্তি-কাসনে উপবেশন পূর্ব্বক শ্বাসবায়ুকে আধারচক্র হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রত্যেক চক্র ভেদ করিতে করিতে উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র চক্রে উত্থাপিত করিবেন এবং তাহার দ্বিগুণ সময়ে মেরু মধ্য দিয়া আধার চক্রে নামাইয়া আনিবেন। এবং শ্বাস তুলিবার ও নামা-ইবার সময় "ওঁ" এই শব্দের প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ রাখিবেন। এতদভ্যাসের পর শ্বাস উত্থাপন কালে প্রতি চক্রের বাম দিক দিয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে উর্দ্ধে লইয়া যাইবেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় মেরুদণ্ড দ্বারা আধার চক্রে নামাইয়া আনিবেন। ইহা উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলে শ্বাস উর্দ্ধে আকর্ষণ কালে প্রতি চক্রে কিঞ্চিৎ নিয়মিত কাল বিশ্রাম করিতে হইবে। শ্বাস দিবা রাত্রিতে ২১৬০০ বার উঠিতেছে ও বহির্গত হইতেছে। এই গণনায় যোগাভ্যাসী আধার চক্রকে বামদিক দিয়া আবর্ত্তনকালে ৬০০ বার অর্থাৎ প্রতিদলে ১৫০ বার শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মিত কাল বিশ্রাম করিবেন। স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহত চক্রের প্রত্যেক-টিকে বামদিক দিয়া আবর্ত্তনকালে ৬০০০ বার অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান-

চক্রের প্রতিদলে ১০০০ বার, মণিপুর চক্রেব প্রতিদলে ৬০০ বার ও অনাহত চক্রের প্রতিদলে ৫০০ বার শ্বাস প্রশ্বাসের কাল বিশ্রাম করিবেন। তদনন্তর বিশুদ্ধ চক্র আজ্ঞাচক্র ও ব্রহ্ম-রন্ধ্র চক্র, প্রত্যেকের বামদিক দিয়া প্রদক্ষিণ কালে ১০০০ বার অর্থাৎ বিশুদ্ধ চক্রের প্রতিদলে ৬২॥০ আজ্ঞা চক্রের প্রতিদলে ৫০০ এবং ব্রহ্মরন্ধ্র চক্রের প্রতিদলে একবার শ্বাস প্রশ্বাসেব কালে বিশ্রাম করিতে হইবে। প্রত্যেক চক্রেব প্রত্যেক দলের চিহ্ন, প্রত্যেক দলে প্রাণবায়ুকে স্থিত করিবার ফল, ষট্চক্র গ্রন্থে বিস্তাব পূর্ব্বক বর্ণিত আছে, তাহাব চিত্র দর্শন করিলে উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবেন, এই সাধনাটি গুরুতর অভ্যাস ও বহুকাল সাপেক্ষ।

নাদ।

অতএব সমস্ত চক্র আবর্ত্তনেব সামর্থ্যলাভেব পূর্ব্বে সাধক ইচ্ছা কবিলে নাদ সাধন অভ্যাস কবিতে পাবেন, অর্থাৎ মেরুদণ্ডকে সবল ভাবে বাখিয়া সিদ্ধাসনে বিরাজ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বাবা বাম কর্ণ রুদ্ধ করিবে। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু আর বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা বাম চক্ষু, দক্ষিণ মধ্যমা দ্বারা দক্ষিণ নাসা এবং বাম মধ্যমা দ্বাবা বাম নাসা দক্ষিণ অনামিকা কনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ ওষ্ঠাধর এবং বাম অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বাবা বাম ওষ্ঠাধর চাপিয়া অবরোধ কবিবে। এইরূপ করিলে যে ধ্বনি অনুভূত হইবে, নিস্তব্ধ কালে ও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া

তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ করিতে হইবে। অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ দশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ অর্থাৎ নাদ শ্রুত হওয়া যাইবে। প্রথমে চিনি নাদ, ইহাতে ক্লান্তি অনুভব হয়। দ্বিতীয় চিঞ্চিনি নাদে শরীর কম্প, তৃতীয় ঘণ্টা নাদে দুর্ব্বলতা, ৪র্থ শঙ্খ নাদে শিরঃকম্পন, ৫ম তন্ত্রী নাদে অমৃতস্রবের অনুভব হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ তাল নাদে অমৃত পান, ৭ম বেণু নাদে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রকাশ, ৮ম মৃদঙ্গ নাদে বাক্ সিদ্ধি, ৯ম ভেরী নাদে অদৃশ্য দেহ ও দিব্য দৃষ্টি হয় এবং ১০ম মেঘ নাদে সাক্ষাৎ অনাদি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়। এই সমস্তগুলি সাধন করিতে অবশ্যই বহু সময়, বিপুল পরিশ্রম এবং যথেষ্ট ধৈর্য্যের আবশ্যক।

মুদ্রা।

এই জন্য শেষ ৫টী নাদ অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বেই সাধকের খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করা উচিত। খেচরী মুদ্রা, যথা—জিহ্বাকে নিজ হস্ত দ্বারা গোদোহনের রীত্যনুসারে মর্দ্দন করিয়া উহাকে বিপরীতগামিনী করিবার চেষ্টা করিবে এবং যে পরিমাণে জিহ্বা দীর্ঘ হইবে সেই পরিমাণে উল্টাইয়া তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে। এই কার্য্যটীও সুসিদ্ধ করা নিতান্ত স্বল্প সময় সাপেক্ষ নহে। অতএব সাধক জিহ্বাকে তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করাইতে শিখাইলেই প্রাণায়ামের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম অভ্যাস কালে এমন একটী গুহাতে বাস করিতে হইবে যে তথাকার স্থানীয় উষ্ণতা মনুষ্যের স্বাভাবিক শারীর উত্তাপের অল্পাধিক না হয়। মৌনাবলম্বন, যম, নিয়ম, সুখাসন, জলন্ধরবন্ধ, খেচরী মুদ্রা, দৃঢ় দৃষ্টি ও চক্রভেদ প্রাণায়ামের উপযোগী। প্রাণায়ামে তিনটী ক্রিয়া করিতে হয়। ১ম শ্বাসত্যাগ অর্থাৎ রেচক, ২য় শ্বাসগ্রহণ অর্থাৎ পূরক, ৩য় শ্বাসাবরোধ-অর্থাৎ কুম্ভক। শ্বাসগ্রহণ কাল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। শ্বাসের অবরোধ কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শ্বাস পরিত্যাগ কাল শ্বাসগ্রহণের দ্বিগুণ। প্রাণায়াম অভ্যাসের নিমিত্ত স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিতে হয় ও মেরুদণ্ডকে সরল, কণ্ঠকে কুঞ্চিত, চিবুককে কণ্ঠাস্থিদ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপিত, বিপরীতগামী জিহ্বাকে তালুরন্ধ্রে প্রবিষ্ট, দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে গাঢ়রূপে রক্ষিত, ও বাম হস্ত বাম হাঁটুর উপরে সংস্থাপিত করিয়া রাখিতে হয়। বাম নাসাপুট দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা অবরোধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটদ্বারা শ্বাস মেরুদণ্ড দিয়া ধীরে ধীরে আধার চক্রে নামাইবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসাপুটকে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধ করিয়া বাম নাসাপুটদ্বারা শ্বাস আধার চক্র হইতে ষট্চক্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে। তৎপরে দক্ষিণ ও বাম উভয় নাসাপুটই দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা শ্বাসের গতি সম্পূর্ণ অবরোধ করিবে, ইহাই প্রথম প্রক্রিয়া। ২য় প্রক্রিয়াতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর প্রতিলোম, ৩য় প্রক্রিয়াতে প্রথম প্রণালীর পুনবলম্বন করিবে এবং সকল ক্রিয়াতেই "ওঁ" শব্দের প্রতি মনের বিশেষ অভিনিবেশ থাকিবে। প্রাণায়াম-

শিক্ষার্থী প্রথমে ৫ বা ১০ বা ১৫ সেকেণ্ড সময় মেরুদণ্ড দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু আধার চক্রে নামাইবে, তদনন্তর কুঞ্চিত কণ্ঠনাল দ্বারা আড়াই বা পাঁচ বা সাড়ে সাত সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শ্বাস আকর্ষণ করিবে, পরে দশ বা বিশ বা ত্রিশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত অবরোধ করিবে। এই সামান্য প্রাণায়ামেতে শরীর রোমাঞ্চ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে; কিন্তু মুখ্য প্রাণায়ামে প্রথমতঃ রেচক ২৪ সেকেণ্ড, পূরক ১২ সেকেণ্ড এবং কুম্ভক ৩২৪ সেকেণ্ড করিতে হয়। এরূপ প্রাণায়ামে শরীর হইতে ক্রমশঃ ঘর্ম্ম নির্গম ও শরীর কম্পন, এবং শরীরের লঘুতা হয়। প্রাণায়াম (শ্বাস-সংযম) অভ্যাস দ্বারা প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বশীকরণের সামর্থ্য জন্মে। ৬৪৮ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শ্বাসাবরোধ করিতে পারিলে প্রত্যাহার সিদ্ধ হইতে পারে। প্রত্যাহারের অভ্যাস দ্বারা ধারণা, অর্থাৎ চিত্তনিবেশের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ধারণাকালে ১২৯৬ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শ্বাস অবরোধ করিতে হয়। এ অবস্থায় শরীর ও মনের স্বেচ্ছিতগতি অবরুদ্ধ এবং দেহ কঠিন হইয়া যায়। ধারণা ধ্যানের উপযোগী, ধ্যানকালে ২৫৯২ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শ্বাসাবরোধ করিতে হয়। ধ্যানশীল পুরুষের সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুজ্জ্যোতিঃ দ্বারা আকীর্ণ বোধ হয়। চিত্ত হইতে সমস্ত পদার্থ দূর করিয়া কেবল একটীমাত্র পদার্থ গ্রহণ করার নাম ধ্যান। যখন কেবল ওঁ শব্দার্থ অথবা কিঞ্চিৎ তমোগুণ মিশ্রিত সাংখ্য শাস্ত্রের শেষ পঞ্চ তত্ত্বের কোন একটী তত্ত্বকে ধ্যান করে, তাহার নাম সানন্দধ্যান। এবং যখন শুদ্ধসত্ত্বগুণ বা যোগীশ্বরকে "অহং" সহিত ধ্যান করে, উহার নাম "সাস্মিতাধ্যান।" ঈদৃশ ধ্যানে আপনার শরীরের অস্তিত্বের অনুভব হয় না, অর্থাৎ পুরুষ

বিদেহ হইয়া যান। কিন্তু যখন "অহং" বোধ হ্রাস হইয়া যায়, তখন মন নিজ সূক্ষ্ম কারণে বিলীন হয়। ঈদৃশ ধ্যানের নাম "প্রকৃতিলয় ধ্যান।" এ অবস্থায় সমস্ত পদার্থই আত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার ধ্যানের মধ্যে অহং ভাবের কিছু কিছু বোধ থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন অহংবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তখনই সমাধির সূত্রপাত। ৫১৮৪ সেকেণ্ড বা তদধিক কাল শ্বাস অবরোধ করিতে পারিলে সমাধি সিদ্ধি হয়। গর্ভস্থ বালকের ন্যায় সমাধিস্থ ব্যক্তির হৃদয়-কোষের দ্বার প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায় এবং কিছুকালের জন্য ভোজন পান বা শ্বাস লইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকে না। সমাধি সবীজ ও নির্ব্বীজ ভেদে দ্বিবিধ। সবীজ সমাধিতে পূর্ব্বসংস্কার সকল কেবল বিলুপ্ত থাকে মাত্র কিন্তু বিনষ্ট হয় না, এজন্য সবীজ সমাধিমান পুরুষকে পূর্ব্বসংস্কার রাশি পুনর্জাগ্রত দশায় আনিতে পারে এবং সে সমাধি আপনা আপনি ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু নির্ব্বীজ সমাধিতে পূর্ব্ব সংস্কার সমস্তই নষ্ট হয়, এজন্যই নির্ব্বীজ সমাধিমান্ পুরুষের সমাধি কখনও ভঙ্গ হইতে পারে না। এই নির্ব্বীজ সমাধি-কালে মনের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়, তখন আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুরই বিকাশ থাকে না।

কর্ম্ম ও বিশ্রাম।

কার্য্যই জীবের জীবন। কার্য্য লইয়াই জীবের অস্তিত্ব। কার্য্যময় এ সংসার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করিতেই ইহ জগতে আসিয়াছি। কর্ম্ম করিতেই পর-জগতে যাইব। কর্ম্মের জন্যই বাঁচিয়া রহিয়াছি, কর্ম্মের জন্যই মরিয়া যাইব। কতকাল হইতে কর্ম্মের ফেরে ঘুরিতেছি, তাহা জানি না, কত কালই বা ঘুরিতে হইবে, তাহারও ঠিকানা নাই। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, কত যুগ যুগান্ত কাটিয়া গিয়াছে, আমরা এই কর্ম্মরেখার ভিতর দিয়া যাইতেছি, তাহার সম্বাদ কেহ বলিতে পারে না। কূল নাই, কিনারা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, এ অসীম এ অনন্ত কর্ম্মময় পাথার দিয়া আমরা অবিরত দৌড়িতেছি, ইহার গুহ্য বার্ত্তা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। অনন্ত আকাশে মেঘমালা যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মবায়ুর অনুপ্রেরণে প্রেরিত হইয়া আমরা প্রকৃতির অনন্ত ক্রোড়ে কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া যাইতেছি। বিশাল সাগরের উম্মুক্ত বক্ষে অসংখ্য বুদ্ বুদ্ রাশি যেমন তরঙ্গাবেগে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া যায়, সেইরূপ সংসারের এই ক্ষুদ্র বুদ্ বুদ্ আমরাও কর্ম্ম তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কোন্ কেন্দ্র স্থলের দিকে যাইতেছি, তাহা কে জানে কে বলিতে পারে?

জীবের জীবনে কর্ম্মের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। এক

তিলার্দ্ধ কেহ কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না, এ বিরাট জীবজগৎ কেবলই কর্ম্মের জন্ম ব্যাপৃত। উদ্যোগ আয়োজন, উৎসাহ চেষ্টা, পরিশ্রম প্রযত্ন লইয়াই জীব-জগৎ বিব্রত। কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি কোন অবস্থাতেই কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবাব যো নাই। বিশ্রাম বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা অভিধানেবই অঙ্ক শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। বিশ্রাম-সুখ জগতে কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। বিশ্রাম পরিশ্রমেরই নামান্তব। ভ্রান্তি-বশতঃ পরিশ্রমকেই বিশ্রাম বলিয়া বোধ হয়। কুক্কুব যখন কোন মাংসযুক্ত অস্থিখণ্ড চিবাইতে থাকে, তখন সেই অস্থিখণ্ডের খোঁচা লাগিয়া তাহাব মুখে রক্তধারা বহিতে থাকে, কুক্কুব সানন্দে তাহা অস্থি খণ্ডেব রক্তধারা মনে করিয়া গলাধঃকবণ করে। এখানে ভ্রান্তিই কুক্কুরকে রক্তপানের আনন্দ উপভোগ কবাইয়া থাকে। সেইরূপ জীব যখন একটা কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম-বাসনায় অবসরের অন্বেষণ করে, সেই বিশ্রামাবসবেও তাহার শরীর-মন-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেহ না কেহ ক্রিয়া বা বৃত্তিতে অবশ্যই ব্যাপৃত থাকে, সেই ক্রিয়া বা বৃত্তি-জনিত পরিশ্রমকেই ভ্রান্তিবশতঃ জীব বিশ্রাম বলিয়া বুঝে।

কর্ম্ম ত্রিবিধ, শারীরিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক। যাহা কেবল শরীর-সাধ্য তাহা শারীরিক, যাহা শরীর নিরপেক্ষ হইয়া মন ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়সাধ্য, তাহা ঐন্দ্রিয়িক, যাহা কেবলমাত্র মনঃ সাধ্য, তাহা মানসিক। হস্তাদি-সাহায্যে কুঠার লইয়া বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছি, ইত্যাকার কর্ম্ম শারীরিক। যখন উক্ত কর্ম্ম করিতে করিতে শরীর ক্লান্ত হইয়া আসিল, তখন সেই কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম।

সেই কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়ায় শরীর বিশ্রাম লাভ করিল বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় বা মন বিশ্রাম করিতে পাইল কি? সে সময়ে হয় ত ইন্দ্রিয় বা কোন বিষয়ে ধাবিত। মন হয় ত কোন চিন্তা লইয়া বিব্রত। হয়ত সে সময়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় কোন রূপবতী কামিনীর রূপতরঙ্গে মগ্ন হইয়া সৌন্দর্য্যলালসায় আকুলি বিকুলি করিতেছে। হয় ত শ্রবণেন্দ্রিয় কোন বিকট শব্দে পীড়িত হইয়া যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতেছে। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি, তাহাই ঐন্দ্রিয়িক কর্ম্ম। মন কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে ইন্দ্রিয়েব বৃত্তি (গতি) হয় না, সুতরাং ঐন্দ্রিয়িক বৃত্তির উপর মনেরও আধিপত্য আছে। আবার যে বৃত্তির উপর কেবলমাত্র মনেবই আধিপত্য, অন্যের সাহায্য অপেক্ষিত হয় না, তাহা মানসিক কর্ম্ম (ক্রিয়া), যেমন চিন্তা স্বপ্নাদি। যখন কোন গম্ভীর তত্ত্বে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয়, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয় বটে, কিন্তু মন গাঢচিন্তারূপ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হয়। নিদ্রাকালে শরীর ও ইন্দ্রিয় বর্গের পূর্ণ বিশ্রাম লাভ হয় বটে, কিন্তু মন নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। তখন হয় ত মন স্বপ্ন-জগতে সংস্কারময় পদার্থ লইয়া লীলা করে। ঘোর সুষুপ্তি কালেও মনের পূর্ণ বিশ্রাম হয় না। তখন অপরিলক্ষিত রূপে মনের ক্রিয়া হইতে থাকে। ঘোর সুষুপ্তির পর জাগ্রদবস্থায় এইরূপ স্মৃতি হয়, "খুব সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, জগতের সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" স্মৃতির উৎপত্তি-নিয়ম হইতেছে এই যে, পূর্ব্বে অনুভবাত্মক জ্ঞান না থাকিলে স্মৃতি হয় না। যে ব্যক্তি কখনও কলিকাতা সহর দেখিয়াছে (অনুভব করিয়াছে,) তাহারই সময়ান্তরে কলিকাতা-বিষয়ক স্মৃতি হইতে পারে। সুতরাং অনুভবই স্মৃতির জন্মদাতা।

সুষুপ্তি ভঙ্গের পর জাগ্রদবস্থায়. "খুব সুখে ঘুমাইয়াছিলাম" ইত্যাকার যে স্মৃতি হয়, ইহারও জন্মদাতা অনুভব স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তি অবস্থাতে উক্তরূপ একটা যে অনুভব হয়, তাহা স্থির সিদ্ধান্তিত কথা। কেন না, উক্তরূপ অনুভব না হইলে উক্তরূপ স্মৃতিও হইতে পারে না। সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থা-তেও মনের সূক্ষ্ম রূপে ক্রিয়া হয়। অতএব সুষুপ্তি অবস্থাতেও মনের বিশ্রাম নাই। সুতরাং কি জাগ্রদবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা, কি সুষুপ্তি অবস্থা, কোন অবস্থাতেই শরীর, ইন্দ্রিয় বা মনের পূর্ণ বিশ্রাম হইতে পারে না। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে বিশ্রাম একটা আভিধানিক কথা মাত্র। প্রতি পলে, প্রতি বিপলে প্রতি মুহূর্ত্তে, সময়ের প্রতি অণুপরমাণুতে আমরা কর্ম্মজালে জড়িত হইতেছি। কর্ম্ম রক্তবীজের বংশ। একটা কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া ভাবিলাম, একটু বিশ্রাম করিব। পরক্ষণেই দেখি কর্ম্মান্তর আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে। শারীরিক কর্ম্ম হয়ত সমাপ্ত করিলাম, তাহার পরক্ষণেই ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক কর্ম্ম আসিয়া জুটিল। সুতরাং কর্ম্মের হাত হইতে এক মুহূর্ত্তও নিস্তার নাই। পরিশ্রমের হাত হইতে এক মুহূর্ত্তও পরিত্রাণ নাই। কর্ম্মান্তরের পর কর্ম্মান্তর অবলম্বন করিলে মনে হয় যেন বিশ্রাম করিতেছি, কিন্তু তাহা ত প্রকৃত বিশ্রাম নহে, তাহা যে ভ্রান্তি। জলন্ত মরুভূমে মরীচিকা দেখিয়া তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের মনে হয়, উহা সুশীতল সলিল রাশি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ত সলিল নহে, তাহা যে প্রখর সূর্য্য-তেজ। তাহাতে যে তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া উঠে। সংসারের নিদারুণ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মনুষ্য বিশ্রামের শীতল ছায়ায় জুড়াইতে যায়। কিন্তু যাহা বিশ্রাম বলিয়া

মনে করে, অহাতে যে পবিশ্রম আরও বাড়িয়া উঠে। অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে কবিতে পরিশ্রমে কাতব হইয়া মনুষ্য-দেহে জীব যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনবরত কর্ম্মের ঘর্ষব-চক্রে ঘূর্ণিত হইয়া অবসন্ন মানবাত্মা যেন বলিতেছে, "আমাব কর্ম্ম-বন্ধন খসাইয়া দাও। অনন্ত কাল হইতে কর্ম্মেব নিদারুণ পবিশ্রমে কাতব হইয়া পড়িয়াছি, আমায় চির বিশ্রাম-ভবনের পথ দেখাইয়া দাও। যেথানে পবিশ্রম নাই, কর্ম্ম নাই, ক্রিয়া নাই, গতি নাই, সে নিবাত নিঝুম প্রান্তবে নিষ্ক্রিয়তার সাগবে যেন ডুবিয়া থাকিতে পারি, তাহাব ব্যবস্থা কবিয়া দাও।" আত্মার এ মবম-কাহিনী, সংসারের নানাবিধ কোলাহলে পড়িয়া, জীব ভুলিযা গিয়াছে। তাই অপথে কুপথে ঘুরিযা সকলেই বিশ্রাম-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা কবিতেছে।

বিশ্রাম জীবের লক্ষ্য। কেননা বিশ্রামই সুখ, বিশ্রামই শান্তি। বিশ্রামই এ সংসাব-মরুভূমে আবামের অমৃতময় প্রস্রবণ। তাই বিশ্রামেব মৃদু মধুর দিব্যদ্যুতি দেখিবাব জন্য জীব লালাযিত। বিশ্রাম না থাকিলে এ সংসার শ্মশানে পরিণত হইত। বিশ্রামই এ দুঃখ-বিষ-পূর্ণ জগৎকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্রাম জীবকে জড করে, অলস করে, মৃতের ন্যায় করিয়া তুলে, কিন্তু তথাপি জীব কি জানি কেন বিশ্রামেব জন্য চির পিপাসু। তাই জীবের পক্ষে জাগ্রদবস্থার পর নিদ্রাবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। গাঢ পরিশ্রমের পর ঘোব সুষুপ্তিব নীরব সমাধি বিহিত হইয়াছে। সুষুপ্তি কালেও যদি চ পূর্ণ বিশ্রাম ঘটে না (কেন না তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে)৷ কিন্তু জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা কতক পরিমাণে বিশ্রাম হইতে পারে, কেন না

সুষুপ্তি অবস্থাতে শরীর ও ইন্দ্রিয় বিশ্রাম লাভ করে। এই আপেক্ষিক ক্ষণিক বিশ্রামকে ঈশ্বরের প্রসাদ রূপে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের সর্ব্বদা বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলে, না জানি জীব কতদূর কৃত কৃতার্থ হইতে পারে। যে বিশ্রামের আর বিনাশ নাই, অবসান নাই, যে বিশ্রামের পর আর পরিশ্রমের মুখ দেখিতে হয় না, যে বিশ্রামে আর কর্ম্মাঙ্কুর ফল পল্লব সহিত গজাইয়া উঠিবার অবকাশ পায় না, সেই চির সমাধিময় বিশ্রাম পাইবার জন্য যেন জীবের অন্তরাত্মা কাঁদিতেছে। ইহ জগতের ক্ষুদ্র বিশ্রাম যেন তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। জীবাত্মা যে অনাদি কাল হইতে অবিদ্যা-বশে কর্ম্ম জালে জড়িত হইয়া নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে, এই অনন্ত কাল পরিশ্রমের পর অনন্ত বিশ্রামই তাহার লক্ষ্য। এক আধ বিন্দু ক্ষুদ্র বিশ্রামে তাহার পরিতৃপ্তি হইবে না। বিশ্রামের অমৃত ময় ধারা প্রবাহ হইলে তবে তাহার চির পরিশ্রান্ত জীবন শান্তি লাভ করিতে পারে, বিশ্রামের গভীর নির্ঝরিণীতে ডুবিতে পারিলে তবে তাহার পরিশ্রমের অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইতে পারে।

চির বিশ্রাম লাভই জীবের মর্ম্মগত বাসনা। কিন্তু জ্ঞানবাদীর চক্ষে কর্ম্ম সেই বিশ্রাম মার্গের অন্তরায়। তাই তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম কাণ্ড নিতান্তই হেয় পদার্থ। জ্ঞানবাদীর তুলিকায় কর্ম্মের অশান্তিময়ী মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে।

"দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ।"

সাং ভাং ১ প্রথম অধ্যায়।

কর্ম্ম কাণ্ড (যাগ যজ্ঞাদি) হিংসাদি দোষ বিজড়িত। কর্ম্মের

ফল বিনাশী। কর্ম্ম জীবকে অনন্ত কাল জন্ম জন্মান্তরের দারুণ আবর্ত্তে ঘুরাইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখের পর দুঃখ ধারাই কর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া থাকে। যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির জলসিঞ্চনে শীত আরও বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ ভব যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির কর্ম্মমার্গে দুঃখ দুর্বিপত্তি আরও শতধারে ফুটিয়া উঠে।

"যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতং।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মাষ্টু মর্হতি॥

যেমন পঙ্ক দ্বারা অঙ্গলিপ্ত পঙ্কের পরিমার্জ্জন অসম্ভব, মদ্য পান দ্বারা মদ্য পান কৃত পাপের শুদ্ধি অসম্ভব, সেইরূপ প্রাণি বধাত্মক যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাণী হত্যা জনিত পাপের ক্ষালন অসম্ভব।

জ্ঞানবাদী কর্ম্মকে নিতান্তই হেয়তার চক্ষে দেখিতে চাহেন। বিজ্ঞানের তীব্র কুঠার লইয়া কর্ম্মের কোমল বক্ষঃ তিনি বিদীর্ণ করিতে চাহেন। নিবৃত্তির ভৈরব খর্পরে কর্ম্ম রাশির বলিদান দিয়া তাহার মুণ্ডমালা গলদেশে ঝুলাইয়া তিনি রণরঙ্গে নাচিতে চাহেন। জ্ঞানীর এ বীভৎস দৃশ্য আমরা কিন্তু দেখিতে চাহি না। আমরা কর্ম্মী জীব, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেই আসিয়াছি। কর্ম্ম আমাদের প্রিয়তম সঙ্গী। এক মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ম্মের সহিত বিচ্ছেদ নাই। আমাদের শরীরের প্রতি রক্ত বিন্দুতে, মনের প্রতি অণু পরমাণুতে, প্রাণের প্রতি স্তরে স্তরে, কর্ম্ম বিজড়িত রহিয়াছে। এমন নিত্য নিয়ত সঙ্গীকে সহসা কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন দিব? এমন সাধের চির সহচরকে কেমন করিয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিব? এমন চির বিশ্বস্ত প্রিয় সখার গলদেশে ছুরিকা হঠাৎ কেমন করিয়া বসাইব? জ্ঞানবাদীর চক্ষে কর্ম্ম

আপাততঃ পরম শত্রু হইতে পারে, আমাদের পক্ষে তাহা পরম মিত্র। আমরা কর্ম্মকে বড় ভালবাসি। অনাদি কাল হইতে কর্ম্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, তাই তাহার উপর আমাদের একটা মায়া মমতা বসিয়া গিয়াছে। সুতরাং সহসা তাহাকে কেমন করিয়া ছাড়ি, বল দেখি? আমরা বিশ্রাম চাই বটে, কিন্তু পরিশ্রমের পর। সুশীতল সলিল চাই বটে, কিন্তু তৃষ্ণার পর। তৃষ্ণা না হইলে জলের মধুরতা অনুভব করিতে পারা যায় না। পরিশ্রম না করিলে, বিশ্রামের শান্তি উপভোগ হইতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে নিষ্কর্ম্মতার আরাম উপলব্ধি হয় না। বন্ধন না হইলে মুক্তির সুখভোগ হইতে পারে না। আমরা কর্ম্ম মার্গের ভিতর দিয়াই চির বিশ্রাম-নিকেতনের যাত্রী হইতে চাই। অবিদ্যার ভিতর দিয়াই ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকারী হইতে চাই।

কর্ম্মতত্ত্ব আরও একটু পরিস্ফুট করিতে হইতেছে। কর্ম্ম কেবল চেতন-জগতেরই নিজস্ব নহে, জড়জগতেও ইহার বিচিত্র লীলা। চেতনের যেরূপ কর্ম্ম, জড়ের সেরূপ না হইতে পারে, কিন্তু কোন না কোন আকারে জড়ও ক্রিয়াশীল। পরিণাম-বাদের নিয়মানুসারে কোন পদার্থই এক অবস্থায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। বাজীকরের অঙ্গুলির উপর গোলাকার পদার্থ যেরূপ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত ইন্দ্রজালময়ী প্রকৃতির নখাগ্রে পরিবর্ত্তন-চক্রে অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনই ক্রিয়া। সুতরাং এক মুহূর্ত্ত কেহই ক্রিয়াশূন্য নহে। ক্রিয়াই সৃষ্টির মূল ভিত্তি। সাংখ্যমতে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির "গুণ-ক্ষোভ" রূপ ক্রিয়া হইলেই সৃষ্টির

সূত্রপাত হয়। ন্যায়মতে সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়। সেই ক্রিয়া বশতই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হয়। সেই সংযুক্ত পরমাণু রাশিই এই বিশ্ব-পিণ্ড রচনা করিয়াছেন। বেদান্ত-মতেও অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়াতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টির মূলে ক্রিয়া নিহিত। ক্রিয়াই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্মদাতা। আবার ক্রিয়াই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি কর্ত্তা। ঐ যে পরমাণুগুলি পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া পদার্থপিণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে, এই আলিঙ্গন-ক্রিয়া মিলন-ক্রিয়া বিলুপ্ত হইলে এখনই ঐ পদার্থপিণ্ড রেণু রেণু হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়। ঐ যে অনন্ত আকাশে নক্ষত্র-মণ্ডলী সূক্ষ্ম আকর্ষণ ক্রিয়ার বলে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঐ আকর্ষণ ক্রিয়ার অভাব হইলে, নক্ষত্রগুলি পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে এখনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ক্রিয়াই জগৎকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ক্রিয়াই জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই ক্রিয়াকে কর্ম্ম বল, আবিদ্যিক সূত্র বল, বন্ধন-রজ্জু বল, একই কথা। যে ক্রিয়ার অনুগ্রহে আমরা জগৎ দেখিতে পাইয়াছি, যাঁহার অবলম্বনে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, সেই ক্রিয়া বা কর্ম্মের মস্তকে জ্ঞানবাদী পদাঘাত করিতে পারেন, আমরা কিন্তু তাহা পারিব না। যাহা হইতে জন্ম লাভ করিয়া, যাহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে সহসা অস্ত্র ধারণ করিতে পারিব না।

কর্ম্ম আমাদের চির-পরিচিত বন্ধু। জ্ঞান-মার্গ সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রত্যক্ষীভূত জগৎ লইয়াই কর্ম্ম ব্যাপৃত। জ্ঞান-মার্গ প্রত্যক্ষ ছাড়া পদার্থের চিরদিনই অনুসরণ করিয়া থাকে।

কর্ম্মের উপাস্ত দেবতাকে আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞেয় দেবতা "অশব্দমস্পর্শ মরূপমব্যয়ম্" বলিয়া শ্রুতি চিরদিনই নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। কর্ম্মের দেবতা আমাদের ইন্দ্রিয়পথের পথিক হন, জ্ঞানের দেবতা আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্তায় চিরদিনই আমাদের অধিকার-পথের বাহিরে থাকিয়া যান। কর্ম্মের দেবতা যজ্ঞভূমে অধিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, জ্ঞানের দেবতা সর্ব্বকর্ম্ম বিনির্লিপ্ত উদাসীনের ন্তায় চিরবিরাজ করেন। আমাদের স্তুতি—মিনতি—প্রার্থনা কাতর ক্রন্দন কর্ম্মের দেবতাই শুনিতে পান। আমাদের মরমের বেদনা তাঁহাকে বলিতে পারি, কেননা, তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন। এই দীন দুঃখীদের দুঃখ বার্ত্তা তাঁহার দরবারে পৌঁছিতে পারে; কেননা, তিনি যে অন্তর্যামী। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় কাতর হইয়া যখন কোথাও শান্তি পাই না, তখন মরমের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহারই কাছে আবদার করিয়া বলিতে পারি,—

"কাঙ্গালের ধন। কোথা তুমি।
একবার এসে দেখ নাথ। কি দুখে দিন কাটাই আমি।
হৃদয়েরই তাপানলে অহরহ ম'লাম জ্বলে,
অন্তে কি জানিতে পারে জ.নহ তুমি হৃদয় স্বামী॥"

প্রাণের অন্তস্তল হইতে এ গভীর গুহ্য-গাথা তাঁহারই কাছে নিবেদন করিতে পারি, যিনি আমাদের এ মর্ম্ম-ব্যথা বুঝিতে পারেন, কিন্তু যিনি অবাঙ্মনসগোচর; দয়া, মায়া, স্নেহ, করুণা আদি গুণের কণামাত্রও যাঁহাতে নাই, আবিদ্যিক জগতের কোন কথাই যাঁহার গোচরীভূত হয় না, হউন তিনি যোগীশ্বর,

হউন তিনি • জ্ঞানীর কাছে চিন্ময় জ্ঞানমূর্ত্তি, তাঁহাকে লইয়া আমাদের প্রয়োজন কি ? যাঁহার জ্বলন্ত জ্ঞানাগ্নি-শিখায় মনঃ-প্রাণ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাঁহাকে আমরা চাহি না। যাঁহার পরম প্রেমময় চিরসুন্দর মাধুরীচ্ছটায় স্নাত হইয়া চিরদিনের তাপিত জীবন সুশীতল হইয়া উঠে, আমরা তাঁহারই চরণে শরণ চাই। যিনি ক্ষুধায় মা অন্নপূর্ণা, রোগের সময়ে বাবা বৈদ্যনাথ, দারুণ বিপদে দুর্গা দুর্গতিহরা, প্রার্থনার সময়ে যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, আমরা তাঁহারই শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে চাই। যিনি দীন দুঃখীর কুটীরে রাজরাজেশ্বরী রূপে আবির্ভূত হন, শরণাগত সন্তানের পাপতাপময় কালি ঝুলি মাখা অঙ্গ ধুয়াইয়া মুছাইয়া নিজ ক্রোড়ে স্থান দেন, আর্ত্তপীড়িত ভক্তের মর্ম্মভেদী চীৎকারে যাঁহার সিংহাসন টলিয়া উঠে, সেই কর্ম্ম, ভক্তি ও উপাসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই আমাদের ভরসাস্থল। আমাদের মত মায়া-বিমুগ্ধ জীবের পক্ষে অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়াই যাঁহার লীলা, তিনিই অবলম্বন।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, কর্ম্ম আমাদের চির সহচর বন্ধু। যদি কর্ম্ম আমাদের বন্ধু হয়, তবে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ চাই কেন, কর্ম্ম কেবল পরিশ্রমেই আমাদিগকে নিক্ষেপ করে, কর্ম্ম আমাদের বিশ্রাম সুখের অন্তরায়। এমন শত্রুকে মিত্র বলা যায় কেমন করিয়া? বাস্তবিক কর্ম্ম শত্রু নয়, অদৃষ্ট দোষেই তাহাকে শত্রু করিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহার কর্ম্ম করিবার জন্য এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছি, তাঁহার কথা আমরা ভুলিয়া যাই, ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার কর্ম্মকে নিজের কর্ম্ম বলিয়া মনে করি। ইহাই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। তাই একজন সাধক বলিয়াছেন,—

"যার কর্ম্ম সে করায় মা।
লোকে বলে করি আমি।"

"আমি করি," এই যে আমিত্ব-মাখা কর্ম্ম, ইহাইত বন্ধনের কারণ, ইহাইত জন্ম জন্মান্তরের হেতু। আমিত্বের ভার টুকু তাঁহার উপর ফেলিতে পারিলে আর ত কোনও জঞ্জালই থাকে না। যন্ত্র পরিচালিত হয়, পরিচালকের বলে। সুতরাং পরিচালনের উপর যন্ত্রের কোন দাবি দাওয়া নাই। যন্ত্র মনে করিতে পারে না যে, পরিচালন তাহার নিজস্ব। সেইরূপ জীবের আত্ম-যন্ত্র যে যন্ত্রাধিষ্ঠাতার অনুপ্রেরণে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতেছে, সেই কর্ম্মের উপর যন্ত্রাধিষ্ঠাতারই আধিপত্য—দাবি-দাওয়া হইতে পারে, জীব তাহাকে নিজস্ব মনে করিয়া বৃথা ভ্রান্তিসাগরে ডুবে কেন? যাত্রার দলে বেহালাদার যে সুর দেয়, সেই সুরে সুর মিশাইয়া যাত্রার বালকগণ যেমন গান গাহিয়া যায়, সেইরূপ জীবের অন্তর্জগতে বসিয়া কে যেন মোহন সুরে হৃদয়-তন্ত্রী বাজাইতেছে। জীব সেই সুরে সুর মিশাইয়া এই সংসারক্ষেত্রে গান গাহিতে আসিয়াছে মাত্র। সেই সুরের তাল লয় মানের ঠিক বেঠিকের জন্য তিনিই দায়ী, যিনি সুর দিতেছেন। তাহার জন্য নিন্দা বা প্রশংসা আদি ফলাফল তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া, জীব তাহা হইতে স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে না কেন? কেন জীব সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ। হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

"হৃষীকেশ! হৃদয়ের অন্তর্যামী দেবতা তুমি, আমায় যেমন পরিচালন করিতেছ, আমি সেইরূপ পরিচালিত হইতেছি।"

সুধু মুখের কথায় নহে, হৃদয়ের নিভৃততম কেন্দ্রস্থল হইতে ঐ কথা যদি বলিতে পার, তবেই তুমি প্রকৃত কর্ম্মী। আহার, বিহার, শয়ন স্বপন ভোজনাদি জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে তাঁহার নিদেশ স্বরূপ মনে করিলে কর্ম্ম আর বন্ধনের হেতু হয় না। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা ভগবচ্চরণে অর্পিত হইলে তাহা যেমন জীবের মঙ্গল-হেতু হয়, সেইরূপ জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিলে, জীবকে আর বন্ধন-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যিনি প্রকৃত কর্ম্মী, তিনি কর্ম্ম রাশি-রূপ পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার চরণ তলে উপহার দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে থাকেন,—

> "জপোজল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রা বিরচনং-
> গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
> প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা
> সপর্য্যা পর্য্যায় স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতং॥"

জননি। আমি সংসার মধ্যে যখন যে কর্ম্ম করিব, তৎসমুদায়ই যেন তোমার অর্চ্চন স্বরূপ হয়। আমি যে কোন কথা কহিব, তাহা তোমার জপ স্বরূপ, আমি যখন যেরূপ অঙ্গসঞ্চালন করিব, তৎসমুদায়ই তোমার মুদ্রা বিরচন স্বরূপ, আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা তোমাকে প্রদক্ষিণ করা স্বরূপ, আমি যখন যাহা ভোজন বা পান করিব, তৎসমুদায় তোমার উদ্দেশে আহুতি প্রদান স্বরূপ, আমি যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম স্বরূপ, এবং আমার নিখিল শক্তি-সংযোগ-জনিত সুখ আত্মার্পণ-স্বরূপ হউক।

ইহাই প্রকৃত কর্ম্মীর ভাষা। এইরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে

জীবকে আর জন্ম জন্মান্তরের দারুণ ভাবনা ভাবিতে হয় না। যিনি তাঁহার উপার্জ্জিত কর্ম্মরাশি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার কল্যাণের ভাবনা ভাবিবেন। উপযুক্ত পুত্র যখন অর্থো পার্জ্জন করিতে শিখে, তখন সে তাহার উপার্জ্জিত অর্থরাশি মায়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, মাতা সেই অর্থগুলি লইয়া যাহাতে তাহারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হয়, তাহারই ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজের জন্য তাহা খরচ করেন না। সেইরূপ কৃতী পুত্র সংসারে যাহা কিছু শুভ কর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, তৎ-সমস্তই ফলাশাবিবর্জ্জিত হইয়া জগন্মাতার চরণে অর্পণ করেন। তিনি সেইগুলি লইয়া যাহাতে তাঁহারই পারত্রিক কল্যাণ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করেন, নিজে তাহা আত্মসাৎ করেন না, এইরূপ অশুভ কর্ম্মও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলে অমঙ্গল-প্রসূ হয় না। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে গীতায় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

অর্জ্জুন! কর্ম্মেই তোমার অধিকার। ফলে নহে। তাই বলি-তেছি, জীব! কর্ম্ম করিতেই ইহ জগতে আসিয়াছ, কর্ম্ম করিয়া যাও, ফলের ভাবনা তিনি ভাবিবেন। ফলের ভাবনার ভার তুমি নিজ স্কন্ধে লইলে তাঁহার সাহায্য আর পাইবে না। এই নিষ্কাম পরিশ্রমই, জীব! তোমার চির-বিশ্রাম-হেতু।

শিবলিঙ্গ-পূজা অশ্লীল কি না?

আজ কালিকার ইংরাজী শিক্ষিতাভিমানী নব্য বাবুরা শিব-লিঙ্গ-পূজাকে বড়ই হেয়তার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শিবলিঙ্গ-পূজার একটা বিকট অশ্লীলতাময় চিত্র লইয়া লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে চাহেন, কিন্তু ইহা যে তাঁহাদের কতদূর ভ্রান্তি, তাহাই এই প্রবন্ধে বিচার করা যাইতেছে। আলোকপ্রাপ্ত বাবুরা বলিয়া থাকেন "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ"। সুতরাং একেত তাঁহারা ঈশ্বরের আকারবিশিষ্ট মূর্ত্তিকে পূজা করিতেই অসম্মত, তার উপর আবার শাস্ত্র বলিতেছেন,—

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসোবাঽপি কর্ত্তনং।
অনভ্যর্চ্চ্য ন ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনং॥
প্রত্যহং পরমেশানি। যাবজ্জীবং ধরাতলে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

অগ্নিহোত্রশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহু দক্ষিণাঃ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ॥
অনেক জন্ম সাহস্রাং ভ্রাম্যমানশ্চ যোনিষু।
কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চ্চনং নরঃ॥
যে বাঞ্ছন্তি মহাভোগান্ রাজ্যং বা ত্রিদশালয়ং।
তেঽর্চ্চয়ন্তু সদা কালং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরং॥

স্কন্দ পুরাণ।

জীবন বিনাশই হউক বা শিরঃকর্ত্তনই হউক, ভগবান্ মহাদেবকে পূজা না করিয়া কদাচই ভক্ষণ করিবে না। প্রিয়ে!

সমস্ত প্রাণীই পরম ভক্তিসহকারে পরমারাধ্য শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। (শিবোক্তি) অগ্নিহোত্রই কর, যত্নসহকারে ত্রিবেদই অধ্যয়ন কর, অথবা যাগযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, ইহা দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজার কোটী অংশের এক অংশও ফল পাইবে না।

সহস্র সহস্র যোনি জন্মগ্রহণ করিয়া শিবলিঙ্গার্চ্চনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি দুর্ল্লভ মুক্তিপদ পাইতে সমর্থ হয়? যাহারা মহা-সুখভোগ, রাজ্য বা স্বর্গকামনা করে, তাহারা সর্ব্বদা লিঙ্গরূপ মহেশ্বরের পূজা করুক।

বর্ত্তমান শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষালোকপ্রাপ্ত নব্য সভ্য মানব শাস্ত্রের বচন হয় ত অশ্লীলতাপূর্ণ বলিয়া বোধ করিতে পারেন। তাঁহাদের মতে মহাদেব হয়ত অসভ্য বন্য জীব বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন। কেননা তাঁহার মস্তক, হস্ত, পদ থাকিতেও তিনি লিঙ্গকে পূজায় ব্যবহৃত করিয়াছেন্। মহাদেবের গর্হিত কার্য্যের জন্য অনেক লোকের মুখে আমরা কত কথাই শুনিয়াছি, কতই অশ্লীলতাময় উপহাসবাণী তাঁহা-দের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে। যাহা হউক তাঁহাদের সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আবশ্যক বোধে শিবলিঙ্গ পূজার রহস্যভেদ করিতে চেষ্টা করিব।

অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনন্ত-গুণগরিমার পরিচয় জানিতে হইলে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র ব্যাপা-রের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে যদি তাঁহার শিল্প-চাতুরী না দেখিতে পাইতাম, প্রতি মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার অলৌকিক কার্য্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী পত

পত রবে না উড়িত, জলে, স্থলে, ব্যোমে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল যদি না দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে এ কঠোর চিত্ত তাঁহার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইত কি না সন্দেহ স্থল। এই নির্ম্মল সুনীল আকাশ ছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে নিবিড় নীরদে তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল, এখনি এই গগনের ক্রোড়দেশে পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্না-তরঙ্গে অপূর্ব্ব শোভা উথলিয়া উঠিতেছিল, এই ঘোর গভীর ঘনান্ধকারে তাহা ডুবিয়া গেল, এই নিস্তরঙ্গ বিশাল সমুদ্র নীরবে বহিতেছিল, কিন্তু কি জানি কাহার আজ্ঞায়, উত্তাল তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া ভয়ানকত্বের পরিচয় প্রদান করিতে করিতে-উধাও প্রাণে মাতোয়ারা হইয়া প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। এই যে আকস্মিক ব্যাপার রাশি প্রতি-নিয়ত মনুষ্যের অজানিত কারণে সম্পন্ন হইতেছে, ইহা কাহার দ্বারা হইতেছে? একমাত্র জগৎপাতার কার্য্যকৌশল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডের প্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহার অপার মহিমা, তাঁহার স্বরূপ ও প্রকৃতিবোধের সুগমতা হইতে পারে। এই ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃততঃ পরমেশ্বরের বিভূতির জ্ঞাপক ও বোধকস্বরূপ বা "লিঙ্গ" বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বরের মায়ায় যদিচ এরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে এবং একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অনন্তশক্তির ইয়ত্তা করা যায় না, তথাচ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার মহিমার এই ক্ষুদ্র ইঙ্গিতেই তাঁহার অনন্তশক্তির পরিচয় পাইয়া থাকেন।

শাস্ত্রে লিঙ্গ শব্দে*শিবের মেঢ্র বলিয়া উল্লিখিত হয় নাঁহি; লিঙ্গ তাঁহার বিভূতিপ্রকাশক মূর্ত্তিবিশেষ মাত্র।

লিঙ্গং শিবস্ত মূর্ত্তিবিশেষঃ। ইতি মেদিনী।
শিবলিঙ্গং শিব এব, নতু শিবস্ত শিশ্নঃ॥

"শিবলিঙ্গ" শিবের শিশ্ন নহে—শিবের জ্ঞাপক মূর্ত্তিবিশেষ। এই পরমারাধ্য শিবস্বরূপকে অর্থাৎ শিবের বিভূতিবোধক বিরাট মূর্ত্তিকে (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।) ভক্তিসহকারে পূজা করিলে জীবের ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্রেক হয়। এই ব্রহ্মময় ভাবকে (লিঙ্গ) প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ হৃদয়ের ধন করিয়া, প্রাণের প্রাণ করিয়া, অন্তরে বাহিরে, কেহ শিলায়, কেহ মৃত্তিকায় কেহ বা বহুমূল্য স্ফটিক আদিতে শিবলিঙ্গ রচনা করিয়া, এক মনে, এক ধ্যানে তাঁহারই পূজা করিতেন। অকপট ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই গঠিত শিবলিঙ্গের সেবা করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতেন। তাই বলি শিবলিঙ্গ একটা অশ্লীলতাময় রুচিবিরুদ্ধ বিকট পদার্থ বলিয়া ঘৃণার যোগ্য নহে। এই লিঙ্গই (শিবের জ্ঞাপক) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এবং ইহার গৌরীপট্ট বা বেদিকা, ভগবন্মায়া বা প্রকৃতি। এই মায়া হইতে উৎপন্ন ও মায়ার আশ্রিত অখণ্ড চিহ্নই দেবাদিদেব মহাদেবকে জানিবার একমাত্র উপায়।

"অলিঙ্গঃ শিব ইত্যুক্তো লিঙ্গং শৈবমিতি স্মৃতং"
লিঙ্গ পুরাণ।

লিঙ্গপুরাণ বলিতেছেন বিশুদ্ধ পরমাত্মা "লিঙ্গ" নামক কোন নরীয় চিহ্ন নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের অনুমাপক বা বিজ্ঞাপক চিহ্ন অর্থাৎ বিরাটমূর্ত্তিই লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। ভগবান্

সাংখ্য সূত্রকারও মহত্তত্ত্ব আদি সমস্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে, "লিঙ্গ" সংজ্ঞা দিয়াছেন, যথা—

"হেতু মদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং"

অ, ১ সূত্র, ১২ ॥

যাহার কোন কারণ আছে, যাহা অনিত্য, অব্যাপক, ক্রিয়াবান্ অনেক ও অন্যের আশ্রিত তাহার নাম "লিঙ্গ"।

কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারায় বুঝাইয়া দিতেছি। যেমন ভৌগোলিক মানচিত্রের মুদ্রিত চিহ্নের দ্বারায় নদ, নদী, পর্ব্বত পাহাড়াদির জ্ঞান হয়, কেন না, সেই গুলি নদ নদী জ্ঞাপক। মানচিত্র স্বরূপতঃ চিহ্ন হইয়া দর্শকের মনে যেমন নদ নদীর সদ্ভাব-জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ শিবলিঙ্গও ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় জন্মাইয়া দিয়া থাকে। ভূগোল ভিন্ন যেমন ম্যাপের চিত্রগুলি বুঝিতে পারা যায় না, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ভিন্নও শিবলিঙ্গ আদির তত্ত্ব অবগত হওয়া কঠিন।

উপসংহার কালে আমরা লিঙ্গপুরাণের উক্তির সঙ্গে বলিতেছি যে—

বহুনাত্র কিমুক্তেন চরাচরমিদং জগৎ।
শিবলিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য স্থিতমত্র ন সংশয়ঃ॥

আর কি লিখিব, সমস্ত জগৎ শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়াই স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুত্থান। *

বড আহ্লাদের কথা, বর্ত্তমান ভাবতবর্ষে বহুদিন পরে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্লাবিত দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি লোকের দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতেছে, হিন্দুর পক্ষে ইহা বড়ই আশার কথা। অমানিশার ঘোব অন্ধকারে ভাবতের যে জাতীয় উন্নতির পূর্ণচন্দ্রমা আচ্ছন্ন হইয়া পডিতেছিল, এক্ষণে তাহার বিমল কৌমুদিচ্ছটা ধীরে ধীরে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে, এ দৃশ্য দর্শনে কোন্ হিন্দুব প্রাণ না আনন্দে নাচিয়া উঠে? আয়ুর্ব্বেদ হিন্দুব জাতীয় সম্পত্তি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হিন্দুর জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল চিকিৎসা। এমন সাধেব সর্ব্বস্ব ধন ভারতের জার্ণ শীর্ণ পর্ণকুটীরের গুপ্ত কক্ষে মলিনবেশে লুক্কায়িত ছিল, এতদিন পরে সেই গুপ্ত কহিনুর নবনধর জলন্তবেশে পুনরায় শোভায় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর পক্ষে ইহা বডই ভরসাব কথা। দীন দুঃখী ভারতের গৌরব করিবার সামগ্রী, প্রাচীন শাস্ত্র রাশি ছাডা আর কিছুই নাই। ভারতের সে প্রতাপ, সে প্রভাব, সে শৌর্য্যবীর্য্য, আর্য্যজাতির সে মহত্ত্ব, এক্ষণে কেবল স্মৃতির অন্তরালে বিরাজ করিতেছে। ভাবতের পূর্ব্ব গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। অবনতির সায়াহ্নকালে

* এই বক্তৃতাটি ২৫শে চৈত্র রবিবার ১৩০১ সালে এলবার্ট হলে কবিরাজ শ্রীভূদেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

ভারতের বিষাদ—তিমিরাচ্ছন্ন মুখ মণ্ডলে কেবল নৈরাশ্যের পৈশাচিকী মূর্ত্তি বিকট তাণ্ডবে নৃত্য করিতেছে। ভারতেব এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারতেব জাতীয়শাস্ত্র জাতীয়বিদ্যার পুনরুত্থান-সংবাদে কোন্ স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু আনন্দিত না হইবেন। দুঃখের দিনে সুখের আশ্বাসবাণী জগতে যত মধুর, এমন আর কিছুই নাই। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে আশার ক্ষুদ্র দীপ-শিখাও যদি প্রজ্জ্বলিত হয়, ত, তাহার মত আনন্দেব কথা আব নাই। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের চারিদিকেই দুঃখ দুরবস্থার জ্বলন্ত চিতানল সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত হইতেছে, এ দুর্দ্দিনে বিন্দুমাত্রও সুখের শান্তি-সলিল লইয়া যিনি উপস্থিত হন, দেশবাসীর পক্ষে তিনি নিশ্চ।ই কৃতজ্ঞতাভাজন। দুঃখের দিনে সুখের স্বপ্নও যদি দেখিতে পাওয়া যায়'ত, তাহাও প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমানকালে ভারতে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুত্থান যদি সুখের স্বপ্ন বলিয়াও বিবেচিত হয়, তবে তাহাও হিন্দুর পক্ষে অপ্রার্থনীয় নহে।

ইহকাল পরকাল লইয়াই হিন্দুর অস্তিত্ব। শরীর ও আত্মা এই দুইটি জিনিষের উন্নতি সাধন করাই হিন্দুর চরম লক্ষ্য। হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্র দেহকে ধ্বংস করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিতে বলেন না। আবার আত্মার ধ্বংস করিয়া দেহের উন্নতি সাধন করিতেও বলেন না। শরীর ও আত্মার পরস্পর অবি-রোধিভাবে যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই হিন্দুর প্রার্থনীয়। তাই আত্মার ব্যাধি আদি (অবিদ্যা আদি) বিনাশের জন্য হিন্দুর যোগশাস্ত্র যেমন বিহিত হইয়াছে, তেমনই শরীরের ব্যাধি বিনাশের জন্য হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে। আত্মার

স্বাস্থ্যের জন্য যোগশাস্ত্র বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রয়োজন, আবার দেহের স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদের পবিত্র ধাতুঘটিত ঔষধে হিন্দুর সাত্ত্বিকী প্রকৃতি রক্ষিত হইয়া চিকিৎসা হইয়া থাকে, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হিন্দুর জাতীয় প্রকৃতির পরিপোষক চিকিৎসা। বিজাতীয় বিদেশীয় ঔষধে হিন্দুর সাত্ত্বিকী প্রকৃতিকে মলিন করিয়া, তামস ভাবাপন্ন করিয়া দেয়, সুতরাং বিজাতীয় ঔষধ হিন্দুর সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। হিন্দু আর্য্যসন্তান। তিনি এই ভারতবর্ষকে কর্ম্ম ক্ষেত্র মনে করেন। এই কর্ম্মক্ষেত্রে ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে যাহাতে হিন্দু সুখী হইতে পারেন, তাহার সদ্ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতেই হইবে। যাহাতে শারীরিক উন্নতি, হিন্দুর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক না হয়, হিন্দুকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হিন্দু প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু প্রাণের প্রাণ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মুমূর্ষু হিন্দু মৃত্যু-কালে সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শান্তচিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন! হিন্দুর এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস, এই ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট করা যদি জাতীয় উন্নতির নিদান বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে হিন্দুর গৃহে গৃহে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রচলন করিতে হইবে। হিন্দুর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী সুধার প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।

স্বদেশীয় ঔষধ স্বদেশীয় শারীর প্রকৃতিতে যেমন কার্য্যকারী হইতে পারে, বিদেশীয় ঔষধে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিদেশের স্থানীয় প্রকৃতি অনুসারে সেখানকার শারীরিক অবস্থা

স্বতন্ত্র। তাদৃশ শারীরিক প্রকৃতির অনুকূল ঔষধাদিও স্বতন্ত্র। তাহা ভারতবাসীর পক্ষে খাটিবে কেন? প্রকৃতি যে দেশের জন্য শরীর ধারণোপযোগী মালমসলার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অন্য দেশে চালাইতে গেলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়। প্রকৃতি যাহা ইঙ্গিত করিতেছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে জীব সুখী হইতে পারেন। প্রকৃতির নিদেশ-বাণী অমান্য করিলে, প্রাকৃতিক শাস্তির কঠোর কশাঘাতে নিশ্চয়ই পীড়িত হইতে হইবে। তাই দেখিতে পাই, বিদেশীয় ঔষধ সেবনে ভারতবাসী প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। বিদেশীয় উগ্রবীর্য্য ঔষধ ভারতবাসীকে নিস্তেজ করিয়া তুলিতেছে। ভারতবাসী বিদেশীয় ঔষধ সেবনে অল্লায় হইয়া পড়িতেছেন। বিদেশীয় ঔষধে যে কিছুমাত্র উপকার হয় না, এমন কথা বলিতেছি না। বিদেশীয় ঔষধে রোগীর রোগ হয় ত কিছুদিনের জন্য উপশান্ত থাকিল, আবার কিছুদিন পরে পুনরায় হয় ত ফুটিয়া বাহির হইল। হয় ত বিদেশীয় ঔষধে একটা রোগ আরাম করিয়া আবার অন্য একটা উৎকট রোগের সৃষ্টি করিল। হয় ত বিদেশীয় ঔষধে কিছুক্ষণের জন্য রোগীর রোগ আরাম হইল বটে, কিন্তু চিরদিনের জন্য তাহার শারীর প্রকৃতি এমনই দূষিত হইয়া গেল, এমনই বিকৃত অসাড় হইয়া গেল, যে তাহাতে আর কোন প্রকার ঔষধের ক্রিয়া হইবে না। যেমন কোন ব্যক্তি অজীর্ণ ব্যাধি সারিবার জন্য আফিং খাইতে অভ্যাস করিল, তাহাতে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য উক্ত ব্যাধি নিবৃত্ত থাকিল বটে, কিন্তু আফিং বিষে তাহার শরীর জর্জ্জরিত হইয়া গেল। আফিং সেবনের জন্য, তাহার

শরীরে একটা উৎকট বিকার জন্মিয়া গেল। সেইরূপ বিদেশীয় ঔষধে কিছুদিনের জন্য ব্যারামের উপকার হয় বটে, কিন্তু উহা অহিফেনের মত ভারতবাসীর শারীর প্রকৃতিকে দূষিত করিয়া তুলে। যেমন দৃষ্টান্ত দেখুন, বিদেশীয় কুইনাইন ঔষধে জ্বর কিছুদিনের জন্য আরাম হয় বটে, কিন্তু কুইনাইন বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া, শরীরকে বিকৃত করিয়া তুলে। তাই আজকাল কুইনাইন সেবনের জন্য অনেককে শিরোরোগ, উদরাময় ও ধাতুদৌর্ব্বল্য আদি রোগে আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শারীর প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া যে চিকিৎসা সম্পন্ন হয়, তাহা প্রকৃত চিকিৎসা নহে। যে চিকিৎসা শারীরপ্রকৃতিকে স্বভাবাবস্থায় রাখিয়া শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে, তাহাই প্রকৃত চিকিৎসা, ভারতের সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা, এই প্রকৃত চিকিৎসা বলিয়াই উহা ভারতের পক্ষে গৌরবের সামগ্রী। আয়ুর্ব্বেদের সহস্রপুটিত লৌহ জ্বরের যেমন মহৌষধ, কুইনাইন তাহার শতাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। সহস্রপুটিত লৌহ সেবনে যে জ্বররোগীর জ্বর আরাম হয়, সে জ্বরের আর পুনরুত্থান হয় না। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ অত্যাচার হইলেও সে জ্বর আর জাগ্রত হয় না। কিন্তু কুইনাইনে যে জ্বর আরাম হয়, তাহা আট্‌কাইয়া যায়, কিছুদিন সে জ্বর উপশান্ত থাকে। পুনরায় তাহা ফুটিয়া উঠে। যেমন কোন স্থালীর ভিতর বিষধর সর্প আবদ্ধ থাকিলে, সেই স্থালীর মুখের আবরণটি খুলিলেই পুনরায় সর্প গর্জ্জিয়া উঠে, সেইরূপ কোন গতিকে শারীরিক স্বাস্থ্যনিয়মরূপ আবরণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই, কুইনাইন-চাপা জ্বর দ্বিগুণ তেজে রোগীর শরীরে গর্জ্জিয়া উঠে।

সহস্রপুটিত লৌহ সেবনে জ্বররোগীর জর আরাম হইয়া, শরীর সুস্থ ও সবল হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়। কুইনাইন সেবনে জব আবাম হইয়া, রোগীর মাথাঘোরা, নাসিকা হইতে রক্ত পতন, পেটের ব্যারাম, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্থলবিশেষে সঙ্গম শক্তির হীনতা, ইত্যাকার নানাবিধ বিকারে দেহকে বিকৃত করিয়া তুলে। কুইনাইনের দোষ সম্বন্ধে ইংরাজ ডাক্তার সিড্নি রিঙ্গার কি বলিতেছেন দেখুন ;—

These Alkaloids if too long employed disorder the stomach producing heat and weight at the epigastrium loss of appetite nausea sickness and even diarrhoea.

ভাবার্থ।—কুইনাইন অধিক দিন সেবন করিলে, উদরের গোলযোগ প্রভৃতি তলপেটের উষ্ণতা ও ভাববোধ, ক্ষুধামান্দ্য, গা বমি বমি, সর্ব্বদাই পীড়িত বোধ, এমন কি প্রবল উদরাময় উপস্থিত হয়।

আর আমাদের সহস্র পুটিত লৌহের গুণ সম্বন্ধে মহর্ষি ধন্বন্তরি কি বলিতেছেন দেখুন ,—

আয়ুঃ প্রদাতা বল বীর্য্য কর্ত্তা,
রোগাপহর্ত্তা মদনস্ত কর্ত্তা,
অয়ঃ সমানং নহি কিঞ্চিদস্তি
রসায়নং শ্রেষ্ঠতমং নরাণাং।

জারিত লৌহের মত শ্রেষ্ঠতম রসায়ন আর নাই। ইহা আয়ু, বল, বীর্য্য, রতিশক্তি, সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি করে। এবং নানাবিধ রোগের ইহা বিনাশক।

পুরাতন জ্বরে লৌহ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন ঘুস্‌ঘুসানি আদি জ্বর বিনষ্ট করিতে লৌহের অদ্ভুত ক্ষমতা। কবিরাজী লৌহ ঘটিত বটিকা ঔষধ তুমি খলে মাড়িয়া খাও, শীঘ্রই তোমার প্লীহা যকৃৎ কমিয়া যাইবে। এক বিন্দু বটিকা তোমার প্রকাণ্ড প্লীহাকে কমাইয়া দিবে। কিন্তু ইংরাজী "ব্লীষ্টার" আদি উৎকট ব্যাপারেও, তুমি শীঘ্র সে ফল পাইবে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, কবিরাজী ঔষধে আশু ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহা নিতান্তই ভুল। ইংরাজী একোনাইট্, আর্স-নিক ঘটিত ঔষধে যেমন নবজ্বর শীঘ্র আরাম হয়, আমাদের কবি-রাজী শোধিত মিঠা বিষ, হরিতাল আদি ঘটিত ঔষধেও সেইরূপে নবজ্বর শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। তবে ইংরাজী ঔষধ অপেক্ষা দেশীয় ঔষধে এই টুকু গুণ, যে, ইংরাজী ঔষধে জ্বর চাপা থাকে, তাহার পুনরুত্থান হয় এবং শারীর প্রকৃতি দূষিত করে। কিন্তু দেশীয় ঔষধে যে জ্বর একবার সারিয়া যায়, তাহার আর পুন-রুত্থানের আশঙ্কা থাকে না। এবং শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমি একজন নিজে কবিরাজ। ৺কাশীধাম হইতে বেদ বেদান্ত দর্শন আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, সম্প্রতি কলিকাতায় বিগত কয়েক বর্ষ ধরিয়া চিকিৎসা করিতেছি। আমি নিজের অভিজ্ঞতানুসারে বলিতেছি, নবজ্বরে কবিরাজী "স্বচ্ছন্দ ভৈরব" "বেতাল" আদি ঔষধ ব্যবহার করিয়া এত শীঘ্র আমি আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছি, যে, তাহা আশাতীত। কবিরাজী ঔষধে নবজ্বর শীঘ্র আরাম হয় না, যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার আমাদিগের ঔষধ ব্যবহার করিতে বলি।

বর্ত্তমান কালে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনেক মালমসলা বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র নীরবে আত্মসাৎ করিতেছেন। অনন্ত মূলের এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট, জোয়ানের টিঞ্চার, সোনাপাতার টিঞ্চার, আদার স্বত্ব যাহাকে ইংরাজিতে জিঞ্জার বলে, এমন কি সুবর্ণের টিঞ্চার পর্য্যন্ত নানাবিধ ঔষধের উপকরণ-রাশি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুকরণে গৃহীত হইয়া বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ঔষধাকারে পরিণত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আয়ুর্ব্বেদ হইতে এই সমস্ত জিনিষ গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উপর ইঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক, বরং আয়ুর্ব্বেদকে কুসংস্কারময় হাতুড়ের শাস্ত্র বলিয়া ইঁহারা নিন্দা করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ হইতে এই সমস্ত জিনিষ ইঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথাটিও আমাদের বলিবার যো নাই। তাহা হইলে তাঁহারাই বরং বলিবেন, আয়ুর্ব্বেদই আমাদের নিকট এই সমস্ত জিনিষ লইয়াছেন। ইঁহাদের ব্যাপার দেখিয়া একটা গল্প মনে হইতেছে। কলিকাতার রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ নামক দুই জন জুয়াচোর পরামর্শ করিল, যে কলিকাতার লোকে এক্ষণে সকলেই প্রায় চালাক চতুর হইয়াছে। সুতরাং বাজার খারাপ হওয়ায় এখানে আর আমাদের জুয়াচুরি ব্যবসা চলিবে না। অতএব মফঃস্বলে এখন যাওয়া যাক। এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া তাহারা বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমানের বড় রাস্তার ধারে যে খাবারের দোকান গুলি আছে, তাহারই মধ্যে একটি ভাল দোকান বাছিয়া জুয়াচোরদ্বয় তথায় আড্ডা গাড়িল। জুয়াচোরদের একটা পয়সাও সম্বল নাই, সঙ্গে একটা ছাতা বা একটা ঘটিও নাই,

অথচ এই নিঃসম্বলে দোকানে পেট ভরিয়া মিষ্টান্নাদি খাবার খাইতে হইবে এবং সেইখান হইতে কিছু সম্বলও করিয়া লইতে হইবে। তাহারা পরস্পর উপায় ঠিক করিয়া লইল। প্রথমে রামচাঁদ দোকানের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দিব্য ভদ্র লোকটির মত দোকানীর নিকট হইতে খাবার লইয়া খাইতে বসিয়া গেল। পরে শ্যামচাঁদও গিয়া সেইরূপ আরম্ভ করিল। দুই জনে যেন কিছু মাত্র জানা শুনা নাই, এইরূপ ভাব তাহারা দেখাইতে লাগিল। রামচাঁদ অগ্রেই খাবার খাওয়া শেষ করিয়া সেই খানেই বেশ করিয়া মুখ হাত ধুইল। চাদরটি কাঁধে ফেলিয়া রামচাঁদ দোকান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল। তখন দোকানদার রামচাঁদের হাত ধরিয়া বলিল, আপনি খাবারের পয়সা না দিয়াই যে চলিয়া যাইতেছেন? এ আপনার কিরূপ ব্যবহার? খাবারের পয়সা দিন। রামচাঁদ যেন তখন অবাক্ হইয়া বলিল, সে কি মশায়! এই যে কড়ায় গণ্ডায় আপনার পয়সা চুকাইয়া দিলাম। আপনিও ত গুণিয়া বাক্সে তুলিলেন। পুনরায় পয়সা চাহিতেছেন এ কিরূপ আপনার ভদ্রতা? এইরূপ দুইজনে ঝগড়া চলিতে লাগিল। গোলমাল দেখিয়া পুলিশ জমাদার তথায় উপস্থিত হইল। দোকানী বলিল, দেখুন জমাদার সাহেব! এই লোকটা আমার খাবার খাইয়া পয়সা না দিয়া পলাইতেছে। ইহাকে আপনি পুলিশে চালান দিউন। ভদ্রবেশধারী রামচাঁদ বলিল, দোকানি! তুমি মুখ সামলাইয়া কথা কহিও! জমাদার সাহেব! আপনি দেখিতেছেন, আমি একজন ভদ্রলোক। খাবার খাইয়া আমার মত ভদ্রলোকের পয়সা না দেওয়া কি সম্ভব? কড়ায় গণ্ডায় এই মাত্র পয়সাগুলি

চুকাইয়া দিলাম। তথাপি ফের পয়সা চাহিতেছে। মহাশয়! এমন জুয়াচোরের হাতে কখনও পড়ি নাই। ওঃ। আপনাদের কি জুয়াচোরের দেশ। তখন দোকানদার শ্যামচাঁদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, জমাদার সাহেব! এই ভদ্রলোকটি ত অনেকক্ষণ বসিয়া আমার দোকানে খাবার খাইতেছেন, এবিষয়ে উঁহাকে আমি সাক্ষী মানিতেছি, উনি পয়সা দিতে এই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে আপনি উঁহার সাক্ষ্য লউন। তাহা হইলেই কাঁহার কথা সত্য, আপনি জানিতে পারিবেন। তখন জমাদার শ্যামচাঁদকে বলিল, কেমন মহাশয়। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন? তখন শ্যামচাঁদ খাবার খাওয়া শেষ করিয়া গুরু-গম্ভীরভাবে বলিল, মহাশয়। আর বলিব কি? দেখিয়া শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। আমার পেটের ভিতর হাত পা ঢুকিয়া যাইতেছে। এই মাত্র এই ভদ্রলোকটি সমস্ত খাবারের পয়সা চুকাইয়া দিলেন, তথাপি দোকানী পয়সার জন্য জিদ্ করিতেছে, কি ভয়ানক প্রতারণা। আর আমিও মহাশয়। খাবারের সমস্ত পয়সা দোকানীকে মিটাইয়া দিয়া বসিয়াছি, পাছে এখন দোকানী পুনরায় আমাকেও বলে "পয়সা দাও" আমি তাহাই ভাবিতেছি। 'এমন জুয়াচোর দোকানদার ত কোথাও দেখি নাই। এই বলিয়া শ্যামচাঁদ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিল। সেইখানে দোকানীর একটা ছাতা পড়িয়াছিল, সেই ছাতাটি হাতে লইয়া শ্যামচাঁদ বলিল, "কিহে দোকানদার। বল এ ছাতাটিও তোমার, এই গাড়ুটি রহিয়াছে, বল এই গাড়ুটিও তোমার, এই বলিয়া শ্যামচাঁদ ছাতা ও গাড়ু উভয়ই অম্লানবদনে আত্মসাৎ করিয়া তথা হইতে স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করিল। জমাদার ব্যাপার বুঝিয়া রামচাঁদকেও ছাড়িয়া

দিল। দোকানীর মাথা তখন সজোরে ঘুরিতেছিল, তাহার উপর জমাদার দোকানীকে বিলক্ষণ ধমক ও প্রহার দিতে লাগিলেন।

এইরূপ অত্যাচার আমাদের আয়ুর্ব্বেদের উপরিও যে না হইতেছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? বিদেশীয় চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদের স্বুবর্ণধাতু ও জোয়ান সোণাপাতা আদি ঔষধের উপকরণ রাশি নীবেব আত্মসাৎ করিয়া বলিতেছেন, বল আয়ুর্ব্বেদ এ স্বুবর্ণটিও তোমার? এ সোণাপাতা আদিও তোমার? দোকানী বেচারার মত আয়ুর্ব্বেদের আর কথাটি কহিবার যো নাই। তাই তাহাব উপব জমাদার সাহেবের অত্যাচাব ও তিরস্কার রাশি শ্রাবণের বারিধাবার ন্যায় অবিবত বর্ষিত হইতেছে।

নানাবিধ কারণে আমাদের দেশে কবিরাজী শাস্ত্রের অধঃপতন হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব যে তন্মধ্যে বিশেষ কারণ, তাহা নিশ্চিত। মূর্খ কবিরাজ দ্বাবা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যে কিরূপ সপিণ্ডীকরণ হইয়াছিল, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বাবা বুঝাইতেছি। কোন একজন আয়ুর্ব্বেদীয় অতি বুদ্ধি ছাত্র নিজগুরুর নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। একজন গৃহস্থ তাঁহার নিজ স্ত্রীর নেত্ররোগের জন্য সেই কবিরাজ মহাশয়কে নিজ বাড়ীতে আহ্বান করিলেন। কবিরাজ মহাশয় রোগিণীর রোগ বিষয় গুরুগম্ভীর ভাবে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য পুঁথি খুলিয়া নিবিষ্টমনে পুঁথির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে নেত্ররোগাধিকারে দেখিলেন, একটি বচন রহিয়াছে "কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ" অর্থাৎ নেত্ররোগীর কর্ণ ছেদ করিয়া কটিদেশে ছেঁকা দিবে। অমনই বিচক্ষণ কবিরাজ গৃহস্থকে বলিলেন, শীঘ্র একটি লৌহশলাকা

অগ্নিতে উত্তপ্ত কব এবং আর একখানি ছুরিকা আনয়ন কর।” গৃহস্থ কিছু ভাব বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, কবিরাজের কথামত তাঁহাকে সমস্ত আয়োজন করিতে হইল। কবিরাজেব কথামত বোগিণীকে শয়ন করান হইল, তখন সেই জলন্ত লৌহশলাকা লইয়া, কবিরাজ সেই স্ত্রীলোকটির কটিদেশ দগ্ধ কবিয়া দিলেন, নিবীহ বোগিণী যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল। কবিবাজ বলিলেন, ব্যারাম কি সহজে সারে?—একটু যন্ত্রণা ভোগ কবিতেই হইবে। এই বলিয়া কবিরাজ পুনবায় তাহার কর্ণদেশের খানিকটা অংশও ছুরি দিয়া কাটিয়া দিলেন। সরল গৃহস্থ বুঝিল, ইহাই বুঝি চিকিৎসা। কবিরাজকে দর্শনী দিয়া গৃহস্থ বিদায় কবিলেন। কবিবাজ বলিয়া গেলেন, এক সপ্তাহ বাদে আসিয়া বোগিণীকে দেখিয়া যাইব। এদিকে বোগিণীর নেত্র-বোগ ত কিছুই আবাম হইল না, ববং কটিদেশে ভয়ানক ক্ষত হইয়া, রোগিণীব অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও খাবাপ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন গৃহস্থ আব একজন বিচক্ষণ কবিরাজকে আনিয়া বোগিণীকে দেখাইলেন। তখন সেই বিচক্ষণ কবিরাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, একি! নেত্ররোগেব জন্য রোগিণীব অঙ্গে ছেঁকা এবং কান কাটিয়া দেওয়া হইল কেন? এরূপ বিচিত্র চিকিৎসা ত কোন শাস্ত্রে নাই, আচ্ছা, তোমার সেই কবিরাজটিকে একবাব আমাব সম্মুখে আনয়ন কর, আমি একবার তাঁহাকে দেখি। কবিরাজ আনীত হইলেন। তখন বিচক্ষণ কবিবাজ তাঁহাকে বলিলেন, মহাশয়! এ কিরূপ অদ্ভুত চিকিৎসা করিয়াছেন? তিনি উত্তর করিলেন, কেন, শাস্ত্রানুসারেইত চিকিৎসা করা হইয়াছে। নেত্র রোগাধিকারের বচন

শুনুন, "কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ।" বিচক্ষণ কবিরাজ বলিলেন, স্বীকার করি, ইহা নেত্র রোগাধিকারের বচন বটে, কিন্তু শাস্ত্রের সেই স্থানটা বাহির করিয়া দেখুন দেখি, তাহা কোন্ প্রকরণ? তাহা ত মনুষ্য প্রকরণ নহে, তাহা যে গো-জাতি প্রকরণ। অর্থাৎ গো-জাতির নেত্ররোগ হইলে, তাহাদের অঙ্গে ছেঁকা এবং কর্ণ কর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনি কি বুলিয়া মনুষ্যের পক্ষে পাশব চিকিৎসা প্রয়োগ করিয়াছেন। তখন সেই অতিবুদ্ধি কবিরাজকে ধরিয়া প্রতিবেশীগণ তাঁহার অঙ্গে ছেঁকা দিয়া ও দুকাণ কাটিয়া সে প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। এইরূপ কবিরাজের দ্বারায় আমাদের আয়ুর্ব্বেদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত গল্প নহে, কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা। আর একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি, শান্তিপুরের কোন একটি আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী ছাত্র বহুদিন ধরিয়া গুরুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পড়িতেছিল, কিন্তু বুদ্ধির স্থূলতাবশতঃ আয়ুর্ব্বেদে তাহার কিছুমাত্র দখল হইল না। অথচ পড়া শুনাও তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। পয়সা উপার্জ্জনের জন্ম তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গুরু একটা বাক্স হইতে কতকগুলি বটিকা বাহির করিয়া রোগীদিগকে প্রত্যহ দেন, আর সেই বড়ি খাইয়া রোগীরা আরাম হইয়া প্রত্যহ কবিরাজ মহাশয়কে প্রচুর অর্থ দিয়া যায়। অতিবুদ্ধি শিষ্য মনে করিল, এই বড়িই যখন গুরুর সম্বল, তখন এ বড়ি গুলি আত্মসাৎ করিতে পারিলেই আমি কবিরাজ হইব। আর বৃথা পড়া শুনায় সময় নাশের প্রয়োজন কি? মূর্খ শিষ্য এইরূপ ভাবিয়া সুবিধামত বাক্সের সমস্ত শিশি খালি করিয়া বড়িগুলি

চুরি করিয়া তথা হইতে চম্পট দিল। অন্য কোন পল্লীগ্রামে গিয়া সেই মূর্খ কবিরাজ চিকিৎসা আরম্ভ করিল। পল্লীগ্রামে তাহার বেশ পশার হইল। নানাস্থান হইতে রোগীরা তাহার কাছে আসিতে লাগিল। এক বৃদ্ধা স্ত্রী, তাঁহার একমাত্র পুত্রের জ্বর আরাম করিবার জন্য সেই কবিরাজকে বাড়িতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি বলিলেন, দেখুন কবিরাজ মহাশয়! আমার পুত্রকে ভাল ঔষধ দিবেন, সে যাহাতে শীঘ্র আরাম হয়, তাহা করিবেন। কবিরাজ বাক্স খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া গোটাকতক ক্ষুদ্র বড়ি দিয়া বলিলেন, এই উত্তম বড়ি বাছিয়া তোমার ছেলের জন্য দিলাম, খলে মাড়িয়া খাওয়াইয়া দাও, শীঘ্র জ্বর সারিয়া যাইবে। সেই প্রবীণ স্ত্রীলোকটি ক্ষুদ্র বড়ি দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ হইয়া কবিরাজকে বলিলেন, এ বড়ি যে নির্দ্দোষ, ইহাতে যে রোগীর কোন অপকার হইবে না, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? কবিরাজ বলিলেন আচ্ছা, তোমার বিশ্বাসের জন্য, আমি নিজেই এই বড়ি খাইতেছি। এই বলিয়া কবিরাজ নিজে গোটাকতক বড়ি খাইয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কবিরাজের কথামত সেই বড়ি নিজের পুত্রকে তখনই খাওয়াইয়া দিলেন। খানিকক্ষণ পরেই সেই বড়ি খাইয়া, কবিরাজের মাথা ঘুরিতে লাগিল, দেহ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, কবিরাজ দৌড়িয়া গিয়া সম্মুখের পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও বারম্বার ডুব দিতে লাগিলেন। এদিকে রোগীও বড়ি খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িল, তখন সেই বৃদ্ধা স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বলিতে লাগিল, ও কবিরাজ মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশ হল, কি বড়ি দিলেন, আমার ছেলে মারা

যায় যে, কবিরাজ তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আ-মলো মাগি, কেন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বক্‌ছিস্, তোর ছেলের জ্বর হইয়াছে, উহাব ত মরিবারই কথা। জ্বরে তোর ছেলে দুদিন বাদে মরিত, না হয় আমার বড়ি খেয়ে একটু শীঘ্র মরিল, তাহাতে ক্ষতি কি? আর আমি যে সহজ শরীরে বড়ি খাইয়া মারা যাই, তাহার কি?

এইরূপ শাস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্খ কবিরাজ দ্বারাই আয়ুর্ব্বেদের অধঃ-পতন হইয়াছে। যাহা প্রাচীন মহর্ষিদের চিন্তাশীল মস্তিষ্ক হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, আজি তাহা হাতুড়ের শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দেব দুর্ল্লভ সাধের সামগ্রী আজ নারকীর ভাণ্ডারে পড়িয়া হলাহল রূপে পরিণত হইয়াছে। যাহা মনুষ্য জীবনের অবলম্বন, যাহার অভাব হইলে জীব-জীবন শ্মশানের জলন্ত চিতানলে পরিণত হয়, সেই স্বাস্থ্য সুধার অফুরন্ত নির্ঝরিণী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা আজ কালবশে জলন্ত দাবানলে পরিণত হইয়াছে। দেবতার নন্দনকাননে আজ পিশাচের বিকট তাণ্ডব-লীলা দেখিয়া হৃদয় মর্ম্ম যাতনায় আকুল হইয়া উঠে। আজ পূর্ণিমার চাঁদ রাহুর করালকবলে পতিত হইয়াছে, ফুটন্ত ফুল আজি কীটরাশির বিলাসক্ষেত্র হইয়াছে, দীনদুঃখী ভারতের প্রাণের সামগ্রী আজ দানবের পদতলে লুন্ঠিত হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু। তোমার প্রাণ কি ব্যথিত হয় না।

আয়ুর্ব্বেদে ঔষধ সম্বন্ধে যেমন উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধেও আয়ুর্ব্বেদ উন্নতির উচ্চমঞ্চে পৌঁছিয়াছিলেন। এখনও সুশ্রুতাদি গ্রন্থে অস্ত্রাদির যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে যে আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্রবিদ।

রীতিমত প্রচলিত ছিল, তাহা স্পষ্ট ধারণা হয়, কেবল কবিরাজ-গণের আলস্য, ঔদাসীন্য ও মানসিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ, এই অস্ত্র-বিদ্যা এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কবিরাজগণ এই অস্ত্র চিকিৎসাকে ঘৃণা করিতেন, পূঁয রক্ত আদির সংস্রবে তাঁহারা থাকিতে ভাল বাসিতেন না, তাই এই বিদ্যাকে তাঁহারা নিজের অনুচর নাপিত আদি জাতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা অব-লম্বন করিতে হয়, তাই দয়ালু কবিরাজগণ, এই বৃত্তি নিজে পরিত্যাগ করিয়া, নীচ শ্রেণীর লোকের উপর ভার দিয়াছিলেন। এখনও নাপিত আদি ক্ষৌরকার জাতিকে কোথাও কোথাও অস্ত্রবিদ্যা চালাইতে দেখা যায়। নাপিতগণ যদি শিক্ষিত হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের দ্বারা অস্ত্রবিদ্যার উন্নতি হইত, এই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়াই আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রবিদ্যা ক্রমশঃ কালবশে বিলুপ্ত হইয়াছে। নিষ্ঠুরতার জন্যই যে কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট কবিরাজগণ এই অস্ত্রবিদ্যাকে ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন, সে বিষয়ে একটি গল্প বলিতেছি। কোন একজন ব্রাহ্মণ গৃহস্থের উদরের ভিতরে ফোড়া হইয়াছিল। তিনি ফোড়া অস্ত্র করিবার জন্য একজন কবিরাজের চিকিৎসাধীন হন। কবি-রাজ মহাশয় তাঁহার পেট কাটিয়া পেটের ভিতরে ফোড়া অস্ত্র করিলেন। পেটের উপরিভাগের চামড়া সেলাই করিয়া তিনি যখন সেই স্থান পুনরায় পূর্ব্ববৎ অবস্থায় সংস্থাপিত করিতে গেলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রকারিতার অভাববশতঃ ব্রাহ্মণের পেটের ভিতরে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিয়াছে। সেই বায়ু পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া না

দিলে, ব্রাহ্মণের পীড়া আরও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু কি উপায়ে সেই বায়ু বাহির করিতে হইবে, কবিরাজ তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি কবিরাজ তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন, দেখুন মহাশয়। যেরূপ ফোড়া আপনার হইয়াছিল, তাহাতে আপনার বাঁচিবার আশা ছিল না। সেই ফোড়া অস্ত্র করিয়া আমি আপনার প্রাণদান দিব। আমিত আপনার এই উৎকট পীড়া নিশ্চয়ই আরাম করিব। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আপনি আমাকে কি দিবেন? রোগ-বিমুক্তি-আশায় কাতর ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই দিব। কবিরাজ বলিলেন, আপনার ঐ ষোড়শবর্ষীয়া ভার্য্যাটিকে আমি চাই। উহাকে না দিলে আমি আপনার ব্যারাম কিছুতেই আরাম করিব না। কবিরাজের সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া, বিষাদে ব্রাহ্মণ সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই দীর্ঘনিশ্বাসের তেজে ব্রাহ্মণের পেটের ভিতর হইতে বাহিরের বায়ু বাহির হইয়া গেল, সেই অবসরে কবিরাজ নিজ কার্য্যসাধন করিয়া লইলেন। তাহার পরদিন হইতেই কবিরাজ অস্ত্রবিদ্যাকে ঘোর নিষ্ঠুরতার জঘন্যক্ষেত্র মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। এই কবিরাজী অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে নানাবিধ ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির নিতান্ত কোমলতাবশতঃই শুদ্ধ সাত্ত্বিক কবিরাজগণ এই রক্ত পূঁয মিশ্রিত অস্ত্র চিকিৎসাকে তামসিক ব্যাপার বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতেন। তাঁহাদের উপেক্ষা ঔদাসীন্যবশতঃই অস্ত্রবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং কি অস্ত্রবিদ্যা কি ঔষধপ্রয়োগ প্রণালী কোন বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ অবনত নহে। কেবল অশিক্ষা ঔদাসীন্যের যোগ

অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়াই এমন সমুজ্জল শবতের পূর্ণচন্দ্রমা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞানের আস্তরণ উঠাইয়া দাও, দেখিতে পাইবে, আয়ুর্ব্বেদের গুহ্যগর্ভে অমূল্য বত্নরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে। কুশিক্ষার মোহময়ী কুজ্ঝটিকা বিদূরিত করিয়া দাও, দেখিতে পাইবে, আয়ুর্ব্বেদ-সূর্য্যের কিরণরাশি সহস্রধারে বিকীর্ণ হইতেছে। জড়তা নিশ্চেষ্টতার বালুকাস্তূপ সরাইয়া দেখ, আয়ুর্ব্বেদের পবিত্র ক্রোড়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীব মত সুশীতল নির্ঝরিণী ঝির ঝির কবিয়া প্রবাহিত হইযা যাইতেছে। বড় দুঃখের কথা, মহর্ষি ধন্বন্তবিব এই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু জীবনীশক্তিব এই অনন্ত প্রস্রবণ আযুর্ব্বেদ শাস্ত্র আজ অবহেলা করিয়া আমরা বিদেশীয় চিকিৎসার জন্য লালায়িত হইতেছি, পিতৃ-পিতামহগণের সঞ্চিত অমূল্য গুপ্ত কোহিনুব পরিত্যাগ কবিয়া আমবা বিদেশীয় চাক্‌চিক্যময় কাঁচ-মণি পাইবাব জন্য ধাবিত হইতেছি। আমাদের অধঃপতনেব আর বাকী কি? আয়ুর্ব্বেদের অসভ্যমূর্ত্তি বটিকা, বিকটগন্ধ তৈল, অনুপানের নানা গোলযোগপূর্ণ ঔষধাদি অতি ঘৃণার চক্ষে আমরা দেখিতে শিখিয়াছি, তাই অগ্রেই কোন ব্যাবাম হইলে কবিবাজকে বিশ্বাস না করিয়া ডাক্তারের চরণে শবণ লই। শেষে ডাক্তাব কর্ত্তৃক পবিত্যক্ত বিকৃত হইয়া কবিরাজকে অগত্যা অন্তিমকালে ডাকিয়া থাকি। আমি জানি, আমারই এক জন সুশিক্ষিত বন্ধু আমবাত, বাতবেদনা, গেঁটে বাত আদি ব্যাধিতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া আমার কাছে ঔষধের ব্যবস্থা চান। আমি তাঁহার জন্য মহামাষ তৈলের ব্যবস্থা করি। কিন্তু এ অসভ্য তৈলের ব্যবস্থায় তাঁহার মন উঠিল না। তিনি কোন এক জন সুপ্রসিদ্ধ সাহেব ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যান।

সাহেব ডাক্তার ফোমেণ্টেশন আদি নানাবিধ উপায়েও তাঁহার বাতবেদনা আরাম করিতে পারিলেন না। তখন সাহেব বলিলেন, আপনি যদি এই বাতবেদনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন, তবে কোন একজন ভাল কবিরাজের কাছে গিয়া মহামাষ তৈলের ব্যবস্থা লউন। তখন সেই সুসভ্য বন্ধু অবনতবদনে আমার কাছ হইতে মাষতৈল লইয়া কিছুদিন ব্যবহার করিয়া রোগ মুক্ত হন। সভ্যতার অভিমানে যাঁহারা আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এই দৃষ্টান্তটি মনে রাখিতে বলি। যে সমস্ত রোগে কবিরাজকে শেষে ডাকিতেই হইবে, তেমন অবস্থায় একটু অগ্র হইতেই কবিরাজকে ডাকিলে ভাল হয় না কি?

বাস্তবিকই বড় দুঃখ হয়, স্বদেশীয় চিকিৎসা উপেক্ষা করিয়া, কেন স্বদেশের শিক্ষিত পুরুষগণ এখনও বিদেশীয় চিকিৎসাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অবলম্বন করিতেছেন? কবিরাজী চিকিৎসা ও বিদেশীয় চিকিৎসা ইহার মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহার মীমাংসা করিতেছি না, বলিতেছি এই বিদেশীয় চিকিৎসাকে যেমন ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত নিজ ক্রোড়ে স্থান দিতেছ, তেমনই ভাবে কবিরাজী চিকিৎসাকে একবার স্থান পাইবার অবকাশ দাও। তাহা হইলেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হইবে। ঐ সভ্যতা-সমুজ্জ্বল বিদেশীয় চিকিৎসার পার্শ্বে এই দীন হীন মলিনবেশা কবিরাজী চিকিৎসাকে একবার বসাইয়া দাও। সভ্যজগতের গৌরবময় উচ্চ চিন্তার পার্শ্বে এই অসভ্য মুনি ঋষিদের জটাস্তূপ-সমন্বিত মস্তিষ্ক-নিঃসৃত •অসভ্য গাছগাছড়া পরিপূরিত আয়ুর্ব্বেদীয় •চিকিৎসাকে একবার সম্মানভাবে বসাইয়া দাও। উভয়কে পাশাপাশি রাখিয়া সমান

ভাবে উভয়ের ব্যবহার করিয়া যদি দেখিতে পাও, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তখন ইহাকে পরিত্যাগ করিও।

শিক্ষিত ভারতবাসি! আমি তোমাকে ছাড়িব না। বিনা পরীক্ষায় তুমি কবিরাজী চিকিৎসাকে অগ্রাহ্য করিবে, তাহা হইতে দিব না। যাহাতে কবিরাজী ও বিদেশীয় উভয় চিকিৎসাকে তুমি পাশাপাশি রাখিয়া পরীক্ষা করিতে পার, তাহার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা আমি করিয়াছি। আমি দেখিতেছি, তুমি নিজের পরিবার মধ্যে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধপূর্ণ বাক্স ও পুস্তক লইয়া চিকিৎসা করিতেছ, তোমার এই হোমিওপ্যাথিক বাক্সের মত আমিও ঠিক কবিরাজী বাক্স ও পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তোমার সেবার জন্য অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। তুমি কি আমার সেবা গ্রহণ করিবে না?

আমার এই কবিরাজী বাক্সে ত্রিশ প্রকার ঔষধের শিশি আছে। প্রত্যেক শিশিতে কবিরাজী বটিকা ও চূর্ণ ঔষধ আছে। নবজ্বর, পুরাতন প্লীহা আদি ঘটিত জ্বর, পেটের ব্যারাম, বিসূচিকা আদি নানাবিধ রোগের ত্রিশ প্রকার ঔষধ ইহাতে আছে। এই ঔষধ এক বৎসর পর্য্যন্ত বীর্য্যবান্ থাকিবে। পুস্তক দেখিয়া এই বাক্সস্থিত ঔষধ-সাহায্যে তুমি নিজ পরিবারে পারিবারিক কবিরাজী চিকিৎসা করিতে পারিবে। নাড়ীজ্ঞানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল লক্ষণ দেখিয়া তুমি চিকিৎসা করিতে পারিবে। ঠিক হোমিওপ্যাথিক বাক্স ও পুস্তক সাহায্যে তুমি যেমন হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতেছ, আমাদের এই কবিরাজী বাক্স সাহায্যে সেইরূপ কবিরাজীমতে চিকিৎসা করিতে পারিবে। বোধ হয় এতক্ষণে কথাটা পরিষ্কার হইল। যেখানে

দেখিলে হোমিওপ্যাথিক্ ক্যাম্ফর' ঔষধে বিসূচিকার কিছুমাত্র উপশম হইল না, সেইখানে আমাদের এই কবিরাজী বাক্সের ঔষধ কর্পূর-রস বটিকা বাহির করিয়া খলে মাড়িয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দাও, তাহা হইলেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হইবে। এই বাক্স প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যকীয়। অল্প পয়সায় যাঁহারা কবিরাজী চিকিৎসায় সুফল পাইতে চাহেন, এই বাক্সে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে।

বহু পরিশ্রম বহু গবেষণা করিয়া এই আয়ুর্বেদীয় পুষ্পাঞ্জলি উপহার লইয়া শিক্ষিত ভারতবাসি। আজি তোমার চরণতলে আমি সেবার জন্ম দণ্ডায়মান। তুমি কি সেবকের পূজা গ্রহণ করিবে না? বিদেশীয় উদ্যানের ফুটন্ত ফুল আজ তোমার গৃহ আলো করিয়া রহিয়াছে, আজি আমি তাহারই পার্শ্বে এই স্বদেশীয় বনজ পুষ্পরাশি সাজাইতে চাই, তুমি কি তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিবে না। আজ এই হিন্দুর জাতীয় উন্নতির দিনে এই জাতীয় জিনিসের আদর কি তুমি করিবে না? প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমার গৃহিণী ছেলেপিলের পেটের পীড়া হইলে হোমিওপ্যাথিক্ বাক্স খুলিয়া হয়ত নক্সভমিকা ঔষধ বাহির করিবেন। কিন্তু এই কবিরাজী বাক্স ঘরে রাখিয়া দিলে প্রাতঃকালে তোমার গৃহিণী ঐ বাক্স খুলিয়া শঙ্খবটিকা নৃপবল্লভ আদি শাস্ত্রীয় পবিত্র নামযুক্ত কবিরাজী ঔষধ পেটের ব্যাবামের জন্ম ব্যবহার করিতে পারিবেন। বল দেখি হিন্দু! এ দৃশ্য তোমার গৃহে কত মধুর। কত রমণীয়। যদি হিন্দুর অন্তঃকরণ হারাইয়া না থাক, যদি আর্য্যজাতির পবিত্র রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া থাকে, যদি স্বদেশের স্বজাতীয় বিদ্যা আদর করা তোমার শিক্ষার সুফল বলিয়া

বিবেচিত হয়, তবে আজ এই আয়ুর্ব্বেদের পুনরুত্থান-সংবাদে তুমি কি আনন্দিত হইবে না? স্বদেশীয় ব্যবহার-বিদ্যার উন্নতি কল্পে তুমি কি উৎসাহ দান করিবে না? *

সুখ-দুঃখ।

সুখ দুঃখ কি, এ পর্য্যন্ত তাহার নিরূপণ হইল না। এ পর্য্যন্ত, কোন কবি, কোন দার্শনিক, কোন বৈজ্ঞানিক, তাহার স্বরূপের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ এই অজানা, অচেনা, জিনিষের জন্য দেখি, জগৎ পাগল। যাহা নিত্য নিয়ত পলে পলে অনুভব করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারা গেল না, এ বড় বিষম প্রহেলিকা। এক মুহূর্ত্ত যাহার সহিত বিচ্ছেদ নাই, অবিচ্ছেদে প্রতিনিয়ত সঙ্গীর ন্যায় যাহা চিরদিন জীবের সহিত বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা চেনা গেল না, যে চিরসঙ্গী, সে চির অপরিচিত থাকিয়া যায়, ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার নয় কি? কি জানি কেন, যাহা বুঝিবার অগম্য পথে বিরাজ করিতেছে, মনঃপ্রাণ তাহার পশ্চাতে দৌড়িতে চায়, যাহাকে ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারা যায় না, ছুঁই ছুঁই করিয়া ছুঁইতে পারা যায় না, তাহাকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য, মনঃপ্রাণ ঊর্দ্ধশ্বাসে অকূল পাথার দিয়া ছুটিতে

* এই বাক্সের মূল্য ও মফঃস্বলে প্রেরণের ডাক খরচাদি সহিত ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তির ঠিকানা ১নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, কলিকাতা।

চায়। যাহার স্বরূপ কি, জানিলাম না, যাহার প্রকৃতি কি বুঝিলাম না—সেই অজানা, অচেনা জিনিষকে ভাল বাসিবার জন্য প্রাণ এত চঞ্চল হয় কেন? অস্পষ্টতার গাঢ় ঘন গভীর কুজ্ঝটিকা যাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেই ধোঁয়া ধোঁয়া আব্‌ছায়াময় পদার্থের অতল প্রেমাম্বুধিতলে মনঃপ্রাণ নিমগ্ন হইতে চায় কেন? যাহা জানা শুনা বর্জ্জিত, আলাপ-পরিচয় বিরহিত, ভালবাসা তাহার চরণ চুম্বন করিতে গিয়া অধোমুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় না কেন?

বাস্তবিক সুখ দুঃখ কি, তাহা বুঝা যায় না। যাহাকে সুখ বলিয়া স্থির করিয়াছি, ব্যক্তিবিশেষে, সময় বিশেষে তাহাই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায়, আবার যাহাকে দুঃখ বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছি, সময়বিশেষে, ব্যক্তিবিশেষে, তাহাই সুখে পরিণত হয়। সুতরাং এইটা সুখ, এইটা দুঃখ তাহার প্রকৃত নির্ণয় হয় কৈ? যাহা বাস্তবিকই তাপময়, তাহা কি কখন বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইতে পারে? আজ যে যুবতী স্ত্রী, বিলাসী ভোগীর পক্ষে সুখের অনন্ত প্রস্রবণ, তাহাই আবার সংসার-বিরাগী ত্যাগীর পক্ষে মেদ মজ্জা রক্তমাংসের একটা বীভৎসময় সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে, সুতরাং কোন্‌টাকে ঠিক বলিব। ভোগীর কথায় কি বুঝিব স্ত্রী সুখময়, কিম্বা যোগীর কথায় বুঝিব, স্ত্রী ঘৃণাময় রক্তমাংসের একটা চুপ্‌ড়ি ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? সুখ দুঃখ বাস্তবিকই যদি সৎ পদার্থ হয়, তবে এখানে স্ত্রীতে সুখত্ব দুঃখত্ব থাকে কেমন করিয়া? এক আধারে দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে? আজ যে বিষ্ঠাকে অতি কুৎসিত জঘন্য দুঃখময় পদার্থ বলিয়া মানুষ ত্যাগ

করে, শূকর তাহা পরমাহ্লাদে অতি উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করে, শূকরের অনুভব ও মানুষের অনুভব এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? কেন মানুষের কথাই মানিব, আর শূকরের কথা মানিব না, এ পক্ষপাতিতার হেতু কি? তোমার মনুষ্য সম্প্রদায় মিলিয়া যাহা বিধিবদ্ধ করিল, তাহা মনুষ্য সমাজে যেমন ঠিক, তেমনই শূকর জাতি মিলিয়া যাহার সিদ্ধান্ত করিবে, শূকর সমাজে তাহা তেমনই ঠিক হইবে না কেন? প্রত্যেক শূকরকে ডাকিয়া ভোট লও, তাহারা সকলে একবাক্যে বলিবে, বিষ্ঠার মত উপাদেয় জিনিষ জগতে আর নাই। শূকরের পক্ষে যাহা উপাদেয়, তাহা মানুষের পক্ষে হেয় হইতে পারে, কিন্তু কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক, তাহা বলিবার যো নাই। যদি দুইটাই ঠিক হয়, তাহা হইলে সুখ দুঃখ বলিয়া দুইটা জিনিষের পদার্থগত অস্তিত্ব থাকে কৈ? যদি শূকর বলিয়া তাহার অনুভবকে ভ্রান্ত বলিয়া অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে যেখানে মানুষের মধ্যেও অনুভবের পরস্পর বিরোধিতা আছে, সেখানে কি বলিবে?

মৎস্য বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রিয় পদার্থ, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের পক্ষে তাহা বড়ই ঘৃণার জিনিষ। মাছের তরকারীর নাম শুনিলে বাঙ্গালীর রসনা রসিত হইয়া উঠে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীরা ঘৃণায় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। আমি ইহা স্বচক্ষে কাশীতে দেখিয়াছি। দূর হইতে ইলিশ মাছের গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র হয় ত বাঙ্গালী স্তূপীকৃত অন্নরাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য করিতে পারেন, কিন্তু সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিলে এক জন মহারাষ্ট্রীর তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তাহা বলিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। মৎস্য বাস্তবিকই বাঙ্গালীর পক্ষে এত প্রিয়তম পদার্থ যে,

তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এক জন বাঙ্গালী কবি নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন—

> কেচিদ্ বদন্ত্যমৃতমস্তি "সুরালয়েষু"
> কেচিদ্ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু।
> ব্রূমোবয়ং সকল শাস্ত্র বিচার দক্ষা
> জম্বীরনীর পরিপূরিত মৎস্য খণ্ডে॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে সুরালয়ে অর্থাৎ সুরার ভাণ্ডার (শুঁড়ির বাড়িতে) অমৃত পাওয়া যায়, অথবা সুরালয়ে অর্থাৎ সুরগণের—দেবগণের আলয়ে স্বর্গে অমৃত পাওয়া যায়, আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যুবতী স্ত্রীর অধর পল্লবেই অমৃতের স্রোত বহিতেছে। কিন্তু সকল শাস্ত্র বিচার করিয়া আমাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার বলে আমরা বলি, যদি অমৃত কোথাও থাকে, তাহা হইলে জম্বীর রসপূর্ণ মৎস্য খণ্ডে তাহা আছে, আর কোথাও নাই।

বাস্তবিক অনেক বাঙ্গালীর উহাই অন্তরের কথা। মৎস্য খাওয়াটা ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিতেছি না। মৎস্য খাইয়া বাঙ্গালী নরকে যাইবেন, কি মৎস্য না খাইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বর্গে যাইবেন, তাহার কথা হইতেছে না। কিন্তু যে মৎস্য বাঙ্গালীর রসনায় সুখময়, তাহাই মহারাষ্ট্রীয় রসনায় দুঃখময়, সুতরাং মৎস্য স্বরূপতঃ কি, তাহাই এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। পদার্থ স্বরূপতঃ সুখময় কি দুঃখময়, তাহা নিরূপণ করা বড় শক্ত কথা। তোমার পক্ষে যাহা সুখ, আমার পক্ষে তাহাই যদি দুঃখ হয়, তাহা হইলে সুখ দুঃখ বাদ দিয়া পদার্থকে নিরূপণ করিতে হয়। কেননা তুমি যেমন পণ্ডিত, আমিও তেমনই পণ্ডিত।

তোমার অনুভব-শক্তি যেমন প্রবলা, প্রখরা, ভ্রান্তিবিহীনা, আমারও তাহাই। মানুষ হইয়া যতগুলি মনোবৃত্তি থাকা সম্ভব, তাহা তোমারও যেমন আছে, আমারও তেমনি আছে। অথচ তুমি যাহাতে সুখ পাও, আমি হয় ত তাহাতে দুঃখ পাইয়া থাকি, আবার আমি যাহাতে সুখ পাই, তুমি হয় ত তাহাতে দুঃখ পাইয়া থাক। তোমার ও আমার সুখের রাস্তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন—বিরোধী। তোমার বিরোধী রাস্তায় অপরে সুখ পায়, ইহাতে তুমি তাহাকে যদি দুঃখী মনে কর, তাহা হইলে তোমার নিতান্তই ভুল।

একটা গল্প মনে হইতেছে। কলিকাতায় কোনও বাজারে মফঃস্বল হইতে এক মেছুনী মাছ বিক্রী করিতে আসিয়াছিল। সমস্ত দিন মাছ বিক্রী করিয়া সে যখন সন্ধ্যার সময় বাড়ী যাইবে, তখন আকাশে বড়ই দুর্যোগ দেখা দিল। ঝড, জল, বিদ্যুতের ঘন ঘটায় আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই দুর্যোগে মেছুনী বাড়ী যাইতে অপারগ হইয়া কোন এক ভদ্র লোকের বাড়ীতে সেই রাত্রিতে থাকিবার জন্য আশ্রয় চাহিল। বাবুটী দয়া পরবশ হইয়া আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। তাহাকে ভোজন করাইয়া উপরের বৈঠকখানা ঘরের এক পার্শ্বে তাহার শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বাবুটি বড লোক। তাঁহার বৈঠকখানা ঘরও বেশ সুসজ্জিত, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বিছানাগুলি সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে, আতর, গোলাপজল, লেবেণ্ডারের সৌগন্ধ বিছানার চারিদিকে ভূর ভূর করিয়া বাহির হইতেছে। সেই ঘরে সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মেছুনীর শুইবার ব্যবস্থা হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রস্রাব করিবার জন্য বাবুটী একবার বাহিরে আসিলেন, দয়ালু বাবুটী সেই সময়ে একবার মেছুনীর তত্ত্ব লইবার জন্য তাহার

কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো নিদ্রার ত কোন ব্যাঘাত হইতেছে না? বিছানার জন্য ত কোন কষ্ট হইতেছে না? মেছুনী উত্তর করিল, "এমন বিছানার কষ্ট আর আমি কখনও পাই নাই, এমন ঘুমের কষ্ট আর আমার কপালে কখনও ঘটে নাই। কি বিশ্রী নরম পাতা বিছানা। আমার গা ঘিন্ ঘিন্ কচ্ছে, আবার তার উপর কি এক বিটকেল গন্ধ ঘরময় বেরুচ্ছে, আমার নাক জ্বলে গেল। ওগো তোমার পায়ে পড়ি এ ঘর হ'তে অন্য কোন ঘরে আমার শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।" বাবুটি বলিলেন—তুমি কোন্ ঘরে শুইতে চাও বল, সেই ঘরেই তোমার শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব, তোমার মনোমত ঘর তুমি নিজেই পছন্দ করিয়া লও। এই বলিয়া বাবুটি মেছুনীকে সঙ্গে করিয়া ঘর দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। মেছুনী বাছিয়া বাছিয়া রান্না ঘরের কাছে গিয়া পৌঁছিল। রান্নাঘরের এক পার্শ্বে যেখানে মাছ কোটা হয়, আঁশ বঁটি, আঁশ পেতে যেখানে থাকে, সেই সুগন্ধময় স্থানে, মেছুনী পৌঁছিয়া অমনি আহ্লাদে আট খানা হইয়া বলিয়া উঠিল,—"আঃ বাঁচলাম" আমার দেহে এতক্ষণে প্রাণ এ'ল, আহা কি সুন্দর গন্ধ। ও ঘরের দুর্গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমার নাক জ্বলে যাচ্ছিল। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হল। বাবু! আমি এই খানেই শোব আপনার জয় হউক। এই বলিয়া মেছুনী নিজের বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া তথায় পরমানন্দে শুইয়া পড়িল। বাবুটী দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন, তাঁহার মস্তিষ্কে গোলযোগ বাধিয়া গেল। বহুকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

বাবুর ঘ্রাণ-শক্তিতে মৎস্যের গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া স্থির হইতে

পারে, কিন্তু মেছুনীর পক্ষে তাহা আতর অপেক্ষাও উপাদেয়। বাবুর চক্ষে যাহা সুখময়, মেছুনীর চক্ষে তাহা কিন্তু ঘোর দুঃখময়, সুতরাং নিজের চক্ষে পরকে সুখী বা দুঃখী মনে করা বড়ই ভুল। নিজের চক্ষে নিজের ভাবে সুখ দুঃখ মনে করিয়া পরের প্রতি তাহা প্রয়োগ করিতে গেলে বড়ই বিভ্রাট বাধিয়া যায়। তুমি একজন স্থূলকায় জমীদার মানুষ, বৈঠক-খানায় বসিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া দিব্য তুমি গুড়ুক ফুঁকিতেছ, হিন্দুস্থানী চাকরেরা তোমার সেই প্রকাণ্ড দেহখানি মর্দ্দন করিতেছে, আর তুমি অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সেই মর্দ্দন-সুখ অনুভব করিতেছ, আমি একজন ক্ষীণকায় বন্ধু, তোমার সহিত সেই সময় দেখা করিতে গিয়াছি। তুমি সাদর সম্ভাষণ জন্য হুঁকার নলটি আমার মুখের কাছে ধরিলে, ইহাতে আমি আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু তুমি আমাকে আরও আপ্যায়িত করিবার জন্য যদি সেই হিন্দুস্থানী চাকরকে আদেশ কর যে এই বাবুটি পথ-শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, বেশ করিয়া ইহার অঙ্গ সেবা কর, ইনি তাহা হইলে সুস্থ হইবেন। তোমার এই আদেশানুসারে কার্য্য হইলেই ত আমি গিয়াছি। সেই পালোয়ান-প্রবর হিন্দুস্থানীর কর-পল্লব আমার ক্ষীণ অঙ্গের যেখানটা স্পর্শ করিবে, সেই খানটাই হাড়গোড় ভাঙ্গা "দ" হইয়া যাইবে। তোমার শ্রীঅঙ্গ দশটি ব্যাঘ্রে খাইয়াও ফুরাইতে পারে না, সুতরাং গাত্রমর্দ্দন তোমার পক্ষে সুখকর হইতে পারে, কিন্তু আমার এ ক্ষীণ অঙ্গে তাহা উৎকট যন্ত্রণাদায়ক হইবে। তাই বলি, নিজের চক্ষে সুখ দুঃখের চিত্র আঁকিয়া পরের প্রতি প্রয়োগ করা ঠিক নহে। নিজের ক্ষুদ্র শিশুটিকে তুমি কতই আদর

করিতেছ, তাহার মুখে বার বার চুমু খাইয়া তুমি তাহাকে কতই সোহাগ করিতেছ, তুমি মনে করিতেছ, তোমার আদরে ছেলেটি কতই সুখী হইতেছে, কিন্তু চুমু খাইবার সময় তোমার মুখস্থিত দাড়ির কুট কুটানিতে ছেলে যে মহাবিরক্ত হইতেছে, তাহা তোমার বুঝা উচিত। তোমার দৃষ্টিতে যাহা আদর, ছেলের পক্ষে কিন্তু তাহা মহা-কষ্টকর। সুতরাং নিজের অনুভব অনুসারে পরকে সুখী বা দুঃখী মনে করা বড়ই ভুল।

আমি কাশীতে যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীর ত্রিতল গৃহে আমার রন্ধন-শালা ছিল। আমাদের এক জন হিন্দুস্থানী চাকর ছিল। সেই চাকরটি একশত হস্ত পরিমিত গভীর কূপ হইতে জল উঠাইয়া, বৃহৎ একটী জালা স্কন্ধে করিয়া, সেই প্রকাণ্ড উচ্চ ত্রিতল গৃহের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, আমাদের রন্ধন-শালায় জল দিয়া যাইত। এমন বিশ ত্রিশ জালা জল তাহাকে প্রত্যহ যোগাইতে হইত। যাহারা পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গ্রীষ্মকালে বেড়াইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সে সময় সেখানে কি ভয়ানক গরম পড়ে। সেই ভয়ানক গরমে—সেই প্রখর রৌদ্রে হিন্দুস্থানী চাকর জলভরা জালা মাথায় লইয়া নক্ষত্র-বেগে সিঁড়ির উপর দিয়া আনাগোনা করিতেছে, সে পরিশ্রমের বিরাট ব্যাপার দেখিলে বাঙ্গালী চাকরের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, একবিন্দু জল, বা একটী চানাও পেটে যায় নাই, শরীরে ঘর্ম্মের স্রোত বহিতেছে, তাহার দিকে দৃক্‌পাত নাই, হিন্দুস্থানী চাকরটির তেমন অবস্থাতেও বিরাম নাই,—বিশ্রাম নাই, অম্লানবদনে কূপ হইতে জল লইয়া সে ছুটাছুটি করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া একদিন সেই চাকরটিকে

কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শুন বাপু আমার এক বিষম সংশয় জন্মিয়াছে। তুমি সেই সংশয়টা মিটাইয়া দিবে কি? চাকর বলিল,—আজ্ঞে বলুন না আপনার কি সংশয়? আমি বলিলাম আমার সংশয় এই, তোমরা মানুষ কি জানোয়ার, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমরা যেরূপ পরিশ্রম কর, ইহা ত মানুষ হইয়া কেহ করিতে পারে না।" সে হাসিয়া বলিল—"কি করি বাবু পেটের দায়ে সবই করিতে হয়।" আমি বলিলাম "ইহাতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয় না।" সে বলিল, "এরূপ না করিলে, আমাদের কষ্ট হয়।" এরূপ পরিশ্রম যদি আমরা একদিন বন্ধ করি, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্ব শরীর বড়ই বেদনাযুক্ত হয়, শরীর যেন আলসে অকর্ম্মণ্য ঝুপ্‌সী মারিয়া যায়, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, আহারে রুচি থাকে না, নিতান্ত জড়বৎ হইয়া পড়ি। এই পরিশ্রমটি করিলে আমাদের শরীর ও মনে খুব স্ফূর্ত্তি হয়, দেহ সতেজ সবল ও স্বচ্ছন্দ থাকে, আমরা ইহাতে থাকি ভাল।

তোমার আমার অনুভবের রাজ্যে যাহা ঘোর দুঃখময়, হিন্দুস্থানী চাকরের পক্ষে কিন্তু তাহা বড়ই সুখময়। সুতরাং তোমার আমার সুখ দুঃখের কল্পনানুসারে হিন্দুস্থানী চাকরকে তাহার পরিশ্রমের জন্য দুঃখী মনে করা বড়ই ভুল। আমি যাহাকে দুঃখী মনে করি, সে হয় ত পরম সুখী, আবার আমি যাহাকে সুখী মনে করি, সে হয় ত ঘোর দুঃখী। প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া মহারাজ বাহাদুর তোমার সম্মুখ দিয়া অতুল বৈভবের ছটা দেখাইয়া সতেজে চলিয়া গেলেন, তুমি হয় ত ভাবিলে, আমা অপেক্ষা না জানি কতই সুখে এ ব্যক্তি

জীবন কাটাইতেছে। কিন্তু ইহা তোমার সাঙ্ঘাতিক ভুল। মহারাজ বাহাদুর যে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভুগিতেছেন, তাহা হয় ত তুমি জান না। সহরের বাজারে যখন আম্রের প্রাচুর্ভাব হয়, তখন বোম্বাই ও লেংড়া আমের অমৃতময় রসে অনেকেরই রসনা পরিতৃপ্ত হয়। যাহাদের পয়সা আছে, তাহারা সাধ মিটাইয়া সে সময় বোম্বাই ও লেংড়া আম খাইয়া লন। কিন্তু পয়সা থাকিতেও রাজা বাহাদুরের সে অমৃতময় রসাস্বাদ করিবার যো নাই। উক্ত আম্রফল খাইবার সক হইলে, তাঁহাকে বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। লেংড়া আমের খোসাটি ছাড়াইয়া, সেই আস্ত আমটী একবার মাত্র একবাটী দুগ্ধে ডুবাইয়া, তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লইতে হইবে। একবিন্দু আমের রস ও শস্যভাগ দুগ্ধে পড়িবে না। কেবল আমের গন্ধটুকু দুগ্ধে সঞ্চারিত হইবে মাত্র। সেই লেংড়া আমের সুবাসযুক্ত দুগ্ধটুকু পান করিয়াই রাজা বাহাদুরকে লেংড়া আম খাইবার সক মিটাইতে হয়। কেন না, আমের রস ও শস্যভাগ হজম করিবার ক্ষমতা রাজা বাহাদুরের নাই। তাহা উদরস্থ হইলে, রাজা বাহাদুরের পেট কামড়াইবে, তাঁহার অজীর্ণ ব্যাধি বাড়িয়া যাইবে। এই অজীর্ণ-ব্যাধি-বিষ বিদগ্ধ জীবন লইয়া তিনি যে সুখে কাল কাটাইতেছেন, তাহা তাঁহার অন্তর্যামীই জানেন।

তাই বলি, বাহিরের দিক্ দিয়া যাহা দেখি মধুময়, হয় ত তাহার ভিতরে অনন্ত চিতানল জ্বলিতেছে। বাহিরের দৃষ্টিতে যাহা দেখি শান্তিময়, আনন্দময়, হয় ত তাহার ভিতরে বাড়ীর কালের জলন্ত অঙ্গার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। বাহিরের

দৃষ্টিতে শান্তির সৌবসলিল খরতর তরঙ্গে যাহার উপব দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, হযত তাহাব ভিতবে শোক দুঃখের—জ্বালা যন্ত্রণাব ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিরাশি অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীব মত ধীবে ধীবে তবঙ্গায়িত হইতেছে। তাই বলি বাহিবেব লোকেব কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে, বাহিবেব লোকেব বাহ্য দৃষ্টি ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমি সুখী কি দুঃখী, যখন আমাব অন্তঃকবণ তদ্বিষযে সাক্ষ্য দিবে, তখনই তাহাব কথা শুনিব। আমাব অন্তঃকরণ "তৃপ্তোস্মি" বলিয়া যখন আমাবে সুখের সাক্ষ্য প্রদান কবিবে, তখন বাহিবেব সহস্র লোকে আমাকে দুঃখী বলিলেও আমি সুখী, আবাব স্থলবিশেষ সুখী বলিলেও আমি দুঃখী। আমাব সুখ দুঃখ আমাব কষ্টি পাথরে কষিয়া লইব, পবেব কথা শুনিব কেন? পরেব দৃষ্টিতে একজন ফকীব দীন দুঃখী কন্থাধাবী ভিখারী বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পাবেন, কিন্তু তাঁহাব প্রাণেব মর্ম্ম-দেশে যে গুপ্ত নীলকান্ত মণি জ্বলিতেছে, তিনি তাহাকে লইয়াই জুড়াইতে চান। তাঁহাব জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালময় অস্থিরাশি পবেব ঘৃণা আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-গুহা যে পূর্ণ চন্দ্রমার বিমল সুধার ধারায় প্লাবিত হইয়া যাইতেছে, তিনি তাঁহার প্রেম-পীযূষ-পানে পাগল। আজ মহর্ষি বাল্মীকি বল্মীক স্তূপে পবিণত হইযা বাহিবেব চক্ষে একটা জঞ্জালময মৃৎপিণ্ড বলিযা উপেক্ষিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মাব মর্ম্মদেশে নীবব সমাধি ক্ষেত্রে যে লুকান বতন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিযাছিল, তাহাব জ্বলন্ত ছটায় একদিন ত্রিভুবন পবিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আজ বাহিরের চক্ষে স্থূল দৃষ্টিতে প্রহ্লাদ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ

ছিলেন বটে, কিন্তু ভক্তের অঞ্চল-নিধি ভগবান অগ্রেই তথায় কুসুমাস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন। জগতের লোক তাহা দেখিতে পায় নাই। জগতের লোক যাহা নির্য্যাতন মনে করে, ভক্ত বিশ্বাসী তাহা বিধাতার কৃপাপ্রসাদ মনে করিয়া মাথায় পাতিয়া গ্রহণ করেন। সুতরাং জগতের কথা ছাড়িয়া দাও, বাহিরের কথা উপেক্ষার সাগরে ভাসাইয়া দাও। বাহিরের লোকে শতবার সুখী মনে করিলেও আমার প্রাণে অতৃপ্তি অশান্তির অগ্নিশিখা যদি প্রজ্বলিত হয়, তবে আমি সুখী কিসের? আমার প্রাণ যখন তৃপ্ত হইবে, আত্মা যখন তৃপ্তোস্মি বলিয়া সমাহিত হইবা যাইবে, আমার সুখবৃত্তি সেই দিন চরিতার্থ হইবে—নতুবা নয়।

শান্তির কাঙ্গাল।

জগতে সুখ পাওয়া যায়, আনন্দ পাওয়া যায়, ইংরাজীতে যাহাকে Pleasure বলে, তাহা পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় কি না, তাহা স্থির হইল না। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতায় সুখ হয়, স্ফূর্ত্তি হয়, আরাম পাওয়া যায়, কিন্তু তৃপ্তি হয় কি না, কে বলিতে পারে? ফুটন্ত যুবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবকের প্রাণ মন ভুলিয়া যায়, অনাবৃত স্তনমণ্ডলের কনক-কান্তি দেখিয়া কামুক কামাগ্নিতে বিভোল হইয়া যান, কিন্তু তাহাতে মুগ্ধতা আসে, আবেশ আসে, উন্মত্ততা আসে, শান্তি আসে

কি না, একবার প্রাণ ভরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খুব চিন্তা করিয়া দেখ দেখি। যাহাতে প্রাণকে পাগল করিয়া দেয়, প্রবৃত্তির আকুলি বিকুলিময় জলন্ত অগ্নিশিখায় যাহা ফেলিয়া দেয়, তাহাতে নেশার মত একটা সুখ হইতে পারে, কিন্তু প্রাণ মন তৃপ্তোস্মি বলিয়া শান্তির শীতল সাগরে নিমগ্ন হয় কি? ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় প্রাণের জ্বালা মিটে কি? যে কামবৃত্তির উদয় হইলে মনুষ্যের মন চঞ্চল হইয়া উঠে, যাহার বিষদংশনে মানুষ ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই ব্যাকুলতার আধারকে শান্তিময় কেমন করিয়া বলিব? স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা কাম তৃষ্ণার "নিবৃত্তি" হইলেই সুখ হয়, সুতরাং যাহার বিনাশে সুখ হয়, সেই কাম-তৃষ্ণাকে অবশ্যই দুঃখময় বলিতে হইবে। কেননা, তৃষ্ণা স্বভাবতই দুঃখময়ী। যাহা সুখময়, তাহার ধ্বংস সাধন জগতে কেহ করিতে চায় না। কাম-তৃষ্ণা যদি প্রকৃত সুখময়ী হইত, তবে তাহার উপভোগ দ্বারা ধ্বংসের জন্য জগৎ প্রস্তুত হয় কেন?

মদের নেশায় যাহা সুখ বলিয়া বোধ হয়, নেশা ছুটিয়া গেলে তাহাই দুঃখ বলিয়া স্থির হয়। যে আস্তাকুঁড়কে জঘন্য বলিয়া লোকে ঘৃণায় ত্যাগ করে, মাতাল "পতিতপাবনী গঙ্গা" বলিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে। যে কুখাদ্য লোকে সহজ অবস্থায় দুষ্কারজনক মনে করিয়া ঘৃণা করে, মাতালের মুখে তাহা বড়ই সুমিষ্ট লাগে। ইহার মধ্যে কোন্ অনুভবটা ঠিক। মাতালের অনুভব যদি ভ্রান্তিপূর্ণ হয়, তবে কামোন্মত্তেরও সুখানুভবকে ভ্রান্তিময় বলিবে না কেন? মদের নেশা যেমন, কামের নেশাও ত সেই জাতীয় পদার্থ। সুতরাং যাহা সহজ অবস্থায়—স্বাভাবিক অবস্থায় সুখ, তাহাই প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শান্তি। বিকৃত অব-

স্থার অনুভবকে ঠিক বলিতে পারা যায় না। যাঁহাবা সহজ অবস্থায়—প্রাকৃতিক অবস্থায়—অবিকৃত অবস্থায় পৌছিয়াছেন, তাঁহাদেব ভাষা এই—

> "যেষাং বল্লভয়া সহ ক্ষণমপি ক্ষিপ্রং ক্ষপা ক্ষীয়তে,
> তেষাং শীতকরঃ শশী বিরহিণামুল্কেব সন্তাপকৃৎ।
> অস্মাকন্তু ন বল্লভা ন বিবহস্তেনোভয়ভ্রংশিনাং,
> ইন্দ্‌ রাজতি দর্পণাকৃতিরসৌ নোষ্ণো নবা শীতল'।"

"প্রিয়তমাব ভুজপাশে জড়িত হইয়া যাহাদেব সুখেব নিশি নিমেষ মধ্যে ফুবাইয়া যায়, পূর্ণিমাব চাঁদ তাহাদেব পক্ষে শীতলতাব প্রস্রবণ। আবাব যাহাবা বিবহী, তাহাদেব পক্ষে চন্দ্রমা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডেব ন্যায় ঘোব সন্তাপকব। কিন্তু আমবা বিবহ ও মিলনের পব পাবে দাঁড়াইয়াছি, আমাদেব প্রিয়তমাও নাই, এবং তজ্জন্য বিবহ যন্ত্রণাও কিছু বুঝিবাব আমাদেব সামর্থ্য নাই। সুতবাং আকাশেব চাঁদ একটা গোলাকাব পদার্থ ছাড়া আব আমরা কিছুই বুঝি না।"

বাস্তবিক মাতালেব অনুভব ঠিক নহে। মাতালেব কথা প্রমাণ বলিয়া ধবা যাইতে পাবে না। যাঁহাবা সহজ অবস্থায় আছেন, মদেব নেশায় যাঁহাবা উন্মত্ত নহেন, সেই সমস্ত সাধুগণ যাহাতে সুখ পান, মাতাল তাহাতে দুঃখই পাইয়া থাকে। একটা গল্প মনে হইতেছে। কলিকাতাব কোন এক ভদ্র লোকেব বাটীতে প্রত্যহ পুরাণ পাঠ হইযা থাকে, প্রত্যহ বৈকালবেলা এক জন ব্রাহ্মণ অতি সুন্দবরূপে পুবাণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃগণেব মন মোহিত করেন। একদিন পুবাণ ব্যাখ্যা এতই সুন্দব হইয়াছিল, যে শ্রোতাগণ সকলেই পুরাণ পাঠক ব্রাহ্মণের খুব সুখ্যাতি

করিতে করিতে বাড়ী যাইতে লাগিলেন। কতকগুলি শ্রোতা বলিলেন, আহা কি মধুর ধর্ম্মকথা আজ শুনিলাম, আমাদের কর্ণ জুড়াইয়া গেল আজ রাম বাবুর বাড়ীতে যেন অমৃতবৃষ্টি হ'য়ে গেল। এক মাতাল সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, অমৃতবৃষ্টি কথাটা তার কাণে গেল। সে মুখ ফিরাইয়া শ্রোতাগণকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়। কোথায় অমৃতবৃষ্টি হ'ল, আমায় দয়া করিয়া বলুন না। শ্রোতারা বলিলেন, কল্য রাম বাবুর বাড়ীতে বৈকালবেলা আসিবেন, ঐ খানে প্রত্যহ অমৃতবৃষ্টি হইয়া থাকে। মাতাল ভারি খুসি হইয়া চলিয়া গেল। অমৃত পাইবার আশায় সে পরদিন বৈকালবেলায় রাম বাবুর বাড়ি গিয়া জুটিল, তথায় গিয়া সে দেখিল, কতকগুলি লোক চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আর একটা লোক উচ্চস্থানে বসিয়া কি বজর বজর করিয়া বকিতেছে। মাতাল কিছু ভাব বুঝিতে পারিল না। সে বিছানার এক কোণে গিয়া ভদ্র লোকটির মত চুপ করিয়া বসিল। ভাবিল, খানিকক্ষণ বাদে বোধ হয় এইখানে অমৃতবৃষ্টি হ'বে। মাতাল আকাশের দিকে তাকাইয়া মুখটী হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ বাদে নেশার ঝোঁকে মাতালের একটু তন্দ্রার আবেশ হওয়ায় সে শুইয়া পড়িল। পুরাণ পাঠ শেষ হইলে, সাধু শ্রোতাগণ সকলেই ভগবৎ-কথামৃত পান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আপনার আপনার বাড়ি চলিয়া গেলেন। মাতাল সেই বিছানার এক কোণে পড়িয়া রহিল। একটা কুকুর সেইখান দিয়া যাইতেছিল। তাহার প্রস্রাবের বেগ হওয়ায় সে উঁচু জায়গায় প্রস্রাব করিবে বলিয়া খুঁজিতেছিল। মাতালের মাথাটা উঁচু জায়গা পাইয়া সেইখানে বিলক্ষণরূপে প্রস্রাব করিয়া দিল। কুকুরের প্রস্রাবে

মাতালের মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ির চাকরেরা বিছানা উঠাইতে লাগিল। চাকরদের গুতা খাইয়া মাতালের চেতনা হইল। কুকুরের বিট্‌কেল প্রস্রাবের আস্বাদ পাইয়া মাতাল বিরক্ত হইয়া বলিল, "এ কি রকম তোমাদের অমৃতবৃষ্টি হ'লো বাবা, এযে বেজায় তেতো বৃষ্টি হ'য়ে গেল, ছিঃ বাবা। মুখটো খারাপ ক'রে দিলে।"

যাহারা মাতাল, এই সংসারক্ষেত্রে তাহাদের অদৃষ্টে কেবল কুকুরের মূত্রই আসিয়া জুটে। মোহরূপ মদিরায় উন্মত্ত জীব সংসারে অমৃত পান করিতে আসিয়া কেবল বিষ্ঠাকুণ্ডে চুমুক দিতেছে। এমন মনুষ্য-দেহ, এমন স্বচ্ছ পঞ্চেন্দ্রিয়, এমন পবিত্র আত্মা, এমন চিন্তা, এমন বুদ্ধি, এই সমস্ত অপূর্ব্ব উপকরণ প্রাপ্ত হইযাও জীব নিজ কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রস্তুত হয় না, ইহা বড়ই বিচিত্র প্রহেলিকা। এই সমস্ত উপকরণ কি কেবল সংসারের সেবার জন্যই ব্যবহৃত হইবে? এই যে চক্ষু, ইহা কি কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? এই যে রসনা, ইহা কি কেবল মৎস্য মাংসাদি খাদ্য বস্তুর রস গ্রহণ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? এই যে অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, চিন্তা ইহা কি কেবল সাংসারিক সুখোপায় ধনাদি অর্জ্জন করিবার জন্যই ব্যাপৃত হইবে? এই যে হস্ত ইহা কি কেবল কামিনীর কুচ-কমলের স্পর্শসুখ অনুভব করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? এই যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ইহা কি কেবল পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই ইহার জন্ম সার্থক হইবে? এমন যে মনুষ্য জীবন, ইহা কি কেবল সংসারের চরণতলে পিষ্টপেষিত হইবার জন্যই ব্যয়িত হইবে?

নাস্তিকেরা বলিয়া থাকেন, স্ত্রীর সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্যই চক্ষুর সৃষ্টি। সুতরাং সৌন্দর্য্য উপভোগেই চক্ষুর সার্থকতা হইয়া থাকে। মৎস্য মাংসাদি উপভোগের জন্যই রসনার সৃষ্টি। সুতরাং মৎস্য মাংস উপভোগ করিলেই তাহার জন্ম সার্থক হইয়া থাকে। ছাগাদি পশুহননে কিছুমাত্র পাপ নাই, উহারা মনুষ্যের খাদ্যের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। নচেৎ উহাদের মাংস খাইতে সুমিষ্ট লাগে কেন? এই অদ্ভুত যুক্তির উত্তরে এক মাতালের গল্প মনে হয়। এক মাতাল রাত্রিতে নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দুইটা বিড়াল পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে মাতালের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। বিড়ালের আঁচড় কামড়ে মাতাল জাগিয়া উঠিল ও বেজায় চিৎকার করিয়া বলিল, ও গিন্নি! শীঘ্র উঠ, আমায় সর্পাঘাত হইয়াছে। গিন্নি প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন, দুইটা বিড়াল ঝগড়া করিতে করিতে বিছানা হইতে চলিয়া গেল। গিন্নি বুঝাইলেন, তোমায় সাপে কামড়ায় নাই। বিড়ালে আঁচড়াইয়া দিয়াছে। অতএব তোমার কোন ভয় নাই, ঘুমাও। মাতাল কিছুতেই বুঝিল না। বলিল, তুমি গোল করিও না, আমায় ঠিক সাপে কামড়াইয়াছে। আরও পাঁচ জন আসিয়া বুঝাইতে লাগিল, দেখ, তোমার গায়ে বিড়ালের আঁচড়ের মত যখন দাগ রহিয়াছে, তখন তোমাকে বিড়ালেই কামড়াইয়াছে, সাপে কামড়ায় নাই। তখন মাতাল গম্ভীর ভাবে বলিল, তোমরা বলছ বটে, বিড়ালে কামড়াইয়াছে, আমি কিন্তু বুঝিতেছি আমায় ঠিক সর্পাঘাত হইয়াছে। কেন না সেটা যদি সাপ না হবে, তবে "ম্যাও ম্যাও" করিয়া ডাকিল কেন? মাতালের ইহা যেমন অদ্ভুত

যুক্তি, সেইরূপ নাস্তিকেরা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, ছাগাদি যদি মনুষ্যের ভোজনের জন্যই সৃষ্ট না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের মাংস মিষ্টি হইল কেন, এ যুক্তি মাতালের যুক্তির সহিত সমান কি না, পাঠক। তাহা ভাবিয়া দেখুন। এমন অসার যুক্তির আর কি খণ্ডন করিব ?

সাংখ্যদর্শন বলিতেছেন—

ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি রত্যন্তপুরুষার্থঃ।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশের নামই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ ধ্বংস হইলেই মানুষ মুক্তি বা পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কাম ক্রোধাদি জনিত দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ। পশু পক্ষী, ইত্যাদি জন্তু দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আধিভৌতিক এবং কাহারও স্কন্ধে ভূত, প্রেত, পিশাচাদির আবির্ভাব হইয়া যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। দেবতা প্রতিকূল হইয়া যে দুঃখ দেন, অর্থাৎ যাহার উপর মানুষের কোন সামর্থ্য নাই, তাহাই দৈব বা আধিদৈবিক দুঃখ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, হঠাৎ অপঘাতে মৃত্যু আদি কারণ হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাও আধিদৈবিক দুঃখ শ্রেণীর অন্তর্গত। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে জগতে যত রকমের দুঃখ থাকুক না কেন, সমস্ত দুঃখই পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানুষ সর্ব্বদা লালায়িত, মানুষ প্রতি পদক্ষেপে এই দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। মানুষের সমস্ত কর্ত্তব্য এই দুঃখ নিবারণোদ্দেশে ব্যয়িত হইতেছে। কিন্তু এই দুঃখ নিবারণের উপায়

কি ? টাকা কড়ি, ধন, দৌলত, মনোরম ভোগ পানাদি দ্বারা যদি উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের যথার্থতঃ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইত, তবে তাহাতেই পরমাশান্তি লাভ হইত। কিন্তু তাহাত হয না, তাই সাংখ্যপ্রণেতা কপিল ঋষি বলিতেছেন—

নদৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধি র্নিবৃত্তেপ্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ।

সাংসারিক উপায় দ্বারা দুঃখের যদি সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন হইত, তবে পুনবায় দুঃখ জাগিয়া উঠে কেন ? যদি ঔষধ দ্বারা রোগ চিরদিনের জন্য নির্ম্মূল হইয়া যাইত, বুঝিতাম দুঃখনিবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহা ত হয় না। যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, এক মুহূর্ত্তও শরীর রোগশূন্য থাকিতে পারে না। কোন না কোন রোগ শরীরে লাগিয়াই আছে। লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে রোগের ক্রিয়া প্রতিনিয়তই শরীরের উপর হইতেছে। তাই শাস্ত্র বলেন "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরং।" স্ত্রী সম্ভোগ দ্বারা যদি চিরদিনের জন্য কামের জ্বালা মিটিয়া যাইত, বুঝিতাম মনের তাপ মিটিয়া গেল। কিন্তু হায়! জগতের কোন তাপই মিটে না, বরং পুরুভুজকে কাটিয়া ফেলিলে যেমন তাহা আরও সহস্ররূপে বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখ মিটাইতে গেলে সহস্র ধারে দুঃখ আরও ফুটিয়া উঠে।

না জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামাগ্নি কাম্য পদার্থের উপভোগ দ্বারা কখনই শান্ত হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিলে তাহা যেমন আরও প্রজ্জ্বলিত

হয়, সেইরূপ কামানল কাম্য পদার্থের উপভোগে আরও পরিবর্দ্ধিত হয়।

যদি লৌকিকোপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি না হয়, তবে লোকের দুঃখ নিবৃত্তি জন্য লৌকিকোপায়ে প্রবৃত্তি হয় কেন, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—

প্রাত্যহিক ক্ষুৎ প্রতীকারকবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং।

লৌকিকোপায দ্বারা যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহাকে পুরুষার্থ বলা যায়, কিন্তু পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ পরমা শান্তি বলা যাইতে পারে না। পরম পুরুষার্থ তাহাই, যাহাতে দুঃখনিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। এবং যাহাদ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইলে দুঃখের আর পুনরুত্থান হয় না। হস্তী যেমন স্নান করিয়া জলাশয় হইতে উঠিবামাত্র গাত্রকে ধূলিধূসরিত করিয়া পুনরায় জলে গিয়া পড়ে, সেইরূপ পুরুষের দুঃখরূপ ধূলি ধনাদি দ্বারা কিয়ৎকাল বিধৌত থাকিলেও ক্ষণেক পরে পুনরায় দুঃখ ধূলিরাশির মধ্যে পুরুষ ডুবিয়া যান। সুতরাং কিয়ৎকালের জন্য লৌকিকোপায় দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে ক্ষুদ্র পুরুষার্থ বলা যায়, তাই ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের ইহাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নহে। যেমন বিষসংযুক্ত মিষ্টান্ন অতি উপাদেয় হইলেও পরিত্যজ্য, সেইরূপ দুঃখ মিশ্রিত সাংসারিক সুখ সর্ব্বথা পরিহার করা উচিত। দুঃখই সাংসারিক সুখের ভিত্তিভূমি। সাংসারিক সুখভোগ করিতে হইলে দুঃখকে সহচর করিয়া লইতে হয়। তুমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যে জলপান করিতে গেলে, যদি সেই জলের সহিত খানিকটা বিষ্ঠাও তোমার মুখে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাতে তোমার আরও দুঃখই বাড়িয়া যায়। সুতরাং যাহাতে

দুঃখের কণিকা নাই, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে সুখসুধার ধারা শুষ্ক মরুভূমে নির্ঝরিণীর মত আত্মক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত সুখ।

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রুতেঃ।

শ্রুতি বলিতেছেন ,—

"নাহ্যতস্যানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি বাহ্যাঃ।

এই মোক্ষ রূপ আনন্দের সহস্রাংশ করিয়া তাহার এক অংশকে আবার সহস্রাংশ করিলে যে এক অংশ বাহির হয়, তৎ-পরিমিত সুখও সাংসারিক ভোগপরায়ণ জীব প্রাপ্ত হন না। সুতরাং এই নিত্য-সুখের জন্যই বুদ্ধিমান্ মানবের চেষ্টা করা উচিত।

প্রবৃত্তির দাস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব আমরা সংসারকেই সুখের আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সাংসারিক সুখ ছাড়া আর যে কোন প্রকার সুখ হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণার বহির্ভূত। তাই সাংখ্যদর্শন যে সুখের চিত্র আঁকিয়াছেন, আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি না। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী পিঞ্জর ছাড়িয়া আকাশে উড়িতে ভয় পায়, কেন না পিঞ্জরে থাকিয়া থাকিয়া তাহার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ সংসার-পিঞ্জরবদ্ধ জীব, সংসার ছাড়িয়া অনন্ত সুখের আকাশে যাইতে ভয় পায়। সুখের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া উন্মুক্ত বিশাল ক্ষেত্রে যাইতে মানবের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। যাহা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া আর যে কোথাও সুখ নাই, এ ধারণা নিতান্তই সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক।

যাঁহারা দার্শনিক, তাঁহারা জানেন, কেবল বাহিরের শরীরটা লইয়া মানুষ নহে। বাহ্য শরীর, ইন্দ্রিয় সমূহ, মনোময় দেহ, এবং আত্মা এই কয়টার সমষ্টিই মানুষ। কেবল বাহিরের চর্ম্ম-ময়, মাংসময়, অস্থিময় আবরণটা লইয়াই মানুষ নহে। মানবের বাহ্য শরীর যেমন সুখ আস্বাদ করিবার একটা যন্ত্র স্বরূপ, সেই রূপ ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা এই কয়টাও সুখের নিকেতন-ভূমি। চক্ষু দিয়া যেমন স্ত্রীর সৌন্দর্য্য সুখ অনুভব করিতে হয়, সেইরূপ দেহ দিয়া তাহার আলিঙ্গন-সুখ বুঝিতে হয়, আবার মন দিয়া তাহার ভালবাসার আস্বাদ লইতে হয়। সুতরাং মানুষের যত গুলি সুখ লইবার দ্বার আছে, সকল গুলির ভিতর দিয়া সুখ অনুভব করাই মানুষের উদ্দেশ্য। শরীরকে সুখী করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় সমূহকে সুখী করিতে হইবে, মনকে সুখী করিতে হইবে। যে ব্যক্তির চক্ষু নাই, সৌন্দর্য্য দেখিয়া কি সুখ পাইতে হয়, সে তাহা জীবনে বুঝিল না। সুতরাং সুখের একটা অংশে তাহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইল। যাহার কর্ণ বধির, সে সুন্দর শব্দ সঙ্গীত আদি শুনিয়া যে সুখ পাইতে হয়, তাহা হইতে সে বঞ্চিত থাকিল। যাহার মন অশিক্ষিত, গভীর চিন্তা করিয়া যে সুখ পাইতে হয়, তাহা হইতে সে বঞ্চিত থাকিল। এইরূপ আবার যাহার যতগুলি মনোবৃত্তি আছে, সে ততগুলি মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ লাভ করে। যাহার দয়াবৃত্তি আছে, সে দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া যে সুখলাভ করিতে হয়, তাহার আস্বাদ সে জানে, যে নিষ্ঠুর, দয়াবৃত্তির ভিতর দিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে সে বঞ্চিত থাকিয়া গেল। যাহার অপত্য-স্নেহ রূপ মনোবৃত্তি আছে, সে সন্তান সন্ততিকে ভাল বাসিয়া বাৎসল্যরসের

ভিতর দিয়া এক প্রকার সুখলাভ করে। যাহার অপত্য-স্নেহ রূপ বৃত্তি নাই, বুঝিতে হইবে, পুত্রাদিকে ভালবাসিয়া যে সুখলাভ করিতে হয়, সে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেল। একটা গল্প বলিতেছি, একজন ইউরোপীয় জাহাজের নাবিক জাহাজের মাস্তুল হইতে কোন কারণে পড়িয়া যায়। মাস্তুল হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার মস্তিষ্কের যে অংশ বিদীর্ণ হইয়াছিল, তথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধাদি দিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসক বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহাকে কোন গতিকে প্রাণে বাঁচান। সেই নাবিক পীড়া হইতে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় সংসার-ধর্ম্ম করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বে পুত্রাদির প্রতি তাহার যে স্নেহটুকু ছিল, এখন সে টুকু একেবারে কোথায় উড়িয়া গেল। ছেলে কাঁদিলে এখন আর পূর্ব্বের মত তাহার প্রাণ বিগলিত হয় না। আর ছেলেকে লইয়া তেমন আদর বা স্নেহ সে কিছুই করে না। পুত্রের প্রতি এমন নির্ম্মম সে কেন হইল, এতদুত্তরে তাহার চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, মাস্তুল হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার মস্তিষ্কের যে অংশটা বিকৃত হইয়াছিল, সেই অংশটী অপত্য স্নেহ-বৃত্তির অধিষ্ঠান-ভূমি, ইহা শিরোবিদ্যার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। সেই অংশটা বিকৃত হইয়া যাওয়ার জন্যই উক্ত ব্যক্তির অপত্য-স্নেহ বৃত্তি লোপ পাইয়াছে। আমরা মাথার ঘা আরোগ্য করিয়াছি বটে; কিন্তু উক্ত বৃত্তির পুনঃস্থাপন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা ঈশ্বরের হাত।

যে অপত্যস্নেহ বৃত্তি এক সময়ে থাকার দরুণ নাবিক পুত্রকে কত সোহাগ করিয়া চুম্বন করিত, কত ভালবাসিত, সে বৃত্তি

উড়িয়া যাওয়ায় নাবিক এক্ষণে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইল। সুতরাং যাহার যতগুলি বৃত্তি বা সুখ অনুভব করিবার উপকরণ সকল বিদ্যমান বা পুষ্ট থাকে, সে সেই পরিমাণে সুখলাভ করে। যাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় বিকৃত, কেবল চারিটী মাত্র ইন্দ্রিয় যাহার ক্রিয়াশীল, সে ব্যক্তি অপেক্ষা যাহার পাঁচটা ইন্দ্রিয় পুষ্ট ও বিকাশী, সে ব্যক্তি বেশী পরিমাণে সুখী নয় কি? আবার যে ব্যক্তি কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াই সুখলাভ করে, সুশিক্ষিত মন দ্বারা উচ্চ চিন্তা করিয়া যে সুখ তাহা যাহার বুঝিবার সামর্থ্য নাই, এমনতর ব্যক্তি অপেক্ষা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবক অথচ সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি কি বেশী পরিমাণে সুখী নহে? আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনটীর ভিতর দিয়াই যে ব্যক্তি সুখলাভ করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা যে ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও আত্মা এই চারিটীর ভিতর দিয়া সুখলাভ করে, সে ব্যক্তি জগতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুখী নয় কি? সংসারের ভোগসুখ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিলাসলীলা ও সুশিক্ষিত মনের উচ্চ চিন্তার সঙ্গে যে ব্যক্তি নিজ আত্মার প্রকৃত সুখ পাইবার জন্য চেষ্টা পরায়ণ, সেই ব্যক্তিই জগতে সুখের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তুমি আমি কেবল ইন্দ্রিয় কয়টীর ভিতর দিয়া সুখ পাইলেই চরিতার্থ হই, কিন্তু যিনি প্রকৃত সুখের তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, আত্মা এই চারিটীর ভিতর দিয়াই সুখ পাইবার জন্য ব্যস্ত। তোমার আমার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, তাই শরীর এবং ইন্দ্রিয়, এই কয়টার ভিতর দিয়া সুখলাভ হইলেই মনে করি, সুখের চূড়ান্ত হইয়া গেল, যাঁহার দৃষ্টি আরও একটু উন্নত, বড় জোর তিনি শরীর ইন্দ্রিয় ও মন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই সুখভোগের সীমা শেষ করিয়া

ফিরিয়া আসেন, কিন্তু যাঁহার দিব্য-জ্ঞান জন্মিয়াছে, যাঁহার দৃষ্টি সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী পরিহার করিয়া অনন্ত আকাশের ঊর্দ্ধদিকে ছুটিয়াছে, তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ছাড়াইয়া এই জড়তাময় সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ ভেদ করিয়া আত্মতত্ত্বের অপূর্ব্ব ঊর্দ্ধধামে প্রবেশ করেন। যে নির্ম্মলধামে শান্তির খরতর স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে, শোক, তাপ, যন্ত্রণার মলিন ছায়া যথায় প্রবেশ করিতে পারে না, সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সুধার সুশীতল মন্দাকিনীতে স্নান করিলে জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়। সেই শান্তিসরোবরে অবগাহন করিলে, সংসারের দাব-দহন-দগ্ধ মনঃ, প্রাণ, আত্মা চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যায়। পূর্ণচন্দ্রমার বিমল কৌমুদীচ্ছটায় অন্ধকার যেমন দূরে পলাইয়া যায়, সেইরূপ জীবের মর্ম্মদেশে যে অতৃপ্তি অন্ধকার চির দিন হইতে স্থিরিয়া রহিয়াছে, আত্মার শুভ্র জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত হইলে তাহা কোথায় চলিয়া যায়।

ইন্দ্রিয়ের কীট আমরা ইন্দ্রিয়ের সুখ ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। ক্ষুদ্র বালক যেমন যুবতীর সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞান-শিশু আমরা আত্মার সুখ, আত্মার সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি না। কেলয়াতি গান যে বুঝে না, তাহার পক্ষে তাহা একটা বিকট কুশ্রাব্য গর্দ্দভস্বর ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু কেলয়াতি গান শিক্ষা করিয়া তাহার সুর তাল লয় যখন বুঝিয়া লইলাম, তখন সেই কেলয়াতি গান আমার পক্ষে সুমিষ্ট পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার প্রত্যেক তান কারিতে আমি মোহিত হইয়া যাই, ঘাড় নাড়িয়া,

আনন্দে সেই তালে তাল দিতে ইচ্ছা হয়। কেঁলয়াতি গান বুঝিবার বৃত্তি যখন আমি অর্জ্জন করিলাম, তখন সেই জিনিষটী আমার পক্ষে সুখময় হইল। সেই রূপ আত্মতত্ব বুঝিবার বৃত্তি অগ্রে উপার্জ্জন কর, দেখিতে পাইবে, তাহা কত সুন্দর সুমিষ্ট পদার্থ। পক্ষাঘাতে যাহাব অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, স্পর্শশক্তি যাহা হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সুন্দর কোমল স্পর্শ বুঝিবার যেমন সামর্থ্য থাকে না, সেই রূপ আমাদেব আত্মা ভব-রোগের পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাই তাহার ভিতর দিয়া বিমল সুখ অনুভব কবিবাব সামর্থ্য আমাদেব নাই। যেমন কোনও অন্ধকে আমরা বলি, এ ব্যক্তি চক্ষুর সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেল, সেই রূপ জ্ঞানান্ধ আমরা, আমাদের ভাবা উচিত, আত্ম-সুখে আমরা বঞ্চিত থাকিয়া গেলাম। যেমন কোন নপুংসক ভোগ-সুখে বঞ্চিত থাকিয়া যায়, সেইরূপ বুঝিতে হইবে আমরাও আত্ম-সম্বন্ধে নপুংসক থাকিয়া গেলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীব, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, এই চারি-টীকে লইয়া যিনি সুখী, তিনিই প্রকৃত সুখী। যিনি কেবল শরীরের উন্নতি করিতে গিয়া, আত্মার অবনতি করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার উন্নতি আদর্শ হইতে পারে না। যিনি কেবল মদ্য মাংসাদি ভোজন ও পাশবিক আচার করিয়া আত্মাকে কলঙ্কিত করিলেন, তিনি আদর্শ উন্নতির পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। আবার যিনি সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিলেন, তাঁহারও উন্নতির চিত্র আদর্শ নহে। তাই তাঁহাকে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইতে হয়। তাই শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট এক

জন সন্ন্যাসী থাকিতেন, তিনি কখনও বিবাহ করেন নাই। চির-কাল তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। অবশেষে শেষ দশায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি মুঙ্গেরে গিয়া একজন ঘোড়ার ঘেসেড়ার স্ত্রীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া শেষ জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। ইহা অতিরঞ্জিত গল্প নহে, এইরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত আমি দেখাইতে পারি। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, এই চারিটীকে বজায় রাখিয়া, যিনি উন্নতি করিতে পারেন, তিনিই জগতে পদাঙ্ক রাখিয়া যান। তাঁহার পদস্খলন সহজে হয় না। কেবল শরীর লইয়াই থাকিলে চলিবে না, কেবল ইন্দ্রিয় লইয়া লীলা করিলে চলিবে না, আবার কেবল আত্মজ্ঞান লইয়া সন্ন্যাসীর ভাণ করিলেও চলিবে না, শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মা এই চারিটিকে পরস্পর অবিরোধিতার সূত্রে গ্রথিত করিয়া যিনি কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া যান, তিনিই সুখের পূর্ণতার সাগরে নিমগ্ন হইতে পারেন। শরীর খুব বেশ ভূষায় সজ্জিত কর, খুব আতর, পমেটম, গোলাপজলে দেহ কুসুমকে সুশোভিত কর, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিও, এ জগতে যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হইলাম। দুইটি ভ্রাতা সন্ধ্যাবেলা ভ্রমণার্থ বাড়ীর বাহির হইলেন, একজন বেশ্যাবাড়ীতে গেলেন, একজন পুরাণ পাঠ শ্রবণের জন্য কথক ঠাকুরের কাছে গেলেন। বেশ্যাবাড়ীতে যিনি গিয়া-ছেন, তিনি বেশ্যাকে নিজ অঙ্গে তুলিয়া তাহার সুচারু বদন-কমলে চুম্বন করিয়া ভাবিতেছেন, আমি এই সন্ধ্যার সময় বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিতেছি, আর দাদা আমার পুরাণ-পাঠ শুনিয়া ভগবৎ-কথামৃত পান করিয়া কত আনন্দ লাভ

করিতেছেন। আমি এমনই পাপী, যে বেশ্যা লইয়া আমার আনন্দ, আর দাদা আমার এমনই পুণ্যবান, যে, ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার আনন্দ। হায়। আমি যদি অদ্য পুরাণ-পাঠ শুনিতে যাইতাম, তাহা হইলে অদ্য দাদার মত আমিও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনিয়া ধন্য হইতে পারিতাম। আমার পুণ্যও হইত, আনন্দও হইত। আর যিনি দাদা, যিনি কথক ঠাকুরের কাছে পুরাণ-পাঠ শুনিতে গিয়াছেন, তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, আমার ছোট ভাই বেশ্যাবাড়ী গিয়া এই সময় কত মজাই মারিতেছে, কত ফুর্ত্তিই করিতেছে, বেশ্যার অধর-সুধা কেমন তৃপ্তি পূর্ব্বক পান করিতেছে। আর আমি হতভাগ্য কথক ঠাকুরের এই এক ঘেয়ে ঘ্যানন্ ঘ্যাননময় ধর্ম্মকথা শুনিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি। আমি যদি আজ বেশ্যাবাড়ী যাইতাম, তবে ছোট ভাইয়ের মত আমিও আজ কত আমোদ কত স্ফূর্ত্তি উপভোগ করিতে পারিতাম। ধিক্ আমাকে। এখন পাঠক! বিবেচনা করুন, এই দুই ভায়ের মধ্যে কাহার প্রকৃত বেশ্যা গমন ও পুরাণ পাঠ শ্রবণ হইতেছে। বড় ভাই পুরাণ-পাঠ শুনিতে আসিয়াও বেশ্যার দিকেই মনকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মন বেশ্যাবাড়ীতে গিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আর ছোট ভাই যদিচ প্রবৃত্তির তাড়নায় বেশ্যাবাড়ী গিয়াছে বটে, তথাপি তাহার মন পশ্চাত্তাপানলে দগ্ধ হইতেছে। এই সংসার-ক্ষেত্রে সকলেই আমরা কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি। প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ভোগবাসনা মিটাইবার জন্য সংসারে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছি। যখন মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছি, তখন পুণ্য ও পাপ সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ এই উভয় বৃত্তিই যুগলমূর্ত্তি রূপে আমাদের

ভিতর বিরাজ করিতেছে।• সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দুই বৃত্তিরই ক্রিয়া করিতে আমরা বাধ্য। আমাদিগকে রাজসিক-বৃত্তি ভোগবাসনাও চরিতার্থ করিতে হইবে, আবার সাত্ত্বিক-বৃত্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়া পরম শান্তিনিকেতনের যাত্রী হইতে হইবে। ঐ ছোট ভাইদের মত আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—

অত্যৈব ব্যর্থতাং নীতং তব ভোগ প্রলোভিনা।
কাচ মূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণি ময়া॥

হায়! এমন অমূল্য মনুষ্য জীবন কেবল সংসার-ভোগের জন্যই ব্যয় করিতেছি। এমন অমূল্য স্পর্শমণি কাচ মূল্যে আমি বিক্রয় করিতেছি।

অজানন্ দাহার্ত্তিং পততি শলভস্তীব্রদহনে।
ন মীনোপি জ্ঞাত্বা বড়িশযুতমশ্নাতি পিশিতং॥
বিজানন্তোপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জাল জটিলান্।
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহ মহিমা॥

পতঙ্গ অগ্নির দাহকতা শক্তি জানে না বলিয়াই তাহার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়ে, মৎস্য না বুঝিয়াই মাংসাচ্ছন্ন বড়িশ গলাধঃকরণ করে। কিন্তু হায়! আমরা জানিয়া শুনিয়াও বুঝিয়া শুঝিয়াও এই বিপজ্জাল-জড়িত ভোগ বাসনাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতেছি। আমাদের কি গভীর উন্মত্ততা।

চিরং ধ্যাতা রামা ক্ষণমপি ন রাম প্রতিকৃতিঃ।
পরং পীতং রামাধরমধু ন রামাজ্জ্রি সলিলং॥
নতা রুষ্টা রামা বহুরচি ন রামায় বিনতি,
গতং মে জন্মাগ্রং ন দশরথজন্মা পরিগতঃ।

রামা অর্থাৎ স্ত্রীমূর্ত্তি এ জীবনে চিরকালই ধ্যান করিতেছি, কিন্তু হায়! এক দিনেব তরেও রাম অর্থাৎ ভগবানেব মূর্ত্তি ধ্যান করিতে পারিলাম না। রামা অর্থাৎ স্ত্রীব অধর-মধু চিরদিনই পান কবিতেছি, কিন্তু হায়! এক দিনের তরেও ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের চরণামৃত পান করিলাম না। ক্রুদ্ধ স্ত্রীব পদতলে কত প্রণাম করিলাম, কিন্তু হায়! এক দিনের তরেও ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম কবিতে শিখিলাম না। স্ত্রীর কুচযুগল কত চন্দন দ্বারা ভূষিত কবিলাম, তাহার শিরোদেশ কত প্রস্ফুটিত কুসুমে শোভিত করিলাম, স্ত্রীকে প্রসন্ন কবিবার জন্য কতবার, স্তব, স্তুতি, মিনতি করিলাম, কিন্তু হায়! এ সমস্ত পূজা অর্চ্চনার ব্যাপার এক দিনের তরেও ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম না। হায়! প্রবৃত্তির দারুণ উন্মত্ততায় আমাদের বিবেকশক্তি পরাজিত হইয়াছে, এমন শক্তি নাই, যে, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গাত্রোত্থান করি, প্রভো! শক্তি দাও! বল দাও, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা দাও, হৃষীকেশমূর্ত্তিতে অন্তর্যামী হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে সুপথে পরিচালিত কর।

এইরূপ গভীর চিন্তা যাহার অন্তঃকরণে ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত থাকে, সংসারের সহস্র প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও তিনি একদিন সংসার ফুঁড়িয়া উঠিবেন ইহা নিশ্চিত কথা। আজি যাঁহাকে তুমি ঘোর সংসারাসক্ত বিষয়ী বলিয়া স্থির করিয়াছ, মনে রাখিও, হয়ত তাঁহারই ভিতরে অপূর্ব্ব রত্নরাজি প্রজ্জলিত হইতেছে। সংসারের ভোগ-বাসনায় যদিচ তিনি বিজড়িত, কিন্তু তাহাতে তিনি ডুবিয়া যান নাই। যেমন

এক ব্যক্তি একটু মদ খাইয়াই মাতাল হয়, অপর ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে মদ খাইয়াও স্থির থাকে, সেইরূপ অনাসক্ত ভোগী যিনি, তিনি সাংসারিক মদ খাইয়াও মাতাল নহেন, ভোগবাসনা-মদিরার স্বাদ লইয়াও তাঁহার পা টলিতেছে না, তাঁহার মস্তিষ্ক বিচলিত হইতেছে না। তিনি ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াও ইন্দ্রিয়ের দাস নহেন, তিনি বিষয়ের সেবা করিয়াও বিষয়ের কীট নহেন। তিনি প্রেমময়ী কামিনীর প্রেমাস্বাদ করিয়াও অনাসক্ত থাকেন।

আজ বশিষ্ঠদেবকে দেখিতে পাই, তিনি অরুন্ধতীকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিয়াও ভোগী আখ্যার পরিবর্ত্তে মহর্ষি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ জনকও রাজত্ব করিয়াও রাজর্ষি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা দুই জনেই আদর্শ অনাসক্ত ভোগী। কিন্তু অনাসক্ত ভোগীর চূড়ান্ত চিত্র যদি দেখিতে হয়, তবে মহাদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। মহাদেব মহাযোগীন্দ্র পুরুষ হইয়াও পার্ব্বতীর প্রাণবল্লভ। উভয়ের প্রীতি—প্রেম—প্রণয় এত গাঢ়—এত গভীর যে, আধা আধি ভাবে অভিন্নরূপে সংমিশ্রিত হইয়া উভয়ে অপূর্ব্ব যুগল মিলনের অদ্বিতীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমন যোগ ও ভোগের, প্রেম ও বৈরাগ্যের, আসক্তি ও অনাসক্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞান বৈরাগ্য ও ত্যাগের উচ্চশাস্ত্র সাংখ্য দর্শনও বলিয়াছেন—

"ভুক্ত ভোগাম্যজাঃ।"

"প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিয়া যাঁহারা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ

করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ।" সুতরাং প্রকৃতি ও আত্মা, সংসার ও মুক্তি, ভোগ ও যোগ, আসক্তি ও ত্যাগ এই দুইটী জিনিষের ভিতর দিয়া যাঁহারা জগতে সুখলাভের চেষ্টা করেন, তাঁহারাই জগতে সুখের আদর্শ চিত্র দেখাইয়া যান। কেবল প্রকৃতি লইয়া আসক্ত হইলে সুখের আদর্শ চিত্র হইতে স্খলিত হইতে হয়, আবার একবারেই অগ্র হইতেই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির সম্ভোগ না করিয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যে বিচরণ করিতে গেলে পথভ্রষ্ট হইতে হয়। সুতরাং প্রকৃতিও চাই, আত্মাও চাই। শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মা এই চারিটির ভিতর দিয়া জগতে সুখ লাভ করিতে হইবে। যাঁহারা শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া সাংসারিক সুখ উপভোগ করিয়া তাহার অনিত্যতা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিয়া অধ্যাত্ম-সুখ পাইবার জন্য লালায়িত হন, তাঁহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা এই বহির্জ্জগৎকে অন্তর্জ্জগতের বিকাশ বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা সাংসারিক সুখকে আধ্যাত্মিক সুখের নকল মনে করিয়া তাহার নকলত্ব অনুভব করিয়া আসলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারাই জগতে প্রকৃত সুখী। যাঁহারা এই বাহিরের জগতে অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান, যাঁহারা সাংসারিক ভোগ-সুখকে বিধাতার কৃপাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহারা এই অনন্ত বৈচিত্র্যশালিনী প্রকৃতিকে বিধাতার বিচিত্র বিভূতি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই দিব্যধামের আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়-সমূহ-পরিপূরিত বিচিত্র মানসিকবৃত্তি-সমন্বিত মনুষ্য-জীবন-রূপ পুষ্প-বৃক্ষটিকে সংসারে লালিত পালিত করিয়া তাহাকে নবনধর ফুলপল্লবে

সুশোভিত করিয়া বিধাতার চারুচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত করেন, তাঁহারাই জগতে প্রকৃত সুখী। যাঁহারা অনাসক্ত হইয়া ফুটন্ত যুবতীর প্রেম উপভোগ করিতে শিখিয়াছেন, জনক রাজার বৈরাগ্য হৃদয়ে পুরিয়া নিজের স্নেহের পুত্রের মুখ চুম্বন করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন জগতে দুঃখটুকু বাদ দিয়া কিরূপে ছাঁকা সুখ ভোগ করিতে হয়। যাহারা প্রিয়তমা ভার্য্যার সুকোমল ভুজপাশে জড়িত হইয়াও জ্বলন্ত চিতানলপূর্ণ বৈরাগ্যসূচক শ্মশান-ভূমির চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই সংসারের কোন ঘোর দুঃখ হঠাৎ উপস্থিত হইলে অবিচলিত চিত্তে স্থির ধীর থাকিতে পারেন। এই অনাসক্ত ভোগী পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যায় সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া বিচরণ করেন। যেমন সরোবরের পঙ্কে পাঁকাল মৎস্য সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিলেও তাহার গায়ে একটুও কর্দ্দম লাগে না, সেইরূপ এই সংসারের ময়লা মাটি মাখা কর্দ্দম রাশি অনাসক্ত ভোগীকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে জ্ঞান রাজ্যের ভিতর দিয়া অনাসক্ত ভোগী হওয়া বড় শক্ত কথা। অনেকে এই অনাসক্ত ভোগীর ভাণ করিয়া নাস্তিকতায় ডুবিতে পারেন। বেশ্যাগমন করিয়া অনেক লম্পট মনে করিতে পারে, আমি অনাসক্ত হইয়া বেশ্যাভোগ করিলাম, মাতাল মনে করিতে পারে, আমি অনাসক্ত হইয়া মদ্য পান করিলাম। কিন্তু অনাসক্তি মুখের কথা নহে। যিনি আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, যিনি দেহেন্দ্রিয় আদি হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই সংসারে অনাসক্ত বা নির্লিপ্ত হইতে পারেন। আত্ম-

জ্ঞানের ভিতর দিয়া যে অনাসক্তি তাহাই প্রকৃত অনাসক্তি। যুক্তির ভিতর দিয়া যে অনাসক্তি তাহা ভাণ মাত্র। যুক্তি ও আত্মজ্ঞান, এই দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ। যুক্তিশালী ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না। কলিযুগে এই জ্ঞানমার্গে সিদ্ধি লাভ করা বড়ই কঠিন। কামনা, আসক্তি ও মায়া-মমতার দাস কলিযুগের জীবের পক্ষে জ্ঞানযোগ বড়ই দুর্গম-পথ। সুতরাং বর্ত্তমানকালে জ্ঞানের পথে থাকিয়া সংসারে অনাসক্ত ভোগী হওয়া নিতান্তই কঠিন কথা। আবার যুক্তির ভিতরে থাকিয়া যাঁহারা আপনাকে অনাসক্ত মনে করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। সুতরাং বর্ত্তমানকালে জ্ঞান ও যুক্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কোন পথে অনাসক্ত ভোগী হইবার উপায় থাকে, তবে তাহা ভক্তির পথ। এমন সুন্দর পথ আর নাই। এমন শান্তির পথ আর নাই। শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মা এই চারিটির ভিতর দিয়া সুখ লাভের চিত্র যে পূর্ব্বে আঁকিয়াছি, তাহা এই ভক্তির পথেই সম্পন্ন হইতে পারে। ভক্তির পথে জীবের দেহ আরাম লাভ করে, মন সুশীতল হয়, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয়, আত্মা চিরদিনের জন্য শান্তি লাভ করে। জ্ঞানের পথে আত্মার সুখ হইতে পারে, কিন্তু দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের সুকোমল কণ্ঠদেশে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইতে হয়। আবার ভোগ বিলাসের পথে দেহেন্দ্রিয়াদির সুখ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের আত্মা অশান্তির চিতানলে চিরদিন দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব এমন পথ ধরা চাই, যে পথে অগ্রসর হইলে আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদি সকলেই পরস্পর অবিরোধী হইয়া সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে, যাহাতে

সকলেই 'দেহেন্দ্রিয়াদি' সুখ হইতে বঞ্চিত না থাকে, তাহার বিধান করাই প্রকৃত উন্নতির চিত্র। যেমন কোন পরিবারে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব থাকিলে পরিবারটী শান্তিপূর্ণ হয়, সেইরূপ শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও আত্মা এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব থাকিলে মনুষ্যজীবন শান্তিপূর্ণ হয়। ভাইগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিলে সংসার ঘোর অশান্তিপূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে জীব-জীবন জঞ্জালময় হইয়া উঠে। শরীরকে কষ্ট দিয়া আত্মার সুখ সাধন করিতে গেলে শরীরের সহিত শত্রুতা করা হয়, ইন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক চাপিয়া আত্ম-সুখ অন্বেষণ করিতে গেলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিরোধ করা হয়। আবার আত্মাকে যন্ত্রণাগ্রস্ত করিয়া কেবল শারীরিক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখে নিমগ্ন হইলে আত্মার সহিত বিরোধ করা হয়। যাহাতে কাহারও সহিত বিরোধ না হইয়া শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা সকলেই সমভাবে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, তাহার সদ্ব্যবস্থাই শান্তির আদর্শ চিত্র। ভক্তিরাজ্যেই এই আদর্শ চিত্র পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তের প্রাণ ভক্তির ঠাকুরকে ভাল বাসিয়াই তৃপ্তি লাভ করে। ভক্তের চক্ষুরিন্দ্রিয় সেই ত্রিভুবন মনোমোহন শ্যামসুন্দর মধুর মূরতি দেখিয়া দরবিগলিতাশ্রুধারে বিগলিত হয়। ভক্তের রসনা ভগ-বদ্‌গুণগাথা গান করিয়া পাষণ্ডকেও মোহিত করিয়া দেয়। ভক্তের শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার মাহাত্ম্য-কথার অমৃতরসে পরি-তৃপ্ত হয়। ভক্তের শরীর ভাবাবেশে পুলকিত হইয়া প্রফুল্ল সহস্র দল কমলের মত হাসিয়া উঠে। ভক্তের আত্মা সেই ভক্তি-

কল্পতরুর সুশীতল প্রেমাম্বুনিব অতল তলে নিমগ্ন হইয়া পবমা শান্তি লাভ কবে। সুতবাং যাহা পাইলে আমাব শবীব, মন, প্রাণ, আত্মা সকলেই পরমানন্দসাগবে অবগাহন করে, আমি সেই শান্তিব কাঙ্গাল। যে অমৃত প্রাপ্ত হইলে আমাব মানবীয় প্রকৃতিব প্রত্যেক অণু পবমাণু আনন্দে নাচিবা উঠে, যে সুখসুধাব ধাবা প্রবাহিত হইয়া আমাব দেহ মন আদি বিশুষ্ক নদ নদী সমস্তই প্লাবিত কবিয়া দেয়, আমি তাহা লইবাই জুড়াইতে চাই। চাতকিনী মেঘকে পাইলে যেমন আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়, কুমুদিনী চন্দ্রমাকে দেখিতে পাইলে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, মলয় মারুতকে প্রাপ্ত হইলে পত্রহীন বৃক্ষ যেমন আনন্দে অধীব হইযা নব নধর শোভায় সজ্জিত হয়, সেইরূপ আমার জীবপ্রকৃতি যাঁহাব অনন্ত সুন্দর মাধুরীচ্ছটা দেখিয়া চিরদিনের জন্য চরিতার্থ হইয়া যায়, আমি তাঁহাবই চারু চবণবশ্মির ভিখাবি। আমাব শবীব যাঁহাব সেবক হইবা চিরকৃতার্থ হইতে পাবে, এই বিচিত্র ভোগপূর্ণ সংসাবকে যাঁহাব চবণে নৈবেদ্য রূপে নিবেদন করিয়া আমার ইন্দ্রিয় বাশি যাঁহাব প্রীতিপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পাবে, আমার আত্মা যাঁহার প্রেমসমাধিতে সমাহিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখসুধার ধারায় চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হইয়া যাইতে পাবে, যদি তাঁহাকে না পাইলাম, তবে এ মনুষ্যজীবনে করিলাম কি ? যিনি আমার ইন্দ্রিয়েব সারসম্পত্তি, যিনি আমার আত্মার প্রাণসখা, যদি এ মনুষ্যজীবন-পুষ্পাঞ্জলি তাঁহাব চবণে উপহার দিতে না পারিলাম, তবে এ সংসারে আসিয়া কবিলাম কি ? যিনি যোগীব কাছে যোগীশ্বব, বেদান্তী জ্ঞানীব কাছে চিন্ময় পরব্রহ্ম, ভক্তের কাছে

তিনিই দয়ার ঠাকুর, প্রেমিকের কাছে তিনিই আনন্দঘনমূর্ত্তি প্রেমের দেবতা। বেদান্তীর আত্মা আর ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ একই পদার্থ। তাই ব্রজগোপিকা বলিতেছেন—

> ন খলু গোপিকানন্দনোভবান্,
> অখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
> বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে,
> সখ উদেযিবান্ সাত্বতাং কুলে।

প্রভু! তুমি গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বটে, কিন্তু তুমি যে বাস্তবিকই গোপপুত্র, তাহা নহ। তুমি নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি আত্ম-স্বরূপ। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ সাধন জন্য তুমি গোপ-কুলে জন্মিয়াছ।

যোগী নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মনোলয় করিয়া যাঁহার দর্শনার্থ ধাবিত হইয়াছেন, বেদান্তী কটু কঠোর অদ্বৈতবাদের ভিতর দিয়া যাঁহাকে পাইবার জন্য ছুটিয়াছেন, ত্যাগী বিরাগী নিজের সমস্ত সুকোমল মনোবৃত্তি বৈরাগ্যের খর্পরে বলিদান দিয়া সেই ছিন্নমুণ্ড গলদেশে বাঁধিয়া ভৈরবী মূর্ত্তিতে যাঁহার উদ্দেশে ছুটিয়াছেন, ভক্ত নিজ হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির সুকোমল কুসুমাস্তরণ বিছাইয়া সেই সাধের ধন ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুর রাঙ্গা চরণ পাইবার জন্য সানন্দমনে যাত্রা করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তের ঈশ্বর যোগী বা জ্ঞানীর ঈশ্বর হইতে কোনমতে ক্ষুদ্র নহেন। ভক্তের ঈশ্বর ভক্তকে আশ্রয় দেন, শরণাগতকে বুকে করিয়া রক্ষা করেন। কিন্তু জ্ঞানীর সে আশা নাই। তাই তুলসীদাস বলিয়াছেন—

যো যাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছলি চলে বহ যায় গজরাজ॥

যে যাহার শরণাগত হয়, সে তাহার লজ্জা রক্ষা করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র মৎস্য পদ্মানদীর শরণাগত হইয়া তাহার ক্রোড়ে বাস করিয়া থাকে, তাই সে অবলীলাক্রমে পদ্মানদীর বক্ষে উজান বহিয়া যাইতে পারে, পদ্মার তরঙ্গের প্রতিকূলে সে ছুটাছুটী করিতে পারে, কিন্তু বলবান্ হস্তী সেই তরঙ্গের প্রতিকূলে যদি ধাবিত হয়, তবে সে তরঙ্গবেগে কোথায় ভাসিয়া যায়। তাহার ঠিকানা কিছুই পাওয়া যায় না। সেইরূপ ভক্ত ভগবানের শরণাগত। যদি কোনরূপে ভ্রমক্রমে ভগবানের নিয়মের প্রতিকূল স্রোতে গিয়া সে পড়ে, তাহা হইলে ভগবান্ তাহার লজ্জা রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু হস্তীর ন্যায় নিজ বলগর্ব্বে গর্ব্বিত জ্ঞানী যদি সাধন-মার্গে পথভ্রষ্ট হইয়া বিধাতার নিয়মের প্রতিকূল স্রোতে গিয়া পড়ে, তবে সে কোথায় ভাসিয়া যায়। তাই পথভ্রষ্ট জ্ঞানীর পুনরুত্থান বড়ই কঠিন। কিন্তু পথভ্রষ্ট ভক্তকে বিধাতা নিজ মঙ্গলময় হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান।

ভক্তির মত সুন্দর জিনিষ জগতে আর নাই। ভক্তির মত শান্তিময় অবলম্বন জগতে আর নাই। ভক্তি নিরাশকে আশাযুক্ত করে, সংসারের দাবদহন-দগ্ধ জীবকে শান্তির পথ দেখাইয়া দেয়। ভক্তি ব্যথিতকে প্রফুল্ল করে, পীড়িতকে নীরোগ করে, দুর্ব্বলকে বলীয়ান্ করে। ভক্তি মৃতকে জীবিত করে, মূর্চ্ছিতকে সচেতন করিয়া দেয়। বৈজ্ঞানিক পুরুষ ভক্তিকে মানবিক দুর্ব্বলতা

বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন, আমরা কিন্তু সেই দুর্ব্বলতাকেই, লইয়াই জুড়াইতে চাই। যে ভক্তির তীব্রতেজে প্রহ্লাদ স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে ভগবদ্‌বিভূতির আবির্ভাব করিতে পারিয়াছিলেন, যে ভক্তির তেজে চৈতন্যদেব একদিন বিশুষ্ক মরুভূমে শীতল জলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিকে যাঁহারা মনের দুর্ব্বলতা বলিয়া উপেক্ষা করেন, যখন কোন চিকিৎসকের অসাধ্য উৎকট ব্যাধি তাঁহাদের উপস্থিত হইবে, তখনই তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। এখনও ভক্তির ফল লৌকিক জগতে কত শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দারুণ অসাধ্য শূলরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকের নিকট হতাশ হইয়া যখন কোন রোগী বাবা বৈদ্যনাথের শরণ লয়, তখন স্বপ্নে ঔষধ পাইয়া সে ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হয়। ইহার প্রমাণ স্বচক্ষুতে পরীক্ষা করিয়া অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং ভক্তির আকর্ষণী শক্তি বিশ্ববিধাতার কৃপাদৃষ্টি এজগতে আকর্ষণ করিয়া আনে। ভক্তি লৌকিক অলৌকিক ইহলোক পরলোক সর্ব্বত্রই কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। অবিশ্বাসীর কথা উপেক্ষা করিয়া নাস্তিকের কথা পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া আসুন, ভক্তি-কল্পতরুর চরণতলে দাঁড়াইয়া আমরা প্রার্থনা করি, দেব! ভক্তি ভক্তি করিয়া চীৎকার করিতেছি, কিন্তু ভক্তি কি জিনিষ তাহা বুঝিলাম না। তুমি বুঝাইয়া দাও, তোমায় কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়। সর্ব্বদাই সংসারের ধনজন-চিন্তায় প্রাণ বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে, একদিনের তরেও প্রভু! তোমার জন্য কাঁদিতে শিখিলাম না। কত অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, কত মান সুখ্যাতি যশ বাহবা

এঙ্গগতে পাইলাম, কিন্তু প্রাণের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটিল না। অভাব—আকাঙ্ক্ষা—তৃষ্ণার শত বৃশ্চিক দংশন-যন্ত্রণা প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। প্রভু! এ প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া দাও। হৃদয়ের বহ্নিশিখা তোমার ঐ চরণ-সরোজ-নিঃসৃত সুধাবর্ষণে শান্ত করিয়া দাও। এ দীন দুঃখী শান্তির কাঙ্গালকে তোমার শান্তিধামের পথ দেখাইয়া দাও।

মাটীর মানুষ।

আমি বুঝিতে পারি না, মানুষ কেন অভিমান করে, কেন মানুষ মাটির মানুষ হইতে জানে না। অহঙ্কার করিবার সামর্থ্য যদি মানুষের থাকে, তবে অহঙ্কার করুক, কিন্তু সে সামর্থ্যে সম্পূর্ণ হীন হইয়াও মানুষ গর্ব্ব-পর্ব্বতের উচ্চশিখরে কেন বসিয়া থাকিতে চায়, আমি শত চিন্তা করিয়াও তাহার কূল কিনারা কিছুই পাই না। গুণের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, ধনের অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, পদের অভিমান, রূপের অভিমান, সৌন্দর্য্যের অভিমান, বুদ্ধির অভিমান এইরূপ কত সহস্র অভিমান মানুষকে ঘিরিয়া থাকে। মানুষ অহঙ্কারের উচ্চসীমায় বসিয়া মনে করে, এই পৃথিবী এত ক্ষুদ্র যে আমার এই বিরাট বিশাল কলেবর ইহা ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে। ইহা এত সঙ্কীর্ণ যে আমার পা ফেলিবার স্থান ইহাতে নাই। আমি এত লেখা পড়া শিখিয়াছি যে এ ক্ষুদ্র পৃথিবী তাহার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহে। আমি এতই জ্ঞান-গরিমায় গুরুভার হইয়া

উঠিয়াছি, যে এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র তুলাদণ্ড সে ভার বহন করিতে সমর্থ নহে। আমি এমন উচ্চপদ পাইয়াছি যে সেই উচ্চস্থানে বসিয়া এই সংসারের ক্ষুদ্র কাটগুলিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়। কত উমেদার একটি চাকুরি পাইবার জন্য আমার তোষামোদ করিতেছে, আমি যদি তাহাদের কাহারও দিকে একবার কটাক্ষপাত করি, তবে সে চাকুরি পাইয়া চির কৃতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং এই ক্ষুদ্র মনুষ্যগুলিকে যদি আমি নগণ্য মনে করি, তাহা হইলে আমার যে ভুল হইয়াছে, ইহা মনে করা ঠিক নহে। এইরূপ অভিমানে সত্য সত্যই অনেক পদস্থ বাবু একেবারে দিশাহারা হইয়া যান। একটা গল্প বলিতেছি। একজন রজকবংশীয় বাবু বর্ত্তমান সভ্যতাময় ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া কোন আপিসের হেডক্লার্কের পদ পান, তিনি আপিসের হেড্‌বাবু, কাযেই তাঁহার কাছে চাকুরীর জন্য অনেক উমেদার জুটিত। বাবুর বাড়ীতে কি প্রাতঃকালে কি সন্ধ্যার সময়ে সর্ব্বদাই উমেদারের ভিড় লাগিয়া যাইত। বাবু একে জাতিতে ধোপা, তাহাতে অত বড় উচ্চপদ পাইয়াছেন, আর সর্ব্বদাই তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ জাতীয় ব্রাহ্মণ আদি উমেদারগণ তাঁহার স্তুতি মিনতি বিবিমতে করিত, কাযেই তাঁহার অহঙ্কারের মাত্রা যে কিরূপ সপ্তমে চড়িয়াছিল, তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। একদিন ধোপাবাবু বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তাস খেলিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ উমেদার তাঁহার কাছে কাতরকণ্ঠে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "আর কতদিনে আপনার আমার প্রতি দয়া হইবে? দেখুন বিগত চার বৎসর হইতে আপনি আমায় চাকুরির আশা দিয়া রাখিয়াছেন, তাই

প্রত্যহ আপনাব নিকট যাতায়াত করি, আপনি যদি চাকুরি সম্বন্ধে আমাকে নিরাশ করেন, তাহা হইলে আমি আব আপনার কাছে আসি না। আপনি আমাকে রীতিমত আশাও দিতেছেন, অথচ এইরূপ আশায় থাকিশ্ব থাকিয়া চাব বৎসর কাটিয়া গেল, কৈ চাকুরিত করিয়া দিলেন না? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর কতদিনে এই দুঃখীর প্রতি আপনার দয়া হইবে? এ গরীব কাঙ্গালের দিকে আর কতদিন পবে আপনি মুখ তুলিয়া চাহিবেন? ব্রাহ্মণের এই কাতর প্রার্থনায় ধোপাবাবুর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমিত বড়ই গাধা হে। দেখ্‌চ এখন তাস খেল্‌ছি, এখন এই তাস খেলার সময় তুমি চাকুরির জন্য ঘ্যানন্‌ ঘ্যানন্‌ করে আচ্ছা আমায় জ্বালাতন করচ। তোমার মত গাধা আমি আর কোথাও দেখি নাই। ব্রাহ্মণ করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, আজ্ঞে আমি যে গাধা, তাহা নিশ্চিত। তা নহিলে আমি আপনার কাছে কেন? ধোপার কাছেইত গাধা থাকে। সুতরাং আমি যে গাধা, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণেব সেই তেজস্বী ভাষায় সেই বন্ধু বান্ধব মণ্ডলী মধ্যে ধোপাবাবুব দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। বাবু নীরব নিস্পন্দ, মুখে আর কথাটি নাই। বন্ধুগণ বলিলেন, এই ব্রাহ্মণের চাকুরি কল্যই তোমায় করিয়া দিতে হইবে। তাহার পরদিনই ব্রাহ্মণের চাকুরি হইয়া গেল।

বিষ্ঠার কীট বিষ্ঠা পাইলে যেমন আনন্দে নৃত্য করে, অভিমানী জীব চাটুকারের খোসামুদি পাইলে সেইরূপ আনন্দে গলিয়া যায়। পল্লীগ্রামে জমিদারবাবু বৈঠকখানায় বার দিয়া বসিয়াছেন, আর মোসাহেব-মণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

জমীদারবাবু বলিলেন, দেখুন মুখুয্যে মহাশয়, সে দিন যে নূতন পুষ্করিণীটা কাটাইলাম, তাহার জল বড়ই সুন্দর হইয়াছে। জল বেশ মিষ্টি হইয়াছে। মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন, আজ্ঞে মিষ্টি বলে মিষ্টি, এমন মিষ্টি জল আর আমি কখনও পান করি নাই। সেদিন আমি গ্রামান্তরে গিয়াছিলাম, দুপুরবেলায় বাড়ী আসিলাম। রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার শরীর বড়ই গরম হইয়াছিল। তৃষ্ণাও বিলক্ষণ পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণীকে বলিলাম, শীঘ্র আমায় এক গেলাস চিনির পানা দাও। ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ আপনার সেই নূতন পুষ্করিণী হইতে এক গেলাস জল আনিয়া আমায় বলিলেন, এই চিনির পানা খাও। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, এই কি তোমার ঠাট্টার সময়? আমি তোমায় চিনির পানা দিতে বলিলাম, তুমি কিনা পুকুরের জল আনিলে। ব্রাহ্মণী বলিলেন, তুমি এই জল খাইয়াই দেখ না কেন, আমি তোমায় সত্য সত্যই ঠাট্টা করিতেছি কি না। ব্রাহ্মণীর কথায় সেই জল পান করিলাম। আঃ! সেই জল পান করিলাম ঠিক যেন চিনির পানা। সেই অবধি যখনই আমাদের চিনির পানা খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন ঐ জলই আমরা পান করি। আর আমরা বাজারের চিনি খাই না। জমীদারবাবু আবার বলিলেন, হাঁ জলটা মিষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু একটু দোষ হইয়াছে, জলটা বড় ভার। মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন, আজ্ঞে এমন ভারি জল আমি আর কখনও দেখি নাই। সেদিন মশায়! আপনার পুকুরে একটা ঘটি নিয়ে স্নান করিতে গেলাম। স্নান সমাপ্ত করে শেষকালে এক ঘটি জল ভরিলাম। ও মশায়! সেই এক ঘটি জল এত ভারি, যে দুই হাত দিয়ে টেনে তুল্‌তে পারিনে। অবশেষে দুই গাছা

কাচি দিযে দশজন কুলি লাগিয়ে সেই ঘটি তুলি। জমীদারবাবু বলিলেন, এই তুমি জলেব সুখ্যাতি কবিতেছিলে, আবার নিন্দা কবিলে কেন? . মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন, আমিত জলের চাকব নই। আমি আপনাব চাকব। আপনি যখন সুখ্যাতি করিলেন তখন আমিও কবিলাম। আপনি যখন নিন্দা করিলেন, তখন আমিও নিন্দা কবিলাম। মুখুয্যে মহাশয়েব সেই যুক্তিপূর্ণ কথায জমীদাববাবু গলিযা গেলেন। জমীদাববাবু তখন সেই তোষা-মোদ-কথা শুনিতে শুনিতে ধবাধামে বসিযাই স্বর্গীয সুখভোগ কবিতে লাগিলেন। অভিমান এমনই মানুষকে অন্ধ কবে যে মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া বোধ হয়। তাই জমীদাববাবু মোসাহে-বেব তোষামোদ মিথ্যাপূর্ণ হইলেও তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ কবিলেন। অভিমানের এমনই কুহকিনী শক্তি যে উহা মানুষকে বস্তুর স্বরূপ দেখিতে দেয না। অন্ধকাব যেমন মানুষেব দৃষ্টি-শক্তিকে আচ্ছন্ন কবিয়া বাখে, মেঘ যেমন সূর্য্যকে আবৃত কবে, অভিমান মানুষেব জ্ঞান-প্রভাকে সেইরূপ অভিভূত কবিয়া বাখে। ভস্মযুক্ত হস্ত স্বচ্ছ দর্পণকেও স্পর্শ কবিযা যেমন মলিন কবিয়া ফেলে, অহঙ্কাবেব ভস্মস্তূপ সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। অহঙ্কার বিবেক-বুদ্ধিকে জড়বুদ্ধি কবিয়া দেয়। জীবন্তকে মূর্চ্ছিত কবিযা দেয়। সচেতনকে অচেতন কবিয়া দেয। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

যা লোভাৎ সবিশে খলস্তু সুরসা বাণীবুধৈ নীয়তে।
যো জানাতি সতামচেতনয়া সৈব স্বয়ং নীয়তে॥
ভর্ত্তুঃস্নেহবশাৎ প্রবিশ্য দহনে ভস্মীভবত্যঙ্গনা।
গাঢ়ালিঙ্গন তৎপরেণ মনসা প্রেতোন বেত্তি প্রিয়াম্॥

পণ্ডিতগণ স্নেহবশতঃ অহঙ্কার মদমত্ত ব্যক্তিকে যখন কোন সাধু উপদেশ দেন, তখন সে উপদেশ-বাণীর মর্ম্ম মদগর্ব্বে অচেতন মানব কিছুই বুঝিতে পারে না। সহমরণের সময় যখন কোন রমণী ভালবাসার আবেগে জ্বলন্ত চিতায় ঝম্প দিয়া মৃত পতির শব দেহকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করেন, তখন মৃত পতির অচেতন শবদেহ সেই আলিঙ্গন-সুখ কিছুই যেমন বুঝিতে পারে না, সেইরূপ অহঙ্কার বিষে মূর্চ্ছিত অচেতন পুরুষ সাধুর উপদেশ-সুধা কিছুই অনুভব করিতে পারে না। সে উপদেশের অমৃত-বাণী আকাশে আপনা আপনি বিলীন হইয়া যায়। সহমৃতা রমণীর সে প্রেমালিঙ্গন চিতানলে পুড়িয়া আপনা আপনি ছার খার হইয়া যায়।

ধন দৌলত টাকা কড়ি ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি পাইয়া মানুষ কেন অভিমানে স্ফীত হয়, যুক্তি দ্বারা তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। টাকা কড়ি সম্পদে আমার নিজের অভিমান করিবার কারণ আছে কি না, ভাবিতে গেলে বিষম প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়ায়, আমি বড় রাস্তার উপর দিয়া চার ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছি, অভিমানে ফুলিয়া মনে করিতেছি, আমি একজন মহা সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু ভাবিতে গেলে ইহাতে আমার সম্মান কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন কথা। সেই ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া কয়টার সম্মান কি আমার স্বরূপত সম্মান হইল, তাহা পৃথকরূপে নিরূপণ করা বড়ই সমস্যার কথা। রাস্তার লোকে ঘোড়া কয়টাকে বাহবা দিতেছে কি আমাকে দিতেছে, তাহা ভাবা চাই। সেই ঘোড়ার গাড়িটী আমার অধিকারে আছে বলিয়াই লোকে আমাকে মর্য্যাদা বা সম্মান দিতেছে, যদি আজ ঘোড়ার

গাড়ি কোন কারণে আমাকে ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে লোকে আমার আর সে খাতির করে না। সুতরাং যে ঘোড়ার গাড়ি সত্ত্বে আমি সম্মানিত এবং যে ঘোড়ার গাড়ির অভাবে আমি অপমানিত, সেই ঘোড়ার গাড়িই প্রকৃত সম্মানের জিনিষ ইহাই ঠিক। তাহাতে আমার কোনই সম্মান নাই। যদি সম্মান আমার স্বরূপগত ধর্ম্ম অর্থাৎ আমার নিজস্ব হইত, তাহা হইলে ঘোড়ার গাড়ি-বিহীন হইলেও লোকে আমায় সম্মান দিত। সুতরাং যাহা ঘোড়ার গাড়ির সম্মান বা ঘোড়া কয়টার সম্মান, তাহাকে আমার সম্মান মনে করিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠা আমার নিতান্তই ভ্রম। লোকে আমি ধনবান্ বলিয়াই আমার সম্মান করে, সুতরাং তাহা ধনের সম্মান, লোকে আমি বিদ্বান্ বলিয়াই আমার সম্মান করে, সুতরাং তাহা বিদ্যার সম্মান, লোকে আমি গুণবান্ বলিয়াই আমার সম্মান করে, সুতরাং তাহা গুণের সম্মান। আজ ধন, বিদ্যা বা গুণ বর্জ্জিত হইলেও লোকে যদি আমার সম্মান করিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, আমার সম্মান হইল। কিন্তু জগতে তাহা ত হয় না। সুতরাং আমার সম্মান কি, তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত কথা। আমি সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট পুরুষ। লোকে যদি আমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে, ত তাহাতে আমার অভিমান করিবার কোন কারণ নাই। কেন না তাহা সৌন্দর্য্যেরই প্রশংসা। "আমার" নহে। আমি ও সৌন্দর্য্য এক জিনিষ নহি। কেন না কিছুদিন পরে আমি কুশ্রী হইলে—আমার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইলে আমি নষ্ট হই না। যদি আমি ও সৌন্দর্য্য এক জিনিষ হইতাম, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইলে আমিও নষ্ট হইতাম। সুতরাং আমি ও সৌন্দর্য্য যখন এক জিনিষ

নহি, তখন সৌন্দর্য্যের সম্মানকে আত্মসাৎ করা সৌন্দর্য্যের সম্মানকে আমার নিজের সম্মান মনে করা নিতান্তই ভুল। পরের জিনিষকে নিজের জিনিষ বলিয়া আয়ত্ত করা আইন অনুসারে দূষণীয়। তাই যিনি বুদ্ধিমান, তিনি পরের সম্মানকে নিজের সম্মান বলিয়া গ্রহণ করেন না, তিনি পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যের সম্মানকে নিজের সম্মান মনে করিয়া বৃথা অহঙ্কারে উন্মত্ত হন না। ধন রত্নের সম্মানকে ধনরত্নের উপরিই তিনি ন্যস্ত করিয়া রাখেন। প্রসঙ্গাধীন একটী বুদ্ধিমতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কলিকাতার রাম বাবু একজন বনিয়াদি ধনী ব্যক্তি, কিন্তু অদৃষ্টদোষে তিনি অবস্থাহীন হইয়া পড়েন। একদিন তাঁহার কোন জমীদার বন্ধুর স্ত্রী কোন উৎসব উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। স্ত্রী নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন। রাম বাবু বলিলেন, দেখ আমাদের অবস্থা এখন আর পূর্ব্বের মত নাই, এইরূপ হীন অবস্থায় তুমি সেই বড়মানুষ জমীদার বাবুর বাড়িতে যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাও, তবে পূর্ব্বের মত তেমন আর খাতির পাইবে না। তুমি নিশ্চয়ই অপমানিত হইবে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইও না। স্ত্রী কিন্তু শুনিলেন না। তিনি যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুলা হইলেন। কাযেই রাম বাবু বাধ্য হইয়া স্ত্রীকে নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। রাম বাবুর স্ত্রী সেই জমীদার বাবুর বাড়িতে সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, বাইনাচ আরম্ভ হইয়াছে। আসর সরগরম। জমীদার বাবুর স্ত্রী সেই মজলিসে কর্তৃত্ব করিতেছেন। নিমন্ত্রিত বড়মানুষের স্ত্রীগণকে তিনি বিশেষ আদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সেই আসরের মধ্যস্থলে লইয়া

গিয়া বসাইতেছেন। রামবাবুর স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে খাতির করিয়া অভ্যর্থনা করিল না, সেই জমীদারবাবুর স্ত্রী তাঁহার দিকে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। কাযেই বাড়ীর যিনি গিন্নি, তাঁহার কোন আদর অভ্যর্থনা না পাইয়া রামবাবুর স্ত্রী বড়ই দুঃখিত অন্তঃকরণে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বাড়ী গিয়া স্বামীকে সকল কথা বলিলেন। রামবাবু বলিলেন, আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তথায় গেলে অপমানিত হইবে। যাই হউক তোমাকে পুনরায় এখনই তথায় যাইতে হইবে। এই বলিয়া রামবাবু খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। বনিয়াদি রামবাবুর অবস্থা যদিচ হীন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার পুরাতন সম্পত্তি হীরা জহরৎ আদি এখনও সব নিঃশেষ হয় নাই। তিনি নিজের বাক্স হইতে সেই হীরা জহরৎ আদি বাছিয়া বাছিয়া একখানি নীল প্রস্তরখচিত মূল্যবান্ অঙ্গুরী বাহির করিয়া স্ত্রীর অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন ও বলিলেন, তুমি এই অঙ্গুরী পরিয়া পুনরায় সেইখানে যাও। সেইখানে গিয়া আসরের যে স্থানে আলোক জ্বলিতেছে, সেই আলোকের কাছে গিয়া বসিও। সেই আলোক যাহাতে তোমার এই আংটির উপরে পড়ে, এমনতর ধরণে হাতখানি রাখিয়া তুমি তথায় বসিও। তার পর তোমার যেরূপ খাতির হইবে, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে। রামবাবুর স্ত্রী পুনরায় তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ অলঙ্কারবিশিষ্ট বড়মানুষের স্ত্রী সমূহে সে আসর পুরিয়া গিয়াছে। রামবাবুর স্ত্রী বহু কষ্টে সেই ভিড় ঠেলিয়া স্বামীর কথা মত আসরের এক পার্শ্বে একটা আলোকের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যাই সেই আলো তাঁহার অঙ্গুরীর নীলবর্ণের পাথরের উপর পড়িল, আর অমনি সেই সমস্ত আসরটা নীলবর্ণময় হইয়া গেল। সেই নীল পাথরের এমনই গুণ যে তাহার উপর আলো প্রতিফলিত হইলে তাহার নিকটস্থ সমস্ত পদার্থ ই নীল দেখায়। সেই আসরের মধ্যে সকলেরই কাপড় চোপড় অলঙ্কার আদির প্রভা তিরোহিত হইয়া কেবল নীল দেখাইতে লাগিল। হঠাৎ এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। সকলেরই দৃষ্টি তখন সেই রামবাবুর স্ত্রীর আংটির দিকে পড়িল। বিস্মিত হইয়া সকলে চাহিয়া দেখিল, সেই নীলবর্ণ প্রস্তর হইতে নীলিমাময় কিরণ রাশির ফোয়ারা যেন চারিদিকে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তখন সেই বাড়ীর গিন্নি—সেই জমিদারবাবুর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া রামবাবুর স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন, ওমা! তুমি কতক্ষণ এসেছ, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? তোমার কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানায়? এসো মা তুমি এই মাঝখানে এসে বস। ও বৌমা আতর দান ও পান নিয়ে শীঘ্র ইঁহাকে দাও, এই বলিয়া গিন্নি এবং অন্যান্য সকলে তাঁহাকে মাঝখানে বসাইবার জন্য মহা আদরের সহিত বিশেষ জিদ করিতে লাগিল। তখন সেই রামবাবুর স্ত্রী অঙ্গুলি হইতে আংটিটি খুলিয়া বলিলেন, এই আংটিকে আপনারা লইয়া গিয়া মাঝখানে বসান। ইহাই এই আসরের মধ্যস্থলে বসিবার উপযুক্ত। আমি এ সম্মান পাইবার উপযুক্ত নহি, আমি ইতিপূর্ব্বে একবার এখানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি। তখন কেহই আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই, এখন যাই এই মূল্যবান্ আংটি পরিয়া আসিয়াছি, আর সকলে আমাকে আদর করিবার জন্য

ব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং এখন 'যে আপনারা আমাকে সম্মান দিতেছেন তাহা এই অঙ্গুরিটীর জন্য, অতএব এই অঙ্গুরিই সম্মান যোগ্য, আমি নহি। আমি যদি আপনাদের সম্মানযোগ্য হইতাম, তবে ইতিপূর্ব্বেও আপনারা আমার খাতির করিতে পারিতেন। এই আংটিই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাকে আপনাদের খাতিব পাইবাব উপযুক্ত কবিয়াছে, সুতরাং এই আংটিই আমা অপেক্ষা বড ও আপনাদের মত লোকের মর্য্যাদা পাইবার উপযুক্ত। অতএব ইহাকেই মাঝখানে বসান। সকলে লজ্জায় অধোবদন হইল। রামবাবুর স্ত্রীর সেই গভীর ভাব পূর্ণ জ্বলন্ত ভাষায় অনেকের শিক্ষালাভ হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী রামবাবুর স্ত্রী বুঝিয়াছিলেন, সম্মান পাইবার উপযুক্ত কে? তাই তিনি নিজে বৃথা পার্থিব সম্মানের অভিমানে উন্মত্ত হন নাই। আজ সামান্য স্ত্রীলোকে যাহা বুঝিল, বড় বড় চিন্তাশীল জ্ঞানীরা তাহা বুঝিতে পারেন না। আইস মানব। ঐ স্ত্রীর পদতলে দাঁড়াইয়া শিক্ষা করি, পার্থিব ধন রত্নের অধিকাবী হইয়াও কিরূপে নিরভিমান হইতে হয়। ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিতে বিভূষিত হইয়াও কিরূপে মাটির মানুষ হইতে হয়, ঐ বুদ্ধিমতী স্ত্রীর ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তুমি বিদ্বান্ হও, তুমি চিন্তাশীল হও, তুমি বক্তা হও, তুমি গুণবান্ হও, তুমি ধনবান্ হও, তুমি পণ্ডিত হও, তাহার জন্য তোমার অভিমান কিসের? এই অনন্ত বিস্ফারিত প্রকৃতির ক্রোড়দেশে তোমার মত ক্ষুদ্র কীট বায়ুবেগে সহস্র সহস্র উড়িয়া বেড়াইতেছে, প্রকৃতির অনন্ত ভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তোমাকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। কীটাণুবীক্ষণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়া

দেখিলে এই সম্মুখস্থ শূন্যমণ্ডল যেমন অনন্ত কীট-পরিপূরিত বলিয়া বোধ হয়, তেমনই জ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার মত অসংখ্য নগণ্য কীটে পবিপূর্ণ বলিয়া স্থির হয়। তোমার বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান দূরে রাখিয়া দাও, অহঙ্কার গর্ব্ব শিলাতলে চূর্ণ করিয়া দাও, এই প্রকৃতি-সমুদ্রের অকূল পাথারের একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ তুমি, এই আছ, এই মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, কেহই তাহার সংবাদ বলিতে পারিবে না। এই অনন্ত প্রকৃতির বিস্তীর্ণ তত্ত্বের এক এক বিন্দু লইয়া তুমি লাফালাফি করিতেছ, তাই তোমাকে দেখিয়া মনে হয়,—

অগাধ জল সঞ্চারী বিকারী নচ রোহিতঃ।
গণ্ডূষ জল মধ্যে তু শফরী ফর্ফরায়তে॥

"রুইমাছ অগাধ জলের মধ্যে বিচরণ করিয়াও স্থির হইয়া থাকে, আর পুঁটিমাছ এক গণ্ডূষ জলের মধ্যেই ফর্ফর্ করিয়া চঞ্চল হইয়া বেড়ায়।" আর্য্য ঋষিগণ একদিন সমাধিবলে প্রকৃতির পর পারে পৌছিয়াও প্রকৃতি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াও অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া বনবাসী ভিখারী হইয়াছিলেন, আর তুমি উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক, প্রাকৃতিক জ্ঞানের ক্ষুদ্র কিনারায় বাস করিয়াও অভিমানে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছ। তাই মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ রোহিত মৎস্য সদৃশ। কেননা রুইমাছের মত প্রকৃতির অগাধ গম্ভীর তত্ত্ব-সাগরে তাঁহারা নিমগ্ন হইয়াও অহঙ্কারে লাফালাফি করেন নাই। আর তুমি বৈজ্ঞানিক। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রসূত বিজ্ঞানের গণ্ডূষ মাত্র জলে বিচরণ করিয়া ফর্ফর্ করিতে আরম্ভ করিয়াছ। তাই মনে

হয়, তুমি পুঁটিমাছ। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক! তোমার অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। আজ হয়ত তোমা অপেক্ষা মূর্খ একজন চাষার নিকটে তোমার দর্প চূর্ণ হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একজন উৎকট বৈজ্ঞানিক বাবু গঙ্গাবক্ষে নৌকা আরোহণ করিয়া কোন বিদেশে যাইতেছিলেন। নৌকাতে মাঝি আর বাবু ছাড়া আর কেহই ছিল না। কিছুক্ষণ পরে বৈজ্ঞানিক বাবু মাঝির সহিত কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিলেন। বাবু বলিলেন আচ্ছা মাঝি। তুমি বলিতে পার, কেন এই গঙ্গার জল গতি-শীল হইয়া দৌড়িতেছে, জল জড় পদার্থ, বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মানুসারে জড়ের কোন ক্রিয়া নাই; তবে এই জল-প্রবাহের গতিরূপ ক্রিয়া দেখা যাইতেছে কেন? মাঝি বাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, আজ্ঞে আমরা ও সব কিছু জানি না। আমরা এই নৌকা বাহিতেই জানি। বাবু বলিলেন, মনুষ্য জীবনের এমন প্রয়োজনীয় জড় তত্ত্ব বিদ্যা তুমি কিছুই জান না, তবে তোমার জীবনের সিকি আন্দাজ অংশ মাটী হইয়াছে, পরে কিছুক্ষণ পরে বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা ঐ যে গঙ্গার ধারে ধারে বৃক্ষ শ্রেণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহারা মাটীতে পড়িয়া যাইতেছে না কেন, এ উদ্ভিজ্জতত্ত্ব তুমি আমায় কিছু বুঝাইয়া দিতে পার কি? মাঝি পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল, বাবু বলিলেন এমন প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-বিদ্যা তুমি জান না, তবে তোমার জীবনের আট আনা অংশ মাটী হইয়াছে। বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা ঐ যে আকাশে শূন্য মণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী বিদ্যমান রহিয়াছে, উহারা

শূন্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছ না কেন, এ গুরু গম্ভীর তত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করিতে পার কি? মাঝি এবার বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিল কেন মশায়! জ্বালাতন করেন, আমরা মূর্খ চাষা লোক, ওসব কিছুই আমরা জানি না। আপনি আর ওসব কথা তুলিবেন না। অভিমানী বৈজ্ঞানিক বাবু বলিলেন, কি এমন মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বিষয়ক তত্ত্ব তুমি কিছুই জান না, তবে তোমার জীবনের বার আনা অংশ মাটী হইয়াছে। দেখ কলেজে এই সমস্ত বিদ্যা আমি শিখিয়াছি, সুতরাং তোমার মত আমার জীবন মাটী হয় নাই। মাঝি ভিতরে ভিতরে বড়ই চটিল, তখন কিছু আর না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে আকাশে ঝড় দেখা দিল। বিষম ঝড়ে গঙ্গাবক্ষ আন্দোলিত হইতে লাগিল। নৌকা টল-মল করিতে লাগিল। ভীষণ তরঙ্গের প্রবল ধাক্কায় বৈজ্ঞানিক বাবুর নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইল। তখন মাঝি বলিল, বাবু! আপনি সন্তরণ-বিদ্যা কিছু জানেন কি? বাবু বলিলেন কৈ তাহাত আমি কিছু জানি না। মাঝি তখন বলিল, তবে এই বার আপনার জীবনের ষোল আনাই মাটি। আপনার মতে আমার জীবনের বার আনা অংশ মাটি হইয়াছে, তবু চার আনা বাকী আছে। কিন্তু আমার মতে এখন আপনার জীবন ষোল আনাই মাটি, কেননা আপনি সাঁতার জানেন না। নৌকা ডুবিলেই আপনিও ডুবিয়া মরিবেন। সুতরাং এখন দেখা যাক, সত্য সত্যই কাহার জীবন মাটি। এই বলিয়া মাঝি কোমর বাঁধিয়া সেই নিমগ্ন প্রায় নৌকা পরিত্যাগ করিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে পর পারে চলিয়া গেল। আর সেই বৈজ্ঞানিক বাবুর দুর্গতির কথা আর বলিব না।

আজ একজন অশিক্ষিত মাঝির নিকটে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কেন অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠ, তাহা ত কিছুই বুঝি না। মানব। তুমি যতই কেন শিক্ষিত বা বৈজ্ঞানিক হও, মনে রাখিও এই অনন্ত প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও তোমার জ্ঞান বা সামর্থ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। মনে রাখিও তোমার শক্তি, তোমার জ্ঞান প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র তৃণ কণিকাব তত্ত্ব উন্মেষ করিতে সমর্থ নহে। কত বাশি বাশি তোমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য ও জ্ঞানেব বহির্ভূত পদার্থরাশি এ জগতে পড়িয়া রহিয়াছে। তোমার সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ বৃত্তিরাশি যথায় পৌঁছিতে পারে না, এমন অসংখ্য প্রাকৃতিক স্তর এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছে। তুমি পদে পদে অজ্ঞানের দাস, প্রতি মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতের অন্ধকারময় গর্ত্তে তুমি পদক্ষেপ করিতেছ। বুঝিয়া শুঝিয়া জানিয়া শুনিয়া বিবেক বিচার করিয়া জাগতিক কোন তত্ত্বের তুমি অন্ত পাও না। এই অকূল এই অনন্ত অজ্ঞানের পাথার দিয়া তুমি অবিরত দৌড়িতেছ, অবিদ্যার ঠুলি চক্ষে ধারণ করিয়া প্রকৃতির অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জে অবিরত লম্ফ দান করিতেছ। কোথাও বা লম্ফ দান করিয়া শুভাদৃষ্টবশত আশ্রয় স্থান পাইলে, আবার কোথাও বা পা ফস্‌কাইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলে। এই উত্থান ও পতন ইহা কিছুই তোমার সামর্থ্যের আয়ত্ত নহে। তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান সামর্থ্য আদির অন্তস্তলে সেই অনন্ত লীলারসময়ের লীলা প্রচ্ছন্নরূপে অবগুণ্ঠিত রহিয়াছে।

মানুষ। অভিমান অহঙ্কার ভুলিয়া যাও, গর্ব্ব দেমাক পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দাও! এই সুস্থ শরীরে তুমি বসিয়া আছ, এই

নিদারুণ কলেরা রোগে এখনই তোমার জীবনের সমস্ত আশা ফুরাইয়া যাইতে পারে, এইরূপ যখন প্রতি মুহূর্ত্তে অনিত্যতার দাস তুমি, তখন তোমার অভিমানে বুক ফুলাইবার অবকাশ কোথায়? এই তুমি তোমার মূল্যবান্ জীবন লইয়া কত আস্ফালন করিতেছ, মনে রাখিও, এখনই কোন পীড়া উপস্থিত হইলে সেই তোমার মূল্যবান্ জীবন একজন ডাক্তারের খেলার জিনিষ হইবে। কত যুক্তি, বিদ্যা, পদ গৌবব, অর্থ সম্মানে যে জীবনকে তুমি উন্নতির উচ্চ সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে পীড়া উপস্থিত হইলে একজন চিকিৎসক আসিয়া সেই জীবনকে নিজ পদে দলিত কবিবেন। স্বচ্ছন্দে অবাধে তাহার উপরে আধিপত্য বিস্তার করিবেন। ডাক্তাব বাবুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চিন্তার অধীন হইযা যে তোমাব জীবন বায়ুবেগে বিকম্পিত দীপশিখার ন্যায় টলমল কবিতেছে, ভাবিয়া দেখ, সেই জীবন লইয়া তোমাব গর্ব্ব কবিবার কোন হেতু আছে কি না? জ্ঞান চক্ষুকে বিস্ফাবিত কবিয়া লও, নিজের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে আর একটু প্রসারিত করিয়া লও। বিস্ফারিত চক্ষু লইয়া এই প্রকৃতির অনন্ত চত্বরের দিকে একবাব চাহিয়া দেখ, মানুষের অভিমান মানুষেব অহংভাব প্রকৃতিব কঠোর শাসনে কিরূপ পদে পদে দলিত হইতেছে। ঐ শিক্ষাভিমানোন্মত্ত যুবা মনে কবিয়াছিল, এই লেখা পড়া শিখিলাম, এই সাংসারিক সুখ শান্তির চাবি স্বরূপ পয়সা কড়ি রোজগাব করিলাম। এই বাছিয়া বাছিয়া পছন্দ করিয়া প্রিয়তমা সুন্দরী পত্নী বিবাহ করিলাম, নিজের চেষ্টায় নিজের যত্নে উন্নতি করিয়া সুখ পাইবার উপকরণ গুলি যখন সমস্তই যোগাড় করিয়াছি,

তখনত সুখচন্দ্রমাকে এইবার নিশ্চয়ই ধরিব, আর যায় কোথা? এই বলিয়া যুবা সুখ-চন্দ্রমাকে ধরিবার জন্য যাই হাত বাড়াইল, আর চন্দ্রমা দূরে দূরে চলিয়া গেল। হয়ত স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইল, কিম্বা এত মুখরা হইল, যে তাহার সর্ব্বদা দুর্ব্বাক্যে যুবার অন্তস্তল জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে লাগিল। সংসার জীর্ণারণ্য বোধ হইতে লাগিল। হয়ত যুবার নিজের দেহে এমন কুৎসিত রোগ প্রবেশ করিল যে সর্ব্বদাই তাহাতে অসুখে কাল কাটিতে লাগিল। হয়ত পয়সা কড়ি যথেষ্ট পরিমাণে রোজগার হইল, কিন্তু পয়সা কড়ি ভোগ করিবার সামর্থ্য দূরে চলিয়া গেল। যে ভালবাসা পাইলে মনুষ্য-জীবন অমৃতময় হয়, সেই স্ত্রীর ভাল-বাসায় বঞ্চিত হইয়া চিরকাল হয়ত যুবা দগ্ধ জীবন যাপন করিতে লাগিল। এইরূপ প্রকৃতির সহস্র দুর্ব্বিপত্তির কশাঘাতে পীড়িত হইয়া যুবার সে তেজ সে অভিমান কোথায় চলিয়া গেল। তখন মর্ম্ম-যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া তাহার ব্যাকুল অন্তরাত্মা যেন বলিতে থাকে,—

> যদ্ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
> বিদ্যা বুদ্ধিঃ স্বপুরুষকৃতির্নৈব মূলং সুখস্য ॥
> চেষ্টা মে যত্তব চরণগতাস্তাস্তথায়ং বিধেহি।
> যস্মাত্তৎ যৎ নহি নহি সুখং তাদৃশং কিঞ্চিদস্তি ॥

"ভগবন্ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিল, তাহার জন্য আমি দুঃখিত নহি। এতদিনে বুঝিয়াছি দেব! মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি পুরুষকার প্রযত্ন এ সমস্ত কিছুই সুখ পাইবার হেতু নহে। অতঃপর আমার চেষ্টা যাহাতে তোমার চারুচরণ চুম্বন করিয়া এ জগতে বিচরণ করে, তাহাই

ব্যবস্থা করিয়া দাও! প্রভু!, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সুখ দাও, মানুষের উপার্জ্জিত সুখ তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও তুল্য নহে।”

প্রকৃতির কশাঘাতে দর্প যখন চূর্ণ হয়, তখনই বিশ্ববিধাতার দিকে ব্যাকুলপ্রাণে জীব তাকাইয়া থাকে। যখন ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পত্তি মানুষ ভোগ করিতে থাকে, তখন মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়। যাঁহার কৃপা-প্রসাদে মানব ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, একদিনের তরেও তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তখন যদি কেহ সেই ধনী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কিরূপে এই অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই ধনী ব্যক্তি বুক ফুলাইয়া বলেন, মহাশয়! অনেক কৌশল অনেক উপায় সৃষ্টি করিয়া আমি নিজে এই ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি, তখন যে দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে একবারও নির্গত হয় না। তিনি নিজের বাহাদুরিই শতমুখে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া থাকেন। তার পর যাই মোকদ্দমা বা অন্য বিপদে বিষয়গুলি তাঁহার যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কেহ তাঁহাকে তাঁহার বিষয়-ধ্বংসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া থাকেন, কি করিব মহাশয়। মানুষের হাত-নাই। যিনি দিয়াছিলেন, তিনিই কাড়িয়া লইলেন। বিনা দোষে ঈশ্বর আমাকে এই দুরবস্থায় ফেলিয়াছেন। সকলই তাঁহার ইচ্ছা। সম্পদের সময় তিনি নিজে বাহাদুরি লইয়াছেন, এখন বিপদের সময় ঈশ্বরের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইতেছেন। কি অদ্ভুত বিচার দেখুন। সুতরাং অভিমানী মানবের মত অদ্ভুত জীব জগতে আর নাই। যদি বিপদের সময় ঈশ্বরের

কাছে অবনত হইতে হইল, তবে সম্পদের সময় অবনত হইলে না কেন! একটা গল্প মনে হইতেছে। একটা ইঁদুর কোন সময় একটা সাপকে বলিল, দেখ ভাই সাপ। তোমার সব ভাল। কিন্তু তোমার দোষ এই, তুমি এঁকে বেঁকে চল কেন? সোজা হয়ে চল না কেন? সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ফের যদি তুমি আমার চলনের নিন্দা কর, তোমায় সবংশে সংহার করিব। ইঁদুর বেচারা ভয়ে চুপ করিল। তার পর একদিন কোন গৃহস্থ লগুড়াঘাতে সেই সর্পের শিরোদণ্ড ভগ্ন করিয়া রাস্তা দিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তখন সেই ইঁদুর রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে সর্পের সেই দুর্গতি দেখিয়া বলিল, কেমন ভাই সাপ! এখন সোজা হয়েছ ত? যদি শেষে সেই সোজা হইলে, তবে একটু অগ্র হইতেই সোজা হইলে না কেন? ইঁদুরের ভাষায় আমরাও বলি হে অভিমানী ধনি। শেষে যখন ঈশ্বরের কাছে তোমায় সোজা হইতেই হইল, তখন একটু অগ্র হইতেই সোজা হইলে না কেন?

তাই বলি মানুষ! সোজা হও। অভিমান-ভরে যে হৃদয় বক্র হইয়া গিয়াছে, তাহাকে সরল করিয়া লও! অহঙ্কার দর্প দূরে তাড়াইয়া দাও। অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মাটির মানুষ হও।

মাটি হ'তে হইয়াছ মাটি হ'তে হবে।
মাটি হবার আগে কেন মাটি নহ তবে?

দার্শনিক নিয়মানুসারে মাটি—পার্থিব উপাদান হইতেই তোমার দেহের উৎপত্তি, আবার ধ্বংস কালে চিতাভস্ম হইয়া উহা মাটি আকারেই পরিণত হইবে। সুতরাং তোমার আদি

ও অস্ত যখন মাটিময়, তখন মাঝখানে জীবনকালে মাটি হবার অগ্রে মাটিব মানুষ হওনা কেন? তোমার ইচ্ছায় তোমার সামর্থ্যে যখন কোন কার্য্য হয় না, প্রকৃতির ইঙ্গিতে তোমাকে যখন পবিচালিত হইতে হইতেছে, তখন তোমাব নিজত্বের স্বাধীনতা কোথায়? প্রকৃতি যখন তোমায় কাঁদিতে বলিতেছেন, তখন তুমি কাঁদিতেছ, আব প্রকৃতি যখন তোমায় হাসাইতেছেন, তখনই তুমি হাসিতেছ, এমন অবস্থায় তোমাব পুরুষকার জন্য অভিমান করিবাব কারণ কোথায়? তুমি যাহা ভাবিয়াছিলে, তাহা হইল না, যাহা না ভাবিয়াছিলে তাহাই হইয়া গেল, তবে দর্প কর কেন? তুমি জীবনকে যেরূপ উদ্দেশ্যে গঠন করিবে ভাবিয়াছিলে, তাহা না হইয়া অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে, তাহা ত পদে পদে দেখিতেছি। তুমি ভাবিয়াছিলে বি এ পাশ করিয়া শিক্ষিত হইয়া কলেজের প্রফেসর হইব, কিন্তু তাহা না হইয়া অবশেষে জুতা বিক্রেতা বনার্জি এণ্ড কোম্পানী হইয়া দাঁড়াইলে, ভাবিয়াছিলে বি এল্ পাশ করিয়া উকীল হইব, কিন্তু অবশেষে দর্জ্জির দোকান খুলিয়া বসিলে। সুতরাং তোমার পুরুষকারের কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকিল? তুমি যেখানেই যাও, যাহাই কর না কেন, প্রকৃতিব আদেশ-বাণী তোমায় অবনত মস্তকে পালন করিতেই হইবে। বিধির লিখন তুমি কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। তাই শাস্ত্র দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিয়াছেন,—

আধোরণাঙ্কুশ ভয়াৎ করিকুম্ভযুগ্মং।
জাতং পয়োধর যুগং হৃদয়েঙ্গনানাং॥
তত্রাপি বল্লভ-নখ ক্ষত ভেদ ভিন্নং।
নৈবান্যথা ভবতি যল্লিখিতং বিধাত্রা॥

" হস্তীর মস্তকের উপরিভাগে যে দুইটা কলসের মত উচ্চ অংশ থাকে, মাহুত অঙ্কুশ দ্বাবা যে স্থান আহত করে, তাহাকে কবির ভাষায় করিকুম্ভ বলে। কবিগণ যুবতী স্ত্রীর উন্নত কুচ-মণ্ডলের সহিত সেই কবিকুম্ভের তুলনা দিয়া থাকেন। কবি উপদেশচ্ছলে সেই কবিকুম্ভকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, মানব। তুমি যেখানেই যাও, যাহাই কব না কেন, বিবিব লিখন কিছু-তেই খণ্ডাইতে পাবিবে না। দেখ করিকুম্ভ দুইটি সর্ব্বদাই মাহুতের অঙ্কুশাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বডই যন্ত্রণা ভোগ করে। তাই তাহাবা এই যন্ত্রণা এডাইবার জন্য পলায়ন করিয়া যুবতী স্ত্রীর বক্ষোদেশে গিয়া আশ্রয় লয়। তথায় স্তনরূপে বেশ বদলাইয়া লুকাইয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও গিযা তাহাদের পরিত্রাণ নাই। সেখানেও পতির হস্তস্থিত নখরাঘাতে তাহারা বিলক্ষণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং অদৃষ্টের হাত কিছুতেই এড়াইবার যো নাই।

তাই বলি মানব! প্রকৃতির অধীন তুমি, পদে পদে অদৃষ্ট—অলক্ষিত শক্তির বিজিত দাস তুমি, তোমার নিজের বৃথা গর্ব্ব ছাড়িয়া দাও। যে অলক্ষিত শক্তি তোমাব উপর ক্রিয়া করি-তেছে, তাহার চরণতলে শরণ লও। তোমায় যত্ন চেষ্টা ছাড়িয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর কবিয়া বসিয়া থাকিতে বলিতেছি না। বলিতেছি এই, যত্ন চেষ্টা এ জগতে করিয়া যাও, কিন্তু মনে রাখিও, সেই যত্ন চেষ্টার ভিতরে যখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি সঞ্চারিত হইবে, তখনই তাহা ফলপ্রসূ হইবে। কেন না পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এ জগতে অর্থোপার্জ্জনেব জন্য কত শত শত উপায় অবলম্বন করিলাম, ভাবিয়াছিলাম যে উপায়টা নিশ্চিতই ঠিক

লাগিবে, হয়ত তাহাই বেঠিক হইয়া গেল। আবার যে উপায়টীর উপর কিছুমাত্র আস্থা ছিল না, ঠিক তাহাই ফলিয়া গেল। সুতরাং আমার নিজের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব তাহাতে থাকিল কৈ? যাঁহারা মনে করেন, আমি কি বাহাদুর পুরুষ, নিজের বুদ্ধিবলে যে উপায় আবিষ্কার করিতেছি, তাহাতেই অজস্র অর্থ আসিতেছে, সুতরাং আমার মত বাহাদুব পুরুষ এ জগতে আর নাই। আমি তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। তিনি যে নিজের সৃষ্ট উপায়ের জন্য নিজেকে অভিমানে স্ফীত কবিতেছেন, তাহা অপেক্ষা পঞ্চমে চড়াইয়া যাঁহাবা উপায় অবলম্বন করিয়াও কোন ফল পান না, তাঁহাদিগকে দেখিয়াও কি নিজের অভিমান ছাড়িয়া একটা অদৃষ্ট শক্তির অস্তিত্ব মানিতে ইচ্ছা হয় না। চলিত কথায় বলে, "চল্লেই বত্রিশ বুদ্ধি, না চল্লেই হতবুদ্ধি", যতক্ষণ তাঁহার সু-সময়ের গুণে উপায়গুলি বেশ ফলিতে থাকে, ততক্ষণ তাঁহাব বিদ্যা বুদ্ধিব চাকচিক্য শতধারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যাই কু-সময় আসে, তখন সেই মানুষ, সেই উপায়, সেই বিদ্যাবুদ্ধি, সেই সব, কিন্তু তথাপি মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া যায়। তখন তিনি যে উপায়ে হাত দেন, তাহা জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়। তখন স্বর্ণমুষ্টি ধুলিমুষ্টিতে পবিণত হয়। এ সমস্ত দেখিয়াও কি অদৃষ্ট শক্তির অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না?

আর বিচার বিতর্ক করিতে চাহি না। যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্থির হইয়াছে, যুক্তি বিচার বা অনুমান বলে তাহার খণ্ডন কিছুতেই হইতে পারে না। এ জীবনে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অভিমান বা অহঙ্কার করিবার সামর্থ্য মানুষের

বিন্দুমাত্র নাই। জীব। বৃথা গর্ব্ব ছাড়িয়া দাও।" যে মহীয়সী শক্তির ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া এ জগতে তুমি নৃত্য করিতেছ, তাঁহার চরণতলে শরণ লও। তোমার ঐ গরম মেজাজকে শান্ত করিয়া লও! বঙ্কিম চাহনিকে সরল করিয়া লও। তোমার ঐ লৌহময় অন্তঃকরণকে ভক্তিরসে বিগলিত করিয়া দীননাথের পাদপদ্মে ঢালিয়া দাও! আজ অভিমানের মদিরাপানে তুমি ত্রিজগৎ তুচ্ছ মনে করিয়া মাতিয়া বেড়াইতেছ, মনে রাখিও, ঐ ভৈরবী শক্তির সংহার-শূল যখন সমুদ্যত হইবে, তখন যাতনার অনন্ত চিতানল তোমার উপর সহস্র শিখায় সহস্র ধারায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে। আজ বিদ্যা বুদ্ধি তর্কের অভিমানে নাস্তিক হইয়া তুমি ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিয়া বড়ই বাহাদুর হইয়াছ, কিন্তু মনে রাখিও নাস্তিক! যখন উৎকট রোগে তোমার জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হইবার উপক্রম হইবে, যখন ডাক্তার আশা নাই বলিয়া জবাব দিবে, জগতের বন্ধু বান্ধব কেহই তোমায় যখন আর কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে না বলিয়া স্থির হইয়া যাইবে, তেমন অবস্থায় তুমি যদি দুই মিনিট কালও বাঁচিয়া থাক, তখন তোমার মানসিক যন্ত্রণা যে কিরূপ ভয়ানক হইবে, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। জগতের আশা চলিয়া গেলেও আস্তিকের তখন ঈশ্বরের নিকট আশা থাকে। কিন্তু সেই দুই মিনিটকাল নাস্তিক! তোমাকে যদি সজ্ঞানে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে ঘোর নৈরাশ্যের সহস্র বৃশ্চিক-দংশন তোমাকে অনুভব করিতেই হইবে। বুকের উপর হাত দিয়া বল দেখি নাস্তিক! সেই দুই মিনিটকাল তোমার পক্ষে কি ভয়ানক? প্রিয়তমা পত্নী তোমার পা জড়াইয়া কাঁদিতেছে, মাতা শিয়রে বসিয়া অশ্রুজলে ধরাতল

অভিষিক্ত করিতেছেন, স্নেহের পুত্তলী পুত্র মাটির উপর আছড়াইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, বল নাস্তিক! তখন তোমার কোন্ দার্শনিক চিন্তা তোমায় শান্তি দিতে পারে? যিনি আস্তিক, তখন তিনি প্রাণ ভরিয়া সেই দীনদয়াময়ী জগন্মাতা মূল প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া বলিতে পারেন—

"মা আমার খেলানা হল।
বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
আমায় নিয়ে ঘরে চল॥"

এমন আশার কথা আর নাই, এমন ভরসার কথা আর নাই। অভিমানী মানব নিজের যত্ন চেষ্টার গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া সংসারের তুমুল কল্লোলের মধ্যে পড়িয়া ঐ মার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যে মহীয়সী মূল প্রকৃতির প্রত্যেক ইঙ্গিতে শিশুর ন্যায় মানব পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার কথা ভুলিয়া মানব দিশাহারা হইয়া বেড়াইতেছে। পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া যাঁহাকে মা বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিলে যিনি যাতনার অবসান করিয়া দেন, বসন্ত রোগের উৎকট যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া রোগী যখন একান্ত নির্ভর হৃদয়ে ডাকিতে থাকে, তখন যিনি মা শীতলা হইয়া দেখা দেন, নিজের শক্তি সামর্থ্যের—পার্থিব যত্ন চেষ্টার অভিমান চূর্ণ হইয়া গেলে জীব যখন নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে তাঁহার দিকে ঢলিয়া পড়ে, তখন যিনি মা হইয়া স্নেহাঞ্চলে ব্যাকুল জীবের মুখ মুছাইয়া কোলে তুলিয়া লন, সেই চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী মাকে ভুলিয়া আমরা আর কাহার কাছে শরণ লইব? যখন একে একে প্রকৃতির কশাঘাতে মানবের

দর্পবাশি চূর্ণ হইয়া যায়, তখন নিরুপায় হইয়া তাহার ব্যাকুল অন্তরাত্মা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কাতরে প্রার্থনা করিতে থাকে—

> যা আছে মা কপালেতে তাই যদি গো ঘটিবে।
> জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে কেন ডেকে মরি তবে॥
> ব্রহ্মময়ী নাম ধর,
> জীব সঞ্চারিতে পার,
> কপাল ফিরাতে নার, এ কথা কে শুনিবে?

হৃদয় কপাট ভেদ করিয়া এই মরমের আর্ত্তগাথা উচ্চারিত হইলে যিনি স্থির থাকিতে পারেন না, সেই করুণা-কল্পলতিকা স্নেহময়ী মাকে কোন্ প্রাণে ভুলিব? আজ শ্রীমন্ত সওদাগর রাজ-কারাগারে বন্দী হইয়া মা মা বলিয়া যখন কাঁদিয়া উঠিল, তখন দীনদয়াময়ী মা অস্থির হইয়া অমনি পদ্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—

> বল্ পদ্মা বল্ প্রাণ চঞ্চল কেন হল বল্ কিসেরই কারণ,
> কে বুঝি কান্দে পড়িয়া বিপদে প্রাণভয়ে আমার লয়েছে শরণ।

এই কথা বলিতে বলিতে মা আসিয়া বধ্যভূমিতে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিলেন। এত অতুল দয়া যাঁহার, এত করুণার অনন্ত নির্ঝরিণী যিনি, হায়! এ জীবনে যদি তাঁহাকে না চিনিলাম, তবে করিলাম কি? হায়! অভিমানভরে মত্ত হইয়া সরল শিশুর ন্যায় এ জীবনে এক দিনের তরেও তাঁহাকে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখিলাম না। যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্য উদিত হইতেছে, চন্দ্রমা হাসিতেছে, পবন বহিতেছে, ফুটন্ত ফুলরাশি বুকে করিয়া বৃক্ষরাজি যাঁহার পুষ্পাঞ্জলি রচনা করিতেছে, অনন্ত আকাশ

লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররূপ দীপশিখা প্রজ্জ্বালিত করিয়া যাঁহাকে আবতি কবিবাব জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, মহাসাগর বক্ষ বিস্ফাবিত করিয়া যাঁহাকে দেখিবার জন্য উত্তাল তরঙ্গরাশিরূপ পাদ্য উপহাব লইয়া ধাবিত হইতেছে, হায়! সেই জলন্ত সত্তারূপিণী মার কাছে আমবা এক দিনের তরেও অকপট চিত্তে প্রাণ ভরিয়া আব্দার কবিতে শিখিলাম না। লোক-লজ্জাভয়ে সভ্যতাব অভিমানে এ পাষণ্ড চক্ষু এক বিন্দু অশ্রুজলও তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতাব নিদর্শন স্বরূপ অর্পণ কবিতে ভীত হয়। হায়! হৃদয় এমনই মলিন হইয়া গিয়াছে। অভিমানে মস্তক এতই উন্নত করিতে শিখিয়াছি যে, ইহা দেব-চরণে আর নত হইতে চাহে না। যে দেশে ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায়, মহর্ষি নাবদের ন্যায় প্রেমিক চৈতন্যদেবের ন্যায় ভক্তগণ জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন; সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এখন আমরা সুশিক্ষিত হইয়া মনে করি, ভক্তি—ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ইহা একটী মনের দুর্ব্বলতা মাত্র! কোন কোন সভ্য বাবু বলিয়া থাকেন, ভক্তি-মনুষ্যকে spiritless অর্থাৎ মেয়েমানুষের মত জীবনী-শক্তি বিহীন—অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। যে আর্য্য-বংশে মহাত্মা ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে এক্ষণে সভ্যতাভিমানী অভক্ত জীব আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাই একজন কবি বলিয়াছেন;—

> যে বংশে জন্ম ছিল শুভ্র মূর্ত্তি ওলা *।
> সেই বংশে জন্ম নিল তামাক মাখা ঝোলা †॥

---

* চিনি হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্ন বিশেষ।

† চিটে গুড়।

"যে ইক্ষু হইতে চিনি জন্মিয়া থাকে, আবার সেই ইক্ষুবংশে চিটে গুড়ও জন্মিয়া থাকে।" আমরা আর্য্যবংশে জন্মিয়া বর্ত্তমান কুহকময় সভ্যতার দোষে সেই চিটে- গুড় আকারে পরিণত হইয়া ভক্তের সেই শুভ্র সুন্দর সরল মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়াছি। আব আমাদেব, অধঃপতনের বাকী কি ?

আইস জীব। অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ভক্তিভবে হৃদয় অবনত করিয়া দীন-দয়াময়ী মা'র চরণে শরণ লই। যাঁহার কৃপাসিন্ধু-বাবিতে অবগাহন করিলে আমাদের ত্রিতাপ-তপ্ত আত্মা চিরদিনেব জন্ম সুশীতল হইয়া যায়, তাঁহার চরণতলে দাঁড়াইয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক নিবেদন করি, মা। আমাদিগকে মাটীব মানুষ করিয়া দাও। অবিদ্যা জনিত অভিমানের ঘোর কুজ্ঝটিকা অপসারিত কবিয়া বিদ্যাস্বরূপিণী মা তুমি, আমাদের অন্তঃ-করণে আসিয়া আবির্ভূত হও। মা বুঝাইয়া দাও, এ অভি-মানোন্মত্ত মন-মাতঙ্গ বশীভূত করিয়া কিরূপে তোমার চরণে নিয়োজিত করিব। জগতের উপর নির্ভর না করিয়া কিরূপে তোমার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া তোমায় মা মা বলিয়া ডাকিতে শিখিব, মা। তাহা বলিয়া দাও! তুমি বলিয়া না দিলে আর কে বলিয়া দিবে? জগতের কাছে মা। তোমার কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না। জগতের অসম্পূর্ণ মানুষ তোমার অজ্ঞেয় তত্ত্ব কি বুঝাইবে! তুমি দয়া করিয়া তোমার তত্ত্ব বুঝা-ইয়া না দিলে আর কেহ বুঝাইতে পারিবে না ? মা! আমাদের ধন, মান, সম্ভ্রমের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দাও। মোহরূপ মদিরা পানে আমরা উন্মত্ত হইয়াছি, মা! আমাদের এ নেশা দূর করিয়া দাও। মা! আমাদের নয়নে জ্ঞানাঞ্জন পরাইয়া দাও, যেন তোমার

ঐ স্বস্বরূপ দেখিয়া—ঐ শতকোটী চন্দ্রমা নিংড়ান সুধামাখা মুখখানি দেখিয়া চিরদিনের জন্য বাহ্য জগৎ ভুলিয়া যাই। মা। শয়নে স্বপনে ভোজনে তোমাকে না ভুলিয়া যেন আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে বলিতে পারি,—

মা মা বলে প্রাণ খুলে জুড়াব জীবন,
করিব মনের ব্যথা তাঁরে নিবেদন।
আসুন সকলে মিলে, হইয়া মায়ের ছেলে,
মা'র জয় গান গেয়ে কাঁপাব গগন॥

সমাপ্ত।